নীহাররঞ্জন গুপ্ত

কি রী টী অম্‌নিবাস

সূচীপত্র

ভূমিকা	জিতেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী		[১]
সর্পিল	...	...	১
রক্তলোভী নিশাচর	...	...	৬৩
বত্রিশ সিংহাসন	...	...	১৩৯
নিরালা প্রহর	...	...	১৬৩
রত্নমঞ্জিল	...	...	২২১

সর্পিল

॥ এক ॥

জয়ন্ত চৌধুরী যখন প্রথম চিঠিটা কিরীটীর হাতে তুলে দিয়েছিল কিরীটী চিঠিটা একবার পড়েছিল—যেমন কোন মানুষ কোন চিঠি পড়ে ঠিক তেমনি করেই এবং সত্যিই তার মনে কোন কৌতূহলের উদ্রেক করেনি।

সে চিঠিটা ভাঁজ করে যে বইটা তখন সে বসে বসে পড়ছিল সেই বইটার মধ্যে ভাঁজ করে রেখে দিতে দিতে বলেছিল, কাল-পরশু একসময় একবার আসবেন তখন কথা হবে।

জয়ন্ত চৌধুরী কিরীটীকে কিছুটা চিনত তাই দ্বিতীয় আর কোন অনুরোধ করেনি—সেদিনকার মত বিদায় নিয়েছিল।

সেইদিনই রাত্রে দ্বিতীয়বার চিঠিটা আবার পড়ে কিরীটী।

হাতের লেখাটা সামান্য একটু কাঁপা কাঁপা হলেও স্পষ্ট, পড়তে কষ্ট হয় না আদৌ। লেখিকার হাতের লেখা যে কোন একসময় মুক্তোর মত পরিষ্কার ও ঝরঝরে ছিল, আজও সেটা বুঝতে কষ্ট হয় না যেন। পাতলা নীল রঙের চিঠির কাগজে লেখা চিঠিটা। চিঠির কাগজটা দামী এবং বিলিতি। চিঠির কাগজের ডানদিকে ওপরে মনোগ্রাম করে লেখা ইন্দ্রালয়।

খুব দীর্ঘ নয়—এক পৃষ্ঠার একটা চিঠি।

লেখিকা মনে হয় কিরীটীর চিঠিটা লিখতে লিখতে কখনো যেন থেমে গিয়েছে, কখনো আবার দ্রুতই কয়েকটা লাইন লিখে গিয়েছে। অক্ষরগুলোও সব সমান নয়, লাইনগুলোও মধ্যে মধ্যে বেঁকে গিয়েছে। ঠিক যেন সোজা হয়নি।

স্পষ্টই বোঝা যায়, একটা মানসিক উদ্বেগের মধ্যে যেন লেখিকা চিঠিটা কোনমতে লিখে শেষ করেছে। এবং সে-উদ্বেগটা লেখিকাকে বেশ একটু যেন বিচলিত করেছে। বিশেষ করে চিঠির মাঝামাঝি জায়গায় যেখানে সেই মানসিক উদ্বেগটা যেন বেশ স্পষ্টই হয়ে উঠেছে।

যত দিন যাচ্ছে ব্যাপারটা যেন বেশ স্পষ্ট হয়ে উঠছে। ওদের প্রত্যেকের মনের মধ্যেই আমাকে হত্যা করবার একটা স্পৃহা—স্পৃহা না বলে বোধ হয় ইচ্ছাই বলা উচিত—অত্যন্ত স্পষ্ট হয়ে উঠছে ক্রমশ। এবং তাতেই আমার মন হচ্ছে ওরা যেন প্রত্যেকে আমাকে হত্যা করবার জন্য ওৎ পেতে সুযোগের অপেক্ষা করছে। সেই জন্যই আমি স্থির করেছি, ওদের সে সুযোগটা দেবো। এভাবে মনের সঙ্গে অহর্নিশি যুদ্ধ করতে সত্যিই আর আমি পারছি না জয়ন্ত। মনে হচ্ছে যা হবার তা হয়ে যাক। আমি ভাল করে খেতে পারি না, ঘুমোতে পারি না—এভাবে এ বয়সে আমার নার্ভের সঙ্গে এই যুদ্ধ করার চাইতে মনে হচ্ছে যা ওরা চাইছে, আমি বোধ হয় সেই অবশ্যম্ভাবীকে এমনি করে বেশিদিন ঠেকিয়ে রাখতে পারব না। তাই আমি মনে মনে স্থির করেছি ওরা যদি হত্যা করে আমায় শান্তি পায় তো করুক ওরা আমাকে হত্যা। সত্যি এইভাবে সর্বক্ষণ বসে বসে মৃত্যুর প্রতীক্ষা করতে আর আমি পারছি না। ওদের কারো হাতেই যদি আমার মৃত্যু আমার ভাগ্যে লেখা থাকে তো তাই হোক।

আমিও নিষ্কৃতি পাই, ওদের ইচ্ছাটা পূর্ণ হয়।

পরের দিনই জয়ন্ত এসে আবার উপস্থিত হল।

কিরীটী আরাম-কেদারাটার ওপর গা এলিয়ে দিয়ে চিঠিটার কথা ভাবছিল।

বসুন জয়ন্তবাবু—

কি ঠিক করলেন? জয়ন্ত প্রশ্ন করে।

কিরীটী সামনে উপবিষ্ট জয়ন্ত চৌধুরীর দিকে তাকাল।

ভদ্রলোকের বয়স বেশি হবে না—ত্রিশের নীচে নয়, পঁয়ত্রিশের ঊর্ধ্বে নয়। সাধারণ দোহারা চেহারা। গায়ের রং উজ্জ্বল শ্যাম। চোখে-মুখে অদ্ভুত একটা বুদ্ধির দীপ্তি। পরনে গরম স্যুট—স্যুটটা দামী, দেখলেই বোঝা যায়।

ভদ্রলোক মাকুন্দ—দাড়ি-গোঁফের চিহ্নমাত্রও চোখে পড়ে না। ভদ্রলোকের ডান চোখটা সামান্য টেরা—ভাল করে লক্ষ্য করে না দেখলে চট করে সেটা বুঝবার উপায় নেই অবিশ্যি।

এ চিঠিটা আপনি কবে পেয়েছেন মিস্টার চৌধুরী? কিরীটী প্রশ্ন করে।

দিন তিনেক হল।

চিঠির লেখিকা ভদ্রমহিলা, মানে চিত্রাঙ্গদা দেবী আপনার কে হন যেন বলছিলেন?

জেঠিমা।

বয়স কত হয়েছে তাঁর?

আটষট্টি-ঊনসত্তর হবে। কিন্তু অত বয়স হলে কি হবে, দেহের বাঁধুনি এখনো এমন আঁটসাঁট যে, দেখলে মনে হয় পঞ্চাশের বেশি নয়। তাছাড়া এখনো রীতিমত কর্মঠ। দু-দুটো কলিয়ারী, ব্যাপার—অত বড় বিরাট দুটো অফিস, একটা ধানবাদে একটা কলকাতায়—সবকিছু তাঁর নখদর্পণে। কোথায় কি হচ্ছে না হচ্ছে, কোথায় কি হবে না হবে—সব কিছুর তিনি খবর রাখেন ও যাবতীয় প্রয়োজনীয় নির্দেশ দেন।

হুঁ। আচ্ছা, ওই যে চিঠির মধ্যে উনি লিখেছেন—জগদীন্দ্র, মণীন্দ্র, ফণীন্দ্র, শচীন্দ্র, স্বাতী প্রভৃতির কথা, ওরা কারা? ওদের সঙ্গে চিত্রাঙ্গদা দেবীর কি সম্পর্ক?

ওরা সব আমার মেজ জেঠামশায় হীরেন্দ্র চৌধুরীর ছেলেমেয়ে।

তার মানে, ওঁর দেওরের ছেলেমেয়ে? কিরীটী শুধাল।

হ্যাঁ। আমাদের ফ্যামিলি হিস্ট্রিটা আপনার বোধ হয় একটু জানা দরকার মিস্টার রায়। জয়ন্ত চৌধুরী বলে।

সংক্ষেপে বলুন।

হ্যাঁ, সেটা আপনার বোধ হয় জানা দরকার।

অতঃপর জয়ন্ত চৌধুরী বলতে শুরু করে।

পৌষের শেষ। শহরে শীতটা যেন বেশ দাঁত বসিয়েছে। তার ওপরে দিন দুই হল আকাশটা মেঘলা-মেঘলা, এবং টিপটিপ করে মধ্যে মধ্যে বৃষ্টিও পড়ছে। আর থেকে থেকে এলোমেলো হাওয়া দিচ্ছে।

জয়ন্ত চৌধুরী বলতে লাগল—কিরীটী চুরুটটায় আবার অগ্নিসংযোগ করে নিল।

জেঠামশাইরা তিন ভাই ছিলেন, জিতেন্দ্র, হীরেন্দ্র ও নীরেন্দ্র চৌধুরী। ঠাকুরদা তাঁর ছেলেদের সাধ্যমত লেখাপড়া শিখিয়ে মানুষ করবার চেষ্টা করেছিলেন।

জয়ন্ত চৌধুরী বলতে লাগল একটু থেমে, চিরদিনের জেদী ও ডানপিটে স্বভাব ছিল বড় ছেলে জিতেন্দ্র চৌধুরীর। পড়াশুনায় আদৌ মন ছিল না, দিবারাত্র গান-বাজনা নিয়েই থাকত।

বাপের সঙ্গে তাই নিয়ে প্রায় খিটিমিটি, চেঁচামেচি চলত তাঁর। অবশেষে একদিন সেই খিটিমিটি চরমে ওঠায় বাড়ি থেকে পালিয়ে যান জিতেন্দ্র চৌধুরী। বয়স তখন তাঁর মাত্র আঠারো বছর। বয়সের আন্দাজে দেহের গঠনটা ছিল বলিষ্ঠ। প্রায় ছ' ফুটের কাছাকাছি লম্বা। টকটকে গায়ের রঙ। দুর্দান্ত স্বাস্থ্য। যেমন সাহসী, তেমনি দুর্দান্ত বেপরোয়া প্রকৃতির।

ঘুরতে ঘুরতে বিহার অঞ্চলে গিয়ে হাজির হন একসময় ভাগ্যান্বেষণে জিতেন্দ্র চৌধুরী। এবং সেখানেই শিল্পপতি রায়বাহাদুর হরপ্রসাদ ব্যানার্জির সঙ্গে তাঁর আলাপ হয়। প্রাণচঞ্চল, বলিষ্ঠ চেহারার কন্দর্পসদৃশ যুবকটিকে দেখে কেন যেন রায়বাহাদুর হরপ্রসাদের ভারী ভাল লেগে যায়।

চমৎকার হিন্দীতে কথা বলছিলেন জিতেন্দ্র, তাই বোধ হয় একটু সন্দেহ হওয়ায় রায়বাহাদুর জিজ্ঞাসা করেন, তুমি বাঙালী?

হ্যাঁ।

কি জাত?

ব্রাহ্মণ।

কতদূর লেখাপড়া করেছ?

বলতে পারেন, কিছুই না।

কেন?

ভাল লাগেনি কখনো লেখাপড়া করতে, তাই।

হরপ্রসাদ একটু হাসলেন তারপর আবার প্রশ্ন করলেন, কিছুই শেখনি? বলার মত কিছুই নয়—তা নামধামটা লিখতে পার তো?

তা অবিশ্যি জানি। বলছিলাম, লেখাপড়া বলতে যা বোঝায়—আপনারা যা বোঝেন—কোন পাসটাস নই।

রায়বাহাদুর মৃদু হাসলেন আবার।

হুঁ—তা কে কে আছেন?

আছেন সবাই—মা বাবা, দুই ভাই। কিন্তু—

কি?

তাঁদের সঙ্গে আমার কোন সম্পর্ক নেই।

কেন?

মতের সঙ্গে মিল হল না।

রায়বাহাদুর আবার হাসলেন।

তা লেখাপড়া তো করোনি, আর কিছু পার?

দৌড়তে পারি, সাঁতরাতে পারি, বন্দুক, লাঠি চালাতে জানি। যে কোন রকম দৈহিক পরিশ্রম করতে পারি। আর একটু-আধটু গান গাই।

আমার কয়লার খনি আছে। খনি থেকে সাঁওতালদের সঙ্গে কয়লা কেটে তুলতে পারবে?

চেষ্টা করলে যে পারব না তা নয়। কিন্তু—

BOIPHAGAR.NET

রায়বাহাদুর যুবকের সরলতায় ও স্পষ্টতায় আবার হেসে ফেললেন। তারপর বললেন, আচ্ছা, এখন আপাততঃ চলো আমার বাড়িতে, তারপর ভেবচিন্তে দেখা যাবে—তোমার উপযুক্ত একটা কাজ যোগাড় করা যায় কিনা।

জিতেন্দ্র চৌধুরীর সেই রায়বাহাদুরের বিরাট প্রাসাদোপন আবাস ইন্দ্রালয়ে প্রবেশ।

রায়বাহাদুর হরপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রচুর অর্থ ও সম্পত্তি এবং বিরাট কলিয়ারীর বিজনেস। ঐশ্বর্য ও প্রাচুর্যের সমারোহ, কিন্তু খাবে কে? ভোগ করবে কে? আপনার জন বলতে একটিমাত্র মেয়ে—চিত্রা অর্থাৎ চিত্রাঙ্গদা ব্যতীত আর কোন আপনজনই নেই। নিজে, স্ত্রী—সারদা ও একমাত্র সন্তান ওই চিত্রা।

চিত্রাঙ্গদার বয়স তখন বারো কি তেরো—কিশোরী চিত্রঙ্গদা। কন্দর্পের মত দেখতে তরুণ জিতেন্দ্রকে দেখে চিত্রাঙ্গদার কেন যেন ভারী ভাল লাগে—বোধ হয় প্রথম যৌবনেরই নেশা।

সে যাই হোক জিতেন্দ্র থেকে গেলেন ইন্দ্রালয়ে।

জয়ন্ত চৌধুরী থামল।

তারপর? কিরীটী প্রশ্ন করে।

জয়ন্ত চৌধুরী আবার শুরু করে ঃ তারপর একদিন বছরখানেক বাদে প্রচুর ঘটা করে রায়বাহাদুর ওই ঘর-থেকে-পালানো যুবকটি জিতেন্দ্র চৌধুরীর সঙ্গেই তাঁর একমাত্র কন্যার বিবাহ দিলেন তবে—

কিরীটী জয়ন্ত চৌধুরীর দিকে তাকায় সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে।

জয়ন্ত চৌধুরী বলে, একটা কথা—একটু ইতস্ততঃ করে বলে জয়ন্ত চৌধুরী, পরে জানা যায় অবিশ্যি কথাটা—চিত্রাঙ্গদা রায়বাহাদুরের মেয়ে হলেও সে কিন্তু তাঁর বিবাহিত স্ত্রীর কন্যা ছিল না।

আপনার জেঠামশাইও জানতেন না কথাটা?

জানতেন।

তবে তিনি সব জেনেশুনেই বিয়ে করেছিলেন বলুন?

হ্যাঁ।

মানে বলতে চান ওঁর স্ত্রী সারদা দেবীর কন্যা নয়?

সারদা দেবীর কন্যা—

তবে?

যদিও সবাই জানত সারদা দেবী হরপ্রসাদের বিবাহিতা স্ত্রী—পশ্চিমে একবার বেড়াতে গিয়ে বিয়ে করে এনেছিলেন। কিন্তু আসলে তা নয়।

তবে কি?

সারদা ওঁর আসল নামও নয়—আসল নাম যমুনা। লক্ষ্ণৌর এক বিখ্যাত বাইজীর মেয়ে।

বাইজীর মেয়ে?

হ্যাঁ। বাইজী-মায়ের গান শুনতে গিয়ে সেখানে তার যুবতী বাইজী-কন্যা যমুনাকে দেখে মুগ্ধ হয়ে যান হরপ্রসাদ, এবং বহু টাকার বিনিময়ে যুমনাকে সঙ্গে নিয়ে আসেন। যখন দেশে ফেরেন, সবাই জানল পশ্চিম থেকে বিয়ে করে এলেন হরপ্রসাদ।

রায়বাহাদুরের সত্যিকারের কোন বিবাহিত স্ত্রী ছিল না?

PATHAGAR.NET

না।

হুঁ, বলুন।

আবার বলতে লাগল জয়ন্ত চৌধুরী ঃ যমুনার নতুন নাম হল সারদা। কিন্তু হরপ্রসাদ সারদার সত্য পরিচয়টা জিতেন্দ্রর কাছে কিন্তু গোপন করেননি, সে কথা তো একটু আগেই আপনাকে আমি বললাম—স্পষ্ট করেই সব কথা বলেছিলেন বিবাহের পূর্বে তাঁকে।

তবু বিবাহ আটকায়নি কারণ হয়তো হরপ্রসাদের মতই জিতেন্দ্রও চিত্রার রূপে মুগ্ধ হয়েছিলেন, তিনি সানন্দেই বিবাহ করলেন চিত্রাঙ্গদাকে। এবং শ্বশুরের মৃত্যুর পর তাঁর বিরাট সম্পত্তির মালিকও হয়ে বসলেন।

তারপর?

জেঠামশাই কিন্তু বেশিদিন বাঁচেননি। মাত্র পঁয়তাল্লিশ বছর বয়সে বাঘ শিকার করতে গিয়ে একদিন হাজারীবাগের জঙ্গলে বাঘের হাতে জখম হয়ে সেপটিক হয়ে মারা যান।

ওঁদের কোন সন্তানাদি হয়নি?

না।

তারপর?

এদিকে জিতেন্দ্রর অন্য দুই ভাই হীতেন্দ্র ও নীরেন্দ্র চৌধুরী—একজন তখন ওকালতি করেন, ও একজন অধ্যাপনা করে জীবন কাটাচ্ছিলেন। দুজনেই বিবাহ করেছিলেন। ছোট ভাই নীরেন্দ্র চৌধুরীও জিতেন্দ্র চৌধুরী মারা যাবার কিছুদিনের মধ্যেই মারা যান। তাঁর একটিমাত্র ছেলে আমি—বি. এ. পাস করে জীবনবীমা অফিসে চাকরি করছি সেও তো আপনি জানেন। শ'তিনেক টাকা মাইনা পাই। বিয়ে-থা করিনি। একা মানুষ, মোটামুটি সচ্ছলতার মধ্যেই দিন কাটছে। কিন্তু যাক যা বলছিলাম—জিতেন্দ্র চৌধুরীর মেজ ভাই হীরেন্দ্র চৌধুরী ওকালতি করে তেমন একটা কিছু উপার্জন করতে কোন দিনই পারেননি।

তাঁরই পাঁচটি ছেলেমেয়ে—জগদীন্দ্র, মণীন্দ্র, ফণীন্দ্র ও শচীন্দ্র—চার ছেলে এবং একটিমাত্র মেয়ে স্বাতী।

তাঁরও অকালেই মানে নীরেন্দ্র চৌধুরীর মৃত্যুর বৎসর দুয়েকের মধ্যেই মৃত্যু হয়। ওদের মা আগেই মারা গিয়েছিলেন। এদিকে হীরেন্দ্র চৌধুরীর মৃত্যুর পর জিতেন্দ্র চৌধুরীর বিধবা স্ত্রী চিত্রাঙ্গদা দেবী দয়াপরবশ হয়ে ওদের নিজের কাছে নিয়ে যান ইন্দ্রালয়ে।

সেও আজ বারো-তেরো বছর আগেকার কথা।

হীরেন্দ্রর একটি ছেলেও বলতে গেলে মানুষ হয়নি—মেয়ে ওই স্বাতী বি. এ. পাস করেছে।

॥ দুই ॥

অতঃপর জয়ন্ত চৌধুরী তার জেঠতুতো ভাই-বোনদের একটা মোটামুটি পরিচয় দিল।

বড় জগদীন্দ্র, বয়স ত্রিশ-একত্রিশ হবে—চিরদিনই রুগ্ন—ক্রনিক হাঁপানীর রোগ। ম্যাট্রিক পরীক্ষা বার দুই দিয়েছিল, পাস করতে পারেনি।

বাড়িতে সর্বক্ষণ বসে থাকে—এবং বসে বসে পেসেন্স খেলে তাস নিয়ে। খাওয়া-দাওয়ার ব্যাপারে একটু বিলাসী ও লোভী।

দ্বিতীয় মণীন্দ্র চৌধুরী—বড় ভায়ের চেয়ে বছর দুয়েকের ছোট হবে। জগদীন্দ্র তবু ম্যাট্রিক পরীক্ষা দিয়েছিল, সে তাও দেয়নি। খেলাধূলায় খুব নেশা। ওই অঞ্চলের একজন নামকরা ফুটবল প্লেয়ার। সেন্টার ফরোয়ার্ডে খেলে। স্বাস্থ্য ভাল এবং সৌখিন প্রকৃতির—বেশভূষা ও সাজসজ্জার দিকে বিশেষ নজর।

তৃতীয় ফণীন্দ্র—ডান পা-টা খোঁড়া। চলার সময় পা-টা একটু টেনে টেনে চলে। ফণীন্দ্রর নেশা গান-বাজনায়। ভাল তবলা বাজায়। ক্লাস এইট পর্যন্ত পড়ে পড়াশোনায় ইস্তফা দিয়ে দিয়েছে। স্বাস্থ্য মোটামুটি—এবং সেও তার দাদার মতই ভোজনবিলাসী।

চতুর্থ শচীন্দ্র—ভাইদের মধ্যে সে-ই দেখতে সবচেয়ে বেশি সুন্দর। ভাইদের মধ্যে ও-ই ম্যাট্রিকটা পাস করেছে। কবিতা লেখা ও রহস্য-রোমাঞ্চের বই পড়া তার একটা নেশা।

স্বাতী—বোন ; স্থানীয় কলেজ থেকে বি. এ. পাস করেছে—গত বছর। এম. এ. পড়ার ইচ্ছা। কিন্তু চিত্রাঙ্গদা দেবী স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছেন, না—যথেষ্ট হয়েছে।

চিত্রাঙ্গদা দেবী তার বিয়ের জন্য পাত্রের সন্ধান করছিলেন, এমন সময় হঠাৎ প্রকাশ পেলো চিত্রাঙ্গদা দেবীর ধানবাদ অফিসের যে তরুণ অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজারটি বছর দুই হল তাঁর ধানবাদ অফিসে যোগ দিয়েছে—অনিন্দ্য চক্রবর্তী—তাকেই নাকি স্বাতী বিয়ে করতে চায়।

অনিন্দ্যও সেকথা চিত্রাঙ্গদা দেবীকে জানিয়েছিল।

কিন্তু চিত্রাঙ্গদা দেবী রাজী হননি ; শোনামাত্রই কথাটা নাকচ করে দিয়েছেন। বলেছেন, অসম্ভব—হতে পারে না।

তবু স্বাতী জিজ্ঞাসা করেছিল তার বড়মাকে, (চিত্রাঙ্গদা দেবীকে সকলে 'বড়মা' বলে ডাকে বরাবর) কেন, অসম্ভব কেন?

'কেন'র জবাব তোমাকে আমি দেবো না। অসম্ভব—এইটাই শুধু মনে রেখো।

তবু তর্ক তুলেছিল স্বাতী। বলেছিল, অনিন্দ্য তোমার আফিসে চাকরি করে বলেই কি এ বিয়ে হতে পারে না?

তর্ক করো না স্বাতী। চিত্রাঙ্গদা দেবী বলেছিলেন।

ওর সঙ্গে আমার বিয়ে হলে সেটা তোমার ভুয়ো অর্থহীন ভ্যানিটিতে লাগবে, তাই কি—

চুপ কর, ডেঁপোমি করো না—দুটো পাস করে ভাব যেন কি একটা হয়ে গিয়েছ, তাই না?

ডেঁপোমি আমি করছি না—বরং তুমিই অন্যায় জুলুম করবার চেষ্টা করছ।

স্বাতী?

তোমার ঐ চোখরাঙানোকে আর যে ভয় করুক আমি করি না তুমি জান—

অকৃতজ্ঞ।

কেন আশ্রয় দিয়ে খাইয়ে পরিয়ে মানুষ করেছ বলে? কিন্তু ভুলে যেও না পায়ে ধরে আশ্রয় দিতে আমরা তোমাকে সাধিনি—তুমিই—

হ্যাঁ, অন্যায় হয়েছে আমার। পথে ভেসে বেড়ানোই তোমাদের উচিত ছিল।

সেটা হয়ত সুখেরই হত।

ক্রোধে যেন অতঃপর একেবারে ফেটে পড়েছিলেন চিত্রাঙ্গদা দেবী। বলেছিলেন যেমন অপদার্থ অমানুষ ছিল বাপ তেমনিই হবে তো তোমরা—একপাল ভেড়া জন্ম দিয়ে

গিয়েছে—

হ্যাঁ, বাপ আমাদের অপদার্থ অমানুষ তো হবে—কারণ তুমি যে তার সন্তানদের প্রতি কৃপা দেখিয়ে আশ্রয় দিয়ে বাহাদুরী কুড়োবার সুযোগ পেয়েছ!

স্বাতী, তুমি স্পর্ধার সীমা লঙ্ঘন করছ। চাপা কণ্ঠে তর্জন করে উঠেছিলেন চিত্রাঙ্গদা দেবী অতঃপর।

ভাগ্যে মণীন্দ্র ওই সময় সামনে এসে পড়েছিল, সে কোনমতে বোনকে সরিয়ে নিয়ে যায়।

কিরীটী প্রশ্ন করে, আপনি কার কাছে শুনলেন এসব কথা? আপনি তো সেখানে থাকেন না?

না, স্বাতীই আমাকে চিঠি লিখে জানিয়েছিল সব কথা।

তারপর কি হল?

কি আর হবে, ব্যাপারটা ওইখানেই চাপা পড়ে গেল। জয়ন্ত চৌধুরী বললে।

আর ওই অনিন্দ্য চক্রবর্তী—তার কি হল?

সে এখনো চাকরি করছে।

তা আপনি আমার কাছে এসেছেন কেন মিস্টার চৌধুরী এবার বলুন তো?

কেন, আপনি চিঠিটা পড়েছেন তো। বড়মার ধারণা হয়েছে এই মাসের পনেরো তারিখে তার জন্মদিন—এবং তাঁর কোষ্ঠীতেও আছে নাকি এই সময়টা তাঁর অপঘাতে মৃত্যুযোগ ; কাজেই তিনি খুব নার্ভাস হয়ে পড়েছেন।

কোষ্ঠীতে মৃত্যুযোগ আছে বলে?

হ্যাঁ, তাঁর কোষ্ঠীতে যা যা ছিল, সব ফলে গিয়েছে আজ পর্যন্ত একেবারে ঠিক ঠিক। তাই—

কিন্তু এক্ষেত্রে আমি তাঁকে কি সাহায্য করতে পারি?

দেখুন কথাটা তাহলে আপনাকে আমি আরো একটু স্পষ্ট করে বলি—জেঠিমার ঐ চিঠিটা পাবার পর থেকেই আমারও মনে হচ্ছে সত্যিই হয়ত জেঠিমাকে ঘিরে একটা ষড়যন্ত্র ঘন হয়ে উঠছে—

ষড়যন্ত্র!

হ্যাঁ। আর তাই আমি আপনার কথা জেঠিমাকে ফোনে জানিয়েছিলাম—বলেছিলাম আপনার সাহায্য নিলে হয়ত সব ষড়যন্ত্র ফাঁস হয়ে যেতে পারে।

কিন্তু—

মিঃ রায়, তাই জেঠিমা ও আমার দুজনেরই ইচ্ছে বিশেষ করে ঐ সময়টা সেখানেই আপনি উপস্থিত থাকুন—আপনি অমত করবেন না।

কিরীটী অতঃপর কি যেন ভাবে কয়েক মুহূর্ত, তারপর বলে, আপনার কথা হয়ত মিথ্যে নয় কিন্তু সেখানে আমি কি ভাবে যেতে পারি?

সেটা আপনিই ভেবে বলুন।

আচ্ছা জয়ন্তবাবু, কোষ্ঠীর ব্যাপারে বুঝি চিত্রাঙ্গদা দেবীর খুব বিশ্বাস? কিরীটী মৃদু হেসে প্রশ্ন করে।

হ্যাঁ।

PATHAGARNET

কিন্তু মিস্টার চৌধুরী, সত্যিই যদি তাঁর এই সময় অপঘাতে মৃত্যুযোগ থাকে, কারো সাধ্য আছে কি তাঁকে রক্ষা করার?

সে কি আর আমি বুঝি না! তাছাড়া তাঁরও ধারণা—

কি?

তাঁর মৃত্যু যদি ঘটেই তো ওরাই তাঁকে হত্যা করবে। তাই আরো বেশি করে ওদের গতিবিধির ওপর সর্বক্ষণ প্রখর দৃষ্টি রাখবার জন্যই একজনের সাহায্য আমরা চাই।

কিরীটী আবারও হাসল। তারপর বলল, ঠিক আছে মিস্টার চৌধুরী, আমি যাব। অন্য কোন কারণ নয়—ব্যাপারটা সত্যিই বিচিত্র, তাই যাব। কিন্তু আপনার কি ধারণা বলুন তো?

আমার?

হ্যাঁ।

খুব একটা অসম্ভব নয় কিছু।

কি?

বড়মাকে ওদের কারো পক্ষে হত্যা করা।

কিন্তু কেন বলুন তো?

একটা কথা আপনাক বলা হয়নি মিষ্টার রায়—

কি বলুন তো?

আমার যে পাঁচজন জেঠতুতো ভাইবোনের কথা একটু আগে আপনাকে বললাম তাদের অবস্থাও আজ কোণঠাসা জন্তুর মত।

কি রকম?

বড়মাকে আপনি দেখেননি—কিন্তু দেখলে বুঝবেন স্ত্রীলোক হলেও তাঁর অদ্ভুত একটা ব্যক্তিত্ব আছে। এবং আছে প্রত্যেকের উপরে প্রভুত্ব করবার একটা অদ্ভুত লিপ্সা।

তাই বুঝি?

হ্যাঁ। তাঁর ধারণা চিরদিন, ধারণাই বা বলি কেন মনে হয় স্থির বিশ্বাস যে তাঁর মত সুন্দরী নেই—তাঁর মত বুদ্ধিমতী নেই—তিনি যা করবেন বা করেন, সেটাই ঠিক। তিনি যা বোঝেন, সেটাই শেষ বোঝা। সবাইকে তাঁরই নির্দেশ মেনে চলতে হবে। বলতে পারেন তাঁর এটাই বিচিত্র একটা সুপিরিয়রিটি কমপ্লেক্স—তাঁর যে গুণ নেই তা নয়—বরং অনেক গুণই আছে—তাছাড়া মনে স্নেহ-মমতাও আছে তবু ঐ কমপ্লেক্সটুকুই তাঁর যা কিছু রাহুর মত গ্রাস করেছে—শোনা যায়, ওই কারণেই জেঠামশাইয়ের সঙ্গেও কোন দিন যাকে বলে সত্যিকারের মিল তো হয়নি—দুজনের মধ্যে কোন দিন সত্যিকারের একটা প্রীতির সম্পর্ক গড়ে উঠতে পারেনি।

Interesting! তারপর?

কিরীটীর চুরুটটা একসময় নিভে গিয়েছিল, পুনরায় সে তাতে অগ্নিসংযোগ করে নিল।

জয়ন্ত চৌধুরী বলতে লাগল, এবং আমার কি মনে হয় জানেন মিস্টার রায়?

কি?

আমার ধারণা আমার মেজ জেঠামশাইয়ের মৃত্যুর পর স্বেচ্ছায় ও সাগ্রহে বড়মা তাঁর ছেলেমেয়েদের নিজের কাছে আশ্রয় দিয়েছিলেন, তার মধ্যেও বড়মার অসহায়দের জন্য মমতা বা দায়িত্ববোধের চাইতেও হয় বেশি ছিল কতকগুলো অসহায় ছেলেমেয়ের উপর

PATHAGAR.NET

তাঁর সেই আধিপত্য বিস্তার বা dominate করবার লিপ্সাটাই। কিন্তু হাজার হলে ওরাও তো মানুষ—দুর্ভাগ্যের জন্যে ওদের বড়মার আশ্রয়ে যেতে হলেও দিনের পর দিন তাঁর ঐ নিষ্ঠুর বিলাস তাদের সহ্যশক্তির ওপর মর্মান্তিক ভাবে পীড়ন করেছে হয়ত এবং যার ফলে আজ তারা সত্যিই মরীয়া হয়ে উঠেছে ; এবং সত্যিই হয়ত ওরা আজ বড়মাকে হত্যাও করতে পারে তাঁর হাত থেকে নিষ্কৃতি পাবার জন্যেই। হয়ত আমারও অবস্থা ওদেরই মত হত আমার বাবার মৃত্যুর পর ওঁর ইচ্ছাক্রমে ওঁর ওখানে গিয়ে আশ্রয় নিলে, কিন্তু thank God—ভগবান আমায় বাঁচিয়েছেন। মামারা আমাকে আশ্রয় দিয়ে মানুষ করে তোলেন।

কিন্তু একটা ব্যাপার বুঝতে পারছি না মিস্টার চৌধুরী, একদিন না হয় ওরা অসহায় ছিল কিন্তু আজ তো ওদের বয়স হয়েছে, আজও তাহলে ওরাই বা কেন দিনের পর দিন ওইভাবে পীড়ন সহ্য করে ওখানে পড়ে আছেন?

সেটা তো খুবই স্বাভাবিক—জেঠিমার সম্পত্তির লোভে। শুনলেন তো সব কটাই অপদার্থ—নিজের পায়ে নিজে দাঁড়াবার মত কোন শক্তি নেই।

কিন্তু আপনাদের বড়মা যে ওদেরই তাঁর সমস্ত সম্পত্তি দিয়ে যাবেন, তারই বা স্থিরতা কোথায়? তিনি যেরকম বিচিত্র প্রকৃতির স্ত্রীলোক—হয়ত একটি কপর্দকও কাউকে দেবেন না তাঁর বিপুল সম্পত্তির—

না, তিনি already উইল করে দিয়েছেন।

কি উইল করেছেন?

শুনেছি ওদের প্রত্যেকের জন্যেই একটা মোটা মাসোহারা ও নগদ টাকার ব্যবস্থা করেছেন তাঁর উইলে।

ওঁরা কি সেকথা জানেন?

নিশ্চয়ই জানে।

কিরীটী অতঃপর চুপ করে থাকে।

তারপর বলে, কিন্তু সত্যিই কি আপনি মনে করেন জয়ন্তবাবু—তাঁরা তাঁদের আশ্রয়দাত্রী জেঠিমাকে শেষ পর্যন্ত মাত্র ঐ কারণেই হত্যা করতে পারেন!

অন্ততঃ আমি হলেও পারতাম মনে হয়—

ঠিক আছে। কবে সেখানে যেতে হবে বলুন?

আজ আপনি পারলে কাল নয়।

বেশ। আমি সামনের শনিবার যাব।

আমি এসে আপনাকে তাহলে নিয়ে যাব।

না, আমি একাই যাব। আপনি কেবল আপনার বড়মাকে গোপনে ব্যাপারটা জানিয়ে রাখবেন।

গোপনে!

হ্যাঁ। আমার সেখানে যাবার ব্যাপারটা যেন তাঁরা কেউ না জানতে পারেন।

কিন্তু—

কি ভাবে, কি পরিচয়ে যাব বুধবার আপনাকে জানাব।

বেশ। জয়ন্ত চৌধুরী উঠল।

PATHAGAR.NET

॥ তিন ॥

ধানবাদ শহর থেকে বেশ কিছুটা দূরেই ইন্দ্রালয়।

পাহাড়ের মত একটা উঁচু জায়গায় ইন্দ্রালয়! বাড়িটা যেন দূর থেকে অবিকল একটা দুর্গের মত মনে হয়। বড় রাস্তা থেকে পাথরের তৈরী একটা চওড়া রাস্তা ঘুরে ঘুরে সোজা রাস্তা যেন ইন্দ্রালয়ের গেটের কাছে গিয়ে শেষ হয়েছে। অনেকখানি জায়গা জুড়ে বাড়িটা। তিনতলা বাড়ি। বাড়ির চারপাশে বাগান, তার মধ্যেই রেস্ট-হাউস, আস্তাবল, গ্যারাজ ও চাকর-দারোয়ানদের থাকবার আস্তানা।

বাড়ির চতুষ্পার্শ্বস্থ সীমানা প্রায় দেড় মানুষ সমান উঁচু প্রাচীর দিয়ে ঘেরা।

একতলা, দোতলা ও তিনতলা মিলিয়ে অনেকগুলো ঘর। নিচের তলায় অফিস ও বসবার একটা বড় হলঘর। ওপরে দোতলায় চার ভাই থাকে চারটি ঘরে, এবং একটা ঘরে থাকেন চিত্রাঙ্গদা দেবী।

তিনতলার একটা ঘরে থাকে স্বাতী একা। স্বাতী বরাবর তার বড়মার লাগোয়া পাশের ঘরটাতেই ছিল, বছরখানেক আগে সে তিনতলায় চলে গিয়েছে।

চিত্রাঙ্গদা দেবীর আদৌ ইচ্ছা ছিল না, স্বাতী তিনতলায় গিয়ে থাকে। বাধাও দিয়েছিলেন তিনি, কিন্তু স্বাতী শোনে নি। বলেছিল, না, তোমার পাশের ঘরে আর আমি থাকব না।

কেন থাকবি না শুনি?

সত্যি কথাটা শুনতে চাও?

হ্যাঁ, বল্, কেন থাকবি না?

সর্বক্ষণ আমার ওপরে তোমার ওই শকুনের মত চোখ মেলে থাকাটা আমার সহ্য হয় না।

কি বললি!

হ্যাঁ, তাই। আমি চলব ফিরব কথা বলব—জেগে থাকি বা ঘুমোই তুমি যে তোমার ঐ শকুনের দৃষ্টি দিয়ে আমাকে আমার সামনে পিছনে আড়ালেও খবরদারি করবে—সেটা আমার অসহ্য হয়ে উঠেছে।

তা হবেই। আমার চোখের সামনে থাকলে বজ্জাতি করার সুবিধে হয় না কিনা।

কি বললে, বজ্জাতি?

হ্যাঁ—নষ্ট মেয়েমানুষ, তোর চরিত্রের কথা তো জানতে কারো বাকি নেই!

তুমি অতি নোংরা, অত্যন্ত ছোট মন কিনা তোমার।

কি বললি? আমি নোংরা, আমার ছোট মন?

একশবার বলব, হাজারবার বলব—অত্যন্ত ছোট মন।

মুখ তোর থেঁতো করে দেব হারামজাদি!

চেষ্টা করেই দেখ না একবার—কে কার মুখ থেঁতো করে দেয় দেখবে।

পিছমোড়া করে ঘরের মধ্যে বেঁধে রাখা উচিত—তোর মত হারামজাদি নষ্ট মেয়েমানুষকে।

আমাকে নয়—বাঁধা উচিত তোমাকে। জবাব দিয়েছিল স্বাতী।

কি, যত বড় মুখ নয়, তত বড় কথা!

দেখ, বেশি বাড়াবাড়ি করো না—আমাকে তুমি আমার ওই ম্যান্তামুখো ভীতু দাদারা

PATHAGAR.NET

পাওনি।

চুপ কর্ হারামজাদি—ছোনাল—

কেন চুপ করব, শুনি? তোমার অত্যাচার অনেক সহ্য করেছি, আর করব না। আজই আমি তেতলায় চলে যাব, দেখি তুমি কি করতে পার।

ঠ্যাং ভেঙে দেব—একবার গিয়ে দেখ্ না!

আমিও তোমার ঠ্যাং ভাঙব তাহলে।

উঃ দুধ-কলা দিয়ে কালসাপ পুষেছি। সব—

সে তো পুষেছই। সেটা আরো ভাল করে টের পাবে, যখন সেই কালসাপের ছোবল খাবে।

কথাগুলো বলে স্বাতী গটগট করে সিঁড়ি বেয়ে ওপরে চলে গিয়েছিল। এবং সত্যি সত্যি সেইদিনই সে তেতলায় চলে যায়। চাকরদের ডেকে জিনিস-পত্র সব তার তেতলার ঘরে নিয়ে যায়।

জগদীন্দ্র বলেছিল বোনকে, বড়মা খুব চটেছেন স্বাতী।

বয়েই গেল তাতে আমার। আমি ওই ডাইনী শকুনি বুড়ীকে একটুও পরোয়া করি না।

ছিঃ, ওকথা বলে না।

ডাইনীকে ডাইনী বলব, শকুনিকে শকুনি বলব—তার আবার ছিঃ কি! দেখ দাদা, তোমরা কেন পুরুষ হয়ে জন্মেছ বলতে পার?

কিন্তু—

তোমাদের গলায় দড়ি দেওয়া উচিত।

তা কি করব বল?

করবে আর কি! আর করবার কিছু সাধ্যই কি আছে নাকি তোমাদের কারো অবশিষ্ট? যাও যাও, বড়মার পা চাটো গিয়ে। তোমাদের মত যদি পুরুষ হয়ে জন্মাতাম, তাহলে দেখতে ঠিক ওই ডাইনী বুড়ীকে এতদিনে আমি খুন করতাম।

স্বাতী! চিৎকার করে উঠেছিল জগদীন্দ্র সভয়ে বোনের মুখের দিকে তাকিয়ে।

চার-চারটে পুরুষ তোমরা রয়েছ, পার না একদিন ওই শকুনি ডাইনী বুড়ীটাকে গলা টিপে শেষ করে দিতে?

মেজ ভাই মণীন্দ্র যে ওই সময় দ্বারের কাছে এসে দাঁড়িয়েছে, ওরা টের পায়নি।

হঠাৎ মণীন্দ্র বলে ওঠে, পারব না কেন, খুব পারি।

পার, পার মেজদা?

খুব পারি।

মণীন্দ্র বলতে বলতে ঘরের মধ্যে এসে ঢোকে।

জগদীন্দ্র তখন যেন একেবারে বোবা হয়ে গিয়েছে। ভয়ে তার গলা শুকিয়ে এসেছে.

মণীন্দ্র আরো বলে, তুই দেখে নিস স্বাতী, একটু সুযোগ পেলেই—

হঠাৎ শুকনো গলায় ওই সময় কোনমতে জগদীন্দ্র ধমকে ওঠে ছোট ভাইকে, মণি, কি হচ্ছে কি!

আমাকে চোখ রাঙাচ্ছ কি দাদা, আমি জানি তুমিও—

PATHAGAR.NET

মণি!

হ্যাঁ—তুমিও সুযোগ পেলে ওঁকে হত্যা করবে।

কি বললি, আমি—

হ্যাঁ, তুমি।

ভুলে যাস না মণি, বড়মা না থাকলে আজ আমরা কোথায় ভেসে যেতাম!

সেও বোধ হয় এর চাইতে ভাল হত দাদা। এর নাম বাঁচা বল তুমি? স্বাতী তো মিথ্যা বলেনি, ঠিকই বলছে—এর চাইতে জেলের কয়েদীদের জীবনেও স্বাধীনতা আছে। একবার ভেবে দেখ তো? আমাদের আশ্রয় দেবার ছল করে কিভাবে আমাদের পাঁচ ভাই-বোনকে বড়মা বন্দী, পঙ্গু করে রেখেছে! শোন দাদা, তোমাকে আমি শেষবারের মত বলে রাখছি—

কি?

ভয়ে ভয়ে তাকায় জগদীন্দ্র ছোট ভাইয়ের মুখের দিকে।

তোমরা এখানে পড়ে থাকতে পার কিন্তু আমি এখান থেকে চলে যাব।

চলে যাবি?

হ্যাঁ।

কোথায়?

যেখানে হোক, পথে-ঘাটে।

কিন্তু খাবি কি?

কলের জল খাব।

বোকার মত কথা বলিস না মণি, কলের জল খেয়ে মানুষ বাঁচে না।

বাঁচে—বাঁচবে না কেন, এ রাজভোগের চাইতে সে অনেক ভাল—অনেক সম্মানের। বলে ওঠে স্বাতী।

পাগলামি করিস না মণি—ওসব গল্প-কবিতাতেই লেখা থাকে। জগদীন্দ্র বলে।

স্বাতী বড় ভাইয়ের সে কথায় কান না দিয়ে মেজ ভাইয়ের দিকে তাকিয়ে বলে, যাবে—যাবে মেজদা, সত্যি চল এখান থেকে আমরা চলে যাই।

যাব—সুযোগ এলেই যাব। মণীন্দ্র বলে।

ছেলেমানুষি করিস না মণি,—জগদীন্দ্র বলে ওঠে আবার ভীতকণ্ঠে, পৃথিবীটা এত সোজা নয়। ভুলে গেছিস? মনে নেই, বাবার সেই রোজগারের জন্য উদয়-অস্ত পরিশ্রম—তবু দুবেলা পেট ভরে আমাদের আহার জুটত না, মা'র সেই কান্না—

তবু সে কান্নার মধ্যে ইজ্জত ছিল, সম্মান ছিল দাদা। এরকম গ্লানি আর অপমানের জ্বালা ছিল না। স্বাতী বলে।

চতুর্থ ভাই শচীন্দ্র ওই সময় এসে ঘরে ঢোকে ঃ ব্যাপার কিরে স্বাতী, হঠাৎ ওপরে চলে এলি কেন? বড়মা ভীষণ রেগে গেছে মনে হল—

তাই বড়মার জন্য বুঝি ওকালতি করতে এসেছ ছোটদা!

তার মানে?

মানে আর কি, তুমি বড়মার ভয়ে যেমন সর্বদা জুজুবুড়ী হয়ে আছ, তেমনিই থাক না গিয়ে—এখানে কেন?

স্বাতীর কথাবার্তাগুলো আজকাল কেমন শুনছ বড়দা? শচীন্দ্র বড় ভাইয়ের মুখের দিকে

PATHAGAR.NET

তাকিয়ে বলে।

সত্যি কথা বলছি কিনা তাই শুনতে খারাপ লাগছে ছোটদা!

ওঃ, দুটো পাস করে যে একেবারে ধরাকে সরা জ্ঞান করছিস রে! শচীন্দ্র টিপ্পনী কাটে।

তা তো করবই—এ তো আর গদ্য-কবিতা লেখার মত সহজ নয়!

আগে লিখে নে একটা—তারপর অমন বড় বড় কথা বলিস, শচীন্দ্র বলে ওঠে।

ও যত খুশি তুমিই বসে বসে লেখ গে আর দু বেলা বড়মার দেওয়া রাজভোগ খাও গে।

তুই নিমকহারাম ছোটলোক কিনা—তাই বড়মার সব উপকার ভুলে গেছিস আজ! তারপর একটু থেমে বলে, গলাধাক্কা দিয়ে যখন বড়মা এ বাড়ি থেকে বের করে দেবে, তখন বুঝবি।

বুঝতেই তো আমি সেটা চাই। বল গে না তোমার বড়মাকে কথাটা।

দেখ স্বাতী, এত তেজ মেয়েমানুষের ভাল না।

যাও যাও, আর উপদেশ দিতে হবে না। কবিতা লেখ গিয়ে, আর তোমার বড়মায়ের পায়ে তেল দাও গে—অপদার্থ কাপুরুষ!

ঘৃণাভরে কথাগুলো বলে স্বাতী মুখ ফিরিয়ে নেয় তার ভাইয়ের দিক থেকে।

কিন্তু আশ্চর্য, শেষ পর্যন্ত দেখা গেল চিত্রাঙ্গদা দেবী যেন স্বাতীর তিনতলায় যাবার ব্যাপারটা মেনেই নিলেন।

প্রথমটায় যতই হাঁকডাক করুন না কেন, স্বাতী ওপরে চলে যাবার পর যেন হঠাৎ চুপ করে গেলেন।

বরং বাড়ির বুড়ী ঝি লখিয়ার মাকে বলে দিলেন, রাত্রে স্বাতীর ঘরের দরজার সামনে গিয়ে শুয়ে থাকতে।

স্বাতী যেন তিনতলায় গিয়ে কতকটা হাঁফ ছেড়ে বাঁচে, প্রতি মুহূর্তে এখন আর চিত্রাঙ্গদা দেবীর মুখোমুখি হতে হবে না।

চিত্রাঙ্গদা দেবীর দুই চোখের সন্দিগ্ধ কুটিল দৃষ্টি তাকে কাঁটার মত বিঁধবে না। বাতের জন্য বেশি হাঁটা-চলা আর এখন করতে পারেন না চিত্রাঙ্গদা দেবী—সিঁড়ি বেয়ে যখন-তখন তিনতলায় উঠে আসাটা তো এক-প্রকার দুঃসাধ্যই তাঁর পক্ষে।

॥ চার ॥

চিত্রাঙ্গদা দেবীর আসন্ন জন্মদিন উৎসব উপলক্ষ্যে ইন্দ্রালয়ের সবাই ব্যস্ত।

খুব হৈ-চৈ করে রীতিমত সমারোহের সঙ্গেই চিত্রাঙ্গদা দেবীর জন্মোৎসব পালন করা হয়—৩রা মাঘ।

আর উৎসবটা রায় বাহাদুর হরপ্রসাদের আমল থেকেই হয়ে আসছে। একমাত্র সন্তান—আদরিণী কন্যার জন্মদিনটা খুব সাড়ম্বরেই যেন স্মরণ করিয়ে দিতেন সকলকে প্রতি বছর।

ইন্দ্রালয়ের পিছনে যে বাগান, সেখানেই পর পর সব তাঁবু পড়তো—চারদিকে নানারঙের আলোর উৎসব—যাত্রা থিয়েটার পুতুলনাচ ছাড়াও আর একটা বিশেষ আকর্ষণ ছিল।

হরপ্রসাদ নিজে বরাবর গানবাজনা ভালবাসতেন—নিজে গাইতে ও বাজাতে পারতেন—তাই তিনি মেয়ের জন্মদিনটিকে উপলক্ষ্য করে এক বিরাট জলসার ব্যবস্থা করতেন প্রতি বছর—নানা জায়গা থেকে আমন্ত্রণ জানিয়ে আনতেন গুণীদের, আট-দশ দিন ধরে একটানা গান-বাজনার আসর চলত—আনন্দের স্রোত বইতো।

হরপ্রসাদ তাঁর যেখানে যত আত্মীয় আছে, সকলকেই সেই উৎসবে যোগ দিতে আহ্বান জানাতেন। তাদের যাতাযাত ও ওই কদিন ইন্দ্রালয়ে থাকার সব ব্যবস্থা করতেন, এবং ওই উৎসবের ব্যাপারটা হরপ্রসাদের মৃত্যুর পরও চলে এসেছে—চিত্রাঙ্গদার স্বামী জিতেন্দ্র চৌধুরীর প্রচেষ্টাতেই এবং সেটা আরো বেশি জাঁক-জমকের হয়েছে। জিতেন্দ্রর মৃত্যুর পর বৃদ্ধ সরকার যোগজীবনবাবু—যাকে চিত্রাঙ্গদা বরাবর জীবনকাকা বলে ডেকেছে, তিনিই করে এসেছেন।

অবশেষে জগদীন্দ্রদের আমলে জগদীন্দ্রই সেটা নিজের হাতে তুলে নেয়।

ক'টা দিনের ওই উৎসবে প্রচুর টাকা খরচ করা হয়। আর বিশেষ একটা ব্যাপার হচ্ছে, ওই উৎসবের কটা দিনের জন্য চিত্রাঙ্গদা দেবী তাঁর আভিজাত্য ও দাম্ভিকতার সকল ব্যবধান ঘুচিয়ে অত্যন্ত সহজ সরল স্বাভাবিকতার মধ্যে যেন নেমে আসেন। প্রত্যেকের সঙ্গে কথা বলেন, সহজ ভাবে হাসেন, আনন্দ করেন—সকলের মধ্যে তাদেরই একজন যেন হয়ে যান।

চিত্রাঙ্গদা দেবীর সে যেন সম্পূর্ণ অন্য এক রূপ। এ যেন সকলের পরিচিত চিত্রাঙ্গদাই নয়। হাসিখুশি ভরা সম্পূর্ণ অন্য একটি মানুষ।

একটি ছোট মেয়ে—যে তার জন্মতিথি উৎসবে আনন্দে মেতে উঠেছে

কিরীটী যখন ইন্দ্রালয়ে এসে পৌঁছল সোজা কলকাতা থেকে তার গাড়িতেই, ইন্দ্রালয় তখন আলোয় আলোয় ঝলমল করছে চিত্রাঙ্গদা দেবীর আসন্ন জন্মতিথি উৎসবের সাজে সজ্জিত হয়ে।

যোগীনবাবু করিডরের একপাশে দাঁড়িয়ে একজন কন্ট্রাক্টরের সঙ্গে কথা বলছিলেন, তাঁর পাশে ছিল জগদীন্দ্র ও শচীন্দ্র।

কিরীটীর পরিধানে ইউ. পি.র পোশাক ছিল—চোস্ত পায়জামা, গ্রে কলারের শেরওয়ানী, মাথায় কালো টুপি। চোখে চশমা। মুখে পাইপ।

যোগীনবাবুই সর্বাগ্রে এগিয়ে এলেন কিরীটী গাড়ি থেকে নামতেই তার সামনে।

নমস্তে। কিরীটী বলে যোগীনবাবুকে সম্বোধন করে।

নমস্তে। যোগীনবাবু বলেন, অর্জুনপ্রসাদ মিশ্র বোধ হয় আপনি!

কিরীটী মৃদু হেসে বলে, হ্যাঁ।

জগদীন্দ্র ও শচীন্দ্র চেয়েছিল কিরীটীর দিকে।

দীর্ঘ বলিষ্ঠ চেহারা—মাথার চুলে রগের দুপাশে রুপালী ছোঁয়া লেগেছে যদিও, তবু মনে হয় বার্ধক্য যেন ঠিক আজও ওর দেহকে ছুঁতে পারেনি।

মিসেস চৌধুরীর সঙ্গে আমি একবার দেখা করতে চাই।

নিশ্চয়ই। আপনি বসবেন চলুন, আমি খবর দিচ্ছি ভিতরে।

চলুন।

জগদীন্দ্র ও শচীন্দ্রই প্রশ্ন করে, ইনি?

যোগীনবাবু তাড়াতাড়ি থেমে বলেন, পরিচয় করিয়ে দিই—**এরা স্বর্গত** মিঃ চৌধুরীর ছোট ভাইয়ের দুই ছেলে—জগদীন্দ্র ও শচীন্দ্রকুমার চৌধুরী।

ও, নমস্কার। কিরীটী হাত তুলল।

ওরা দুই ভাইও প্রতিনমস্কার জানায় ঃ নমস্কার।

আর ইনি—অর্জুনপ্রসাদ মিশ্র—আমাদের বিজনেস অ্যাডভাইসার হয়ে শীগগিরই আসছেন—উনি—

জগদীন্দ্র ও শচীন্দ্র পরস্পর পরস্পরের মুখের দিকে তাকায়। কিন্তু কেউ কোন কথা বলে না।

নিচের তলাতে গেস্টরুমেই কিরীটীর থাকবার ব্যবস্থা হয়েছিল।

যোগীনবাবু যেতে যেতে গেস্টরুমের দিকে তাকিয়ে একসময় কিরীটীকে প্রশ্ন করলেন, কিছুদিন আপনি এখানেই থাকবেন তো?

হ্যাঁ, বুঝতেই পারছেন, সব কছু বুঝে নিতে হবে সর্বপ্রথম মিসেস চৌধুরীর কাছ থেকে। এত বড় বিজনেস বুঝতে হলে মাসখানেক খুব কম করেও সময় তো লাগবেই।

তা তো লাগবেই।

হ্যাঁ, ভাল কথা, যে গাড়িটা করে আমি এলাম, সেটা আমার গাড়ি নয়—আমার **এক** বন্ধুর গাড়ি। কাল সকালেই আবার গাড়ি নিয়ে কলকাতায় ফিরে যাবে।

আপনি কিছু ভাববেন না, সব ব্যবস্থা আমি করব।

গাড়ির ক্যারিয়ারে আমার দুটো স্যুটকেস আছে—

সে আমি নামিয়ে নেবার ব্যবস্থা করছি।

কথা বলতে বলতে দুজনে এসে ইন্দালয়ের গেস্টরুমে প্রবেশ করল।

পাশাপাশি দুটি ঘর। একটি বড় সাইজের, অন্যটি অপেক্ষাকৃত ছোট সাইজের। একটিতে শয়ন ও অন্যটিতে বসবার ব্যবস্থা। দুই ঘরে যাতায়াত করবার জন্য মধ্যবর্তী একটি দরজা আছে, এবং ওই দরজাটি শয়নকক্ষ থেকে বন্ধ করে দেওয়া যায়।

সর্বপ্রকার আধুনিক ও আরামদায়ক আসবাবপত্রে ঘর দুটি সুন্দর করে সাজানো, ঠিক যেন কলকাতা শহরের কোন বড় হোটেলের সুইট। শয়নকক্ষের সঙ্গে অ্যাটাচড্ বাথরুম।

যোগীনবাবু ওই কক্ষে কিরীটীকে পৌঁছে দিয়ে বললেন, আপনি ততক্ষণ একটু বিশ্রাম করুন, চা পান করুন, ভেতরে আমি খবর দিচ্ছি।

যোগীনবাবু চলে গেলেন।

একটু পরে একজন ভৃত্য কিরীটীর স্যুটকেস দুটো ঐ কক্ষে পৌঁছে দিয়ে চলে গেল।

কিরীটী শয়নকক্ষে প্রবেশ করে কক্ষের মধ্যবর্তী দরজাটা বন্ধ করে পথের বেশভূষা বদল করে নিল। পায়জামা ও পাঞ্জাবির ওপর একটা গরম শাল গায়ে জড়িয়ে নিল।

বেশভূষা বদল করে একটা সোফায় বসে সবে পাইপটায় নতুন করে অগ্নিসংযোগ করেছে, মধ্যবয়সী একটি ভৃত্য কক্ষে এসে প্রবেশ করল চায়ের ট্রে হাতে। ট্রের ওপরে শুধু চায়ের সরঞ্জামই নয়, ঐ সঙ্গে দু-তিনটে প্লেটে বিস্কিট, পেস্ট্রি, স্যাণ্ডউইচ, দু-চার রকম মিষ্টি এবং কিছু ড্রাই ফ্রুটস্। লোকটির চেহারা দেখে কিরীটীর বাঙালী বলেই মনে হয়, তবু হিন্দিতেই জিজ্ঞাসা করে তাকে, কেয়া নাম তুমারা?

বাবুজী, আমি বাঙালী, আমার নাম গণেশ সরকার। একটু থেমে শুধোয়, চা ঢালি বাবুজী?

ঢালো।

আপনি বাঙালী?

না গণেশ, তবে বহু বছর বাংলাদেশে আছি, বলতে পারো এক প্রকার বাঙালীই বনে গিয়েছি।

গণেশ মৃদু হাসল। হাসিটা যেন খুশিরই মনে হয়।

বয়েস গণেশের পঞ্চাশের কাছাকাছি হবে বলেই মনে হয়। মাথার ২/৩ অংশ চুল পেকে সাদা হয়ে গেছে। সামনের দিকে অনেকটা টাক।

বেঁটে গোলগাল চেহারা। পরিষ্কার একটা ধুতি ও হাফসার্টের ওপর মোটা একটা সোয়েটার গায়ে।

ক' চামচ চিনি দেবো বাবুজী?

দু' চামচ দাও।

রাণীমা আমাকেই বলেছেন আপনাকে দেখাশোনা করতে। আপনি তো এখন কিছুদিন এখানে থাকবেন?

হ্যাঁ, কিন্তু রাণীমা কে?

আজ্ঞে, এ বাড়ির কর্ত্রী

তাঁকে বুঝি তোমরা রাণীমা বলে ডাকো? কিরীটী চায়ের কাপটা হাতে নিয়ে চুমুক দিতে দিতে প্রশ্নটা করে ওর মুখের দিকে তাকিয়ে।

আজ্ঞে, চাকরবাকর, দারোয়ান, ড্রাইভার আমরা সকলেই ওঁকে রাণীমাই বলি।

আর সরকারবাবু?

তিনি শুধু মা বলেই ডাকেন।

আর দাদাবাবুরা?

তারা ডাকে সবাই বড়মা বলে।

ওরা তো সকলে তোমাদের রাণীমার দেওরের ছেলেমেয়ে, তাই না গণেশ?

আজ্ঞে।

গণেশ।

আজ্ঞে?

এ বাড়িতে তুমি কতদিন কাজ করছো?

তা বাবুজী, জীবনটা তো একরকম এখানেই কেটে গেল। কুড়-বাইশ বছরের সময় এসেছিলাম—

ও, তবে তো তুমি তোমাদের কর্তাবাবুকেও দেখেছ?

দেখেছি বৈকি। যেমন চেহারা তেমনি রূপ আর তেমনি ছিল দরাজ মন, ঠিক রাজা-মহারাজাদের মতই।

তোমাকে খুব ভালবাসতেন মনে হচ্ছে!

শুধু আমাকে কেন বাবুজী, সকলের প্রতিই তাঁর সমান দয়া ছিল। তাঁর সামনে গিয়ে দাঁড়াতে কারো কখনো এতটুকু ভয় করেনি।

PATHAGAR.NET

আর তোমাদের রাণীমা?

রাণীমা! ওরে বাবা, না ডাকলে কারো সামনে গিয়ে দাঁড়াবার সাহস আছে নাকি!

খুব ভয় করো বুঝি সবাই তাঁকে?

শুধু ভয়! বাঘের মত সবাই ভয় করে তাঁকে। তবে আমাকে খুব স্নেহ করেন।

ওই সময় জয়ন্ত চৌধুরী এসে ঘরে প্রবেশ করল।

নমস্কার, মিস্টার মিশ্র।

নমস্কার।

জয়ন্তকে ঘরে ঢুকতে দেখে গণেশ ঘর থেকে নিঃশব্দে বের হয়ে গেল।

বসুন মিঃ চৌধুরী। কিরীটী জয়ন্ত চৌধুরীর দিকে তাকিয়ে বলে, বসুন—দাঁড়িয়ে রইলেন কেন?

না, বসব না। আপনাকে ডাকতে এসেছি—বড়মা আপনাকে ডেকে পাঠিয়েছেন। চলুন, ওঠা যাক্। জয়ন্ত চৌধুরী বললে।

তাহলে চলুন, দেখা করেই আসি। কিরীটী উঠে দাঁড়াল।

॥ পাঁচ ॥

দরজার দিকে এগোচ্ছিল কিরীটী ; কিন্তু জয়ন্ত চৌধুরী বাধা দিলে, বললে, না, ও দরজা দিয়ে নয়। আসুন, এইদিকে।

কিরীটীকে নিয়ে জয়ন্ত শয়নঘরের মধ্যে গিয়ে প্রবেশ করল।

শয়নঘরের মধ্যে আর একটি দরজা ছিল।

কিরীটী ভেবেছিল, সে দরজাটা বুঝি পাশের ঘরে যাবার জন্য, কিন্তু দরজাটা খুলতেই দেখা গেল, তার অনুমান ভুল—ঘর নয় সরু একটা বারান্দা। বারান্দাটা অন্ধকার ছিল—সুইচ টিপে বারান্দার আলোটা জ্বেলে দিল জয়ন্ত চৌধুরী।

জয়ন্ত চৌধুরী আগে আগে চলল, কিরীটী তাঁকে অনুসরণ করে নিঃশব্দে। বারান্দার শেষপ্রান্তে সিঁড়ি। সিঁড়িটাও অন্ধকার ছিল। সিঁড়ির আলোটা জ্বেলে দিল জয়ন্ত চৌধুরী।

সিঁড়িটা খুব চওড়া নয়। এবং দেখলেই বোঝা যায় সিঁড়িটা বহুদিন ব্যবহৃত হয়নি—ধাপে ধাপে ধুলো জমে আছে, আর বদ্ধ হাওয়ায় একটা ভ্যাপসা গন্ধ।

আগে আগে জয়ন্ত চৌধুরী, পশ্চাতে কিরীটী ধাপের পর ধাপ বেয়ে উঠতে থাকে। জয়ন্ত চৌধুরীই একসময় বলে, যে-ঘরে আপনাকে থাকতে দেওয়া হয়েছে, সেটা আগে গেস্টরুম ছিল না। ওই ঘরেই যে সব বাঈজী ইন্দ্রালয়ে মুজরা নিয়ে আসত, রায় বাহাদুর হরপ্রসাদের আমলে তাদের থাকবার ব্যবস্থা ছিল। এবং এই সিঁড়িপথেই রাত্রে প্রয়োজন হলে হরপ্রসাদ শোনা যায় নাকি সবার চোখের আড়ালে ওই ঘরে যাতায়াত করতেন।

এবং এখন আর ব্যবহার হয় না—তাই না? কিরীটী মৃদু হেসে বলে।

না। রায় বাহাদুরের মৃত্যুর দুবছর আগেই ও-পাট শেষ হয়ে গিয়েছিল।

কেন?

জীবনের শেষ দুটো বছর তো পক্ষাঘাতে একেবারে পঙ্গু হয়ে শয্যাশায়ী হয়ে ছিলেন **তিনি** যে!

পক্ষাঘাত?

হ্যাঁ। সারাটা জীবন ধরে যেমন প্রচুর অর্থোপার্জন করেছিলেন ব্যবসা করে, তেমনি উচ্ছৃঙ্খলতারও চরম করে গিয়েছেন। গানের নেশা ছিল—নিজে যেমন গাইতে পারতেন, তেমনি শুনতেও ভালবাসতেন, আর সেই সঙ্গীতের নেশার পথ ধরেই দুটি জিনিস তাঁর জীবনে এসেছিল—সুরা আর নারী।

কিরীটী সিঁড়ি দিয়ে উঠতে উঠতে শুনতে থাকে।

এবং সেই সুরা আর নারী শেষটায় তাঁকে বুঝি গ্রাস করেছিল এবং পরবর্তীকালে একই ব্যাপারের পুনরাবৃত্তি ঘটেছিল জিতেন্দ্র চৌধুরীর বেলাতেও।

জয়ন্ত চৌধুরী বলতে থাকে ঃ তবু একটা কথা কি আমার মনে হয় জানেন মিস্টার রায়?

কি? কিরীটী তাকাল জয়ন্ত চৌধুরীর দিকে।

জয়ন্ত চৌধুরী বলে, মনে হয় জিতেন্দ্র চৌধুরী যা হয়েছিলেন, হয়তো তিনি তা হতেন না—সম্পূর্ণ অন্য মানুষ একজন হতে পারতেন, যদি না রায় বাহাদুরের কন্যা চিত্রাঙ্গদা দেবীর সঙ্গে তাঁর বিবাহ হত।

একথা বলছেন কেন?

কিরীটীর প্রশ্নের আর জবাব দেওয়া হল না—সিঁড়ি শেষ হয়ে গিয়েছিল এবং সিঁড়ির শেষ ধাপে পা দিয়ে জয়ন্ত বলে, এই যে আমরা এসে গিয়েছি।

জয়ন্ত চৌধুরীর কথাটা শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই কিরীটীর নজরে পড়লো—সিঁড়ির শেষ সরু একটা ল্যাণ্ডিং আর তার পরেই বন্ধ একটা দরজা।

পকেট থেকে একটা চাবি বের করে জয়ন্ত চৌধুরী দরজার ফোকরে চাবি ঘুরিয়ে দরজাটা খুলে ফেলল।

সরু একফালি বারান্দা সামনেই।

আসুন!

কিরীটী এগিয়ে গেল। জয়ন্ত চৌধুরী পুনরায় আবার দরজাটা বন্ধ করে দিলে।

বারান্দাটা অন্ধকার।

একটু এগুতেই বাড়ির পশ্চাৎভাগ চোখে পড়ল।

অনেকখানি জায়গা জুড়ে বাড়ির পশ্চাৎভাগে বাগান—তার মধ্যে মধ্যে যে খোলা জায়গা, সেই সব জায়গা জুড়ে সব তাঁবু পড়েছে।

তাঁবুতে তাঁবুতে আলো জ্বলছে।

বাগানের মধ্যে ওই সব তাঁবু কেন? কিরীটী প্রশ্ন করে।

বড়মার জন্মতিথি উৎসবের জন্য সব তাঁবু খাটানো হয়েছে, আসুন।

বলতে বলতে এগিয়ে গিয়ে সামনেই একটা বন্ধ দরজার গায়ে ঠুক ঠুক করে কয়েকটা মৃদু টোকা দিল জয়ন্ত চৌধুরী।

সঙ্গে সঙ্গেই প্রায় দরজাটা খুলে গেল।

জয়ন্ত চৌধুরী আহ্বান জানাল, আসুন মিস্টার রায়।

কিরীটী ভেতরে পা দিল।

পায়ে চপ্পল থাকলেও পায়ের তলায় একটা নরম কোমল স্পর্শ পায় কিরীটী। দামী

পুরু কার্পেটে পা যেন ডুবে গিয়েছে।

উজ্জ্বল আলো জ্বলছিল ঘরের মধ্যে। সেই আলোতেই ঘরের চতুর্দিকে একবার দৃষ্টিপাত করল কিরীটী। মনে হল তার ঘরটা বসবার ঘর।

চারদিকে পুরনো আমলের ভারী ভারী সব সোফা ও কাউচ। গোটা দুই আধুনিক ডিভানও আছে সেই সঙ্গে। জানলায় জানলায় সব হাফ গোলাপী রঙের পর্দা ও ভারি পর্দা ঝুলন্ত ক্রীম রঙের।

ঘরের আবহাওয়া বেশ উষ্ণ ও আরামদায়ক—কিরীটী চেয়ে দেখলো ঘরের মধ্যে ফায়ার-প্লেসে আগুন জ্বলছে।

পাশেই একজন বয়স্ক দাসী দাঁড়িয়ে ছিল। সে-ই ঘরের দরজা খুলে দিয়েছিল। তার দিকে তাকিয়েই জয়ন্ত প্রশ্ন করল, সুরতিয়া, বড়মা কোথায়?

আপনারা বসুন, রাণীমা গোসলঘরে ঢুকেছেন—গোসল হয়ে গেলেই আসবেন।

অদ্ভুত মিষ্টি ও সুরেলা কণ্ঠস্বর যেন সুরতিয়ার। কথা তো বলল না, কিরীটীর মনে হল, যেন সে গান গেয়ে উঠল। কারো সামান্য কথাও এমন মিষ্টি সুরেলা হতে পারে এ যেন কিরীটীর ধারণার বাইরে এবং সেই কারণেই বোধ হয় সে মুগ্ধ দৃষ্টিতে সুরতিয়ার মুখের দিকে তাকিয়েছিল।

সুরতিয়ার বয়স হয়েছে। চল্লিশ-পঁয়তাল্লিশের নীচে নয় বলেই মনে হয়। গায়ের বর্ণ শ্যাম হলেও দেহের গড়নটি কিন্তু ভারি চমৎকার। এবং এখনো বেশ আঁটসাঁট। মুখের কোথায়ও যেন এখনো বয়সের ছাপ তেমন পড়েনি। বেশভূষা রাজপুতানী মেয়েদের মত।

সুরতিয়া ওদের বসতে বলে মধ্যবর্তী দরজাপথে অন্তর্হিত হল।

বসুন মিস্টার রায়।

কিরীটী বসে না। ঘরের দেওয়ালে যে খানতিনেক বড় বড় অয়েল-পেন্টিং ছিল, সেইগুলোর দিকে তাকিয়ে দেখতে লাগল।

ওই অয়েল-পেন্টিংগুলো কাদের?

কিরীটীর প্রশ্নে জয়ন্ত চৌধুরী এগিয়ে গিয়ে একটি ছবির সামনে দাঁড়াল এবং বললে—এ হচ্ছে রায় বাহাদুর হরপ্রসাদ ব্যানার্জির তৈলচিত্র। দক্ষিণ দিককার দেওয়ালে ওটা চিত্রাঙ্গদা দেবীর মা—সারদা দেবী। আর ওই যে উত্তরের দেওয়ালে উনি আমাদের বড় জেঠামশাই জিতেন্দ্র চৌধুরী।

ওদের কথাবার্তার মধ্যে চিত্রাঙ্গদা দেবী ঘরে এসে ঢুকলেন।

চিত্রাঙ্গদা দেবীর দিকে তাকিয়ে কিরীটী যেন সত্যিই মুগ্ধ হয়ে যায়। গায়ের রঙটা একেবারে টকটকে গৌর। মুখের ও দেহের গঠনটি যেন সত্যিই অনিন্দনীয়। পরনে শ্বেতশুভ্র দামী সিল্কের থান। অনুরূপ ফুলহাতা ব্লাউজ গায়ে। সম্পূর্ণ নিরাভরণা। কিন্তু তথাপি তাঁর চেহারার মধ্যে এমন একটা আভিজাত্য আছে যে, মুগ্ধ না হয়ে পারা যায় না।

চোখে সোনার ফ্রেমের সৌখীন চশমা। চোখের দৃষ্টি যেন অন্তর্ভেদী।

বাঁ হাতে একটা সাদা হাতীর দাঁতের বাঁটওয়ালা লাঠি।

গত কয়েক বছর ধরে বাতে ভুগছেন, বেশী হাঁটা-চলা করতে পারেন না। এবং হাঁটা-চলা যতটুকু করেন, তাও ওই লাঠির সাহায্যেই।

বড়মা!

জয়ন্ত চৌধুরীই সসম্ভ্রমে ডাকে।

চিত্রাঙ্গদা দেবী কিরীটীর মুখের দিকে চেয়েছিলেন।

বড়মা, ইনিই মিস্টার রায়। জয়ন্ত চৌধুরী কথাটা শেষ করে—মানে, অর্জুন মিশ্র।

নমস্কার। হাত তুলে নমস্কার জানালেন চিত্রাঙ্গদা দেবী।

কিরীটীও প্রতিনমস্কার জানায়।

বসুন। বসো জয়ন্ত।

সকলেই উপবেশন করে, মুখোমুখি সোফায়।

জয়ের কাছে শুনেছেন নিশ্চয়ই সব কথা, মিস্টার মিশ্র?

হ্যাঁ।

আপনি অন্য নামে, অন্য পরিচয়ে এসেছেন, আমি খুব খুশী হয়েছি মিস্টার মিশ্র। বলে চিত্রাঙ্গদা দেবী জয়ন্তর দিকে তাকালেন ঃ ওর যেন কোন রকম অসুবিধা না হয়, তুমি কিন্তু দেখো জয়ন্ত।

আপনাকে কিছু ভাবতে হবে না বড়মা। জয়ন্ত বলে।

তুমি কটা দিন এখানে থাকছ তো? চিত্রাঙ্গদা দেবী শুধালেন।

উৎসব পর্যন্ত আছি।

কেন, কটা দিন বেশি থাক না?

না বড়মা, ঐ সময় আমার পক্ষে বেশি দিন থাকা—

জয়ন্ত চৌধুরীর কথা শেষ হল না, সুরতিয়া এসে ঘরে ঢুকল, রাণীমা!

কি? ভ্রূ কুঁচকে তাকালেন চিত্রাঙ্গদা দেবী সুরতিয়ার দিকে।

সুধন্য এসেছে।

কে—কে এসেছে?

সুধন্য। বললাম, রাণীমা এখন ব্যস্ত আছেন, দেখা হবে না। কিন্তু কিছুতেই আমার কথা শুনছে না—

সুরতিয়ার কথা শেষ হল না, খোলা দরজাপথে একজন এসে ঘরে ঢুকে পড়ল ঐ সময়। সকলেরই দৃষ্টি একসঙ্গে গিয়ে আগন্তুকের ওপর পড়ে।

আগন্তুকের চেহারা ও বেশভূষা সত্যিই দৃষ্টি আকর্ষণ করে। রোগা পাতলা চেহারা। এককালে গায়ের রঙটা হয়ত অত্যন্ত ফর্সাই ছিল, এখন কেমন যেন তামাটে বর্ণ হয়েছে।

একমাথা ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া চুল—লালচে তৈলহীন রুক্ষ। কতকাল যে তেলের সঙ্গে সম্পর্ক নেই কে জানে! ছোট ছোট পিঙ্গল চোখ, উন্নত নাসা, ঠোঁট দুটো একটু পুরু। মুখভর্তি খোঁচা দাড়ি। মাথার চুল ও দাড়ির রঙ তামাটে। পরনে একটা কালো গরম প্যান্ট ও গায়ে গলাবন্ধ খয়েরি রঙের গরম কোট। হাতে একটা ফেল্ট ক্যাপ। পায়ে বুট জুতো।

নমস্তে রাণীমা। আগন্তুকই প্রথমে কথা বললে।

আবার কেন এসেছ? তীক্ষ্ণ কণ্ঠে প্রশ্ন করলেন আগন্তুককে চিত্রাঙ্গদা দেবী।

কি করি বলুন, পকেট যে খালি হয়ে গেল!

কথাগুলো বলত বলতে আগন্তুক হাসল। ময়লা একসারি দাঁত যেন ঝিকিয়ে উঠল।

বিরক্তিভরা কণ্ঠে চিত্রাঙ্গদা বললেন, তুমি না বলেছিলে সেদিন টাকা নেবার সময় আর ছ'মাসের মধ্যে টাকা চাইতে আসবে না?

বলেছিলাম তো। লেকিন টাকা যে সব ফুরিয়ে গেল।

একটি পয়সাও আর তোমাকে আমি দেব না। যাও বের হয়ে যাও।

গোসা করছেন কেন রাণীমা! সুধন্য is a poor man—তার ওপর গোসা করে কি ফায়দা বলুন! তাছাড়া আপনার কাছে দু-পাঁচশ তো nothing—কিছুই না। কিছু টাকা দিয়ে দিন, চলে যাই। জানি, আমার এ সুরৎ আপনি দেখতে চান না। টাকা দিন কিছু চলে যাই।

একটা পয়সাও আর দেব না তোমাকে আমি। কঠিন কণ্ঠে বলে ওঠেন চিত্রাঙ্গদা দেবী।

দেবেন—দেবেন। আমি জানি, শেষ পর্যন্ত আপনি দেবেনই।

সুরতিয়া? চিত্রাঙ্গদা দেবী ডাকলেন।

রাণীমা! সুরতিয়া এগিয়ে এল।

সুধন্য তাড়াতাড়ি সুরতিয়ার দিকে চেয়ে বলে ওঠে, তুমি যাও সুরতিয়া—অনেকটা পথ হেঁটে এসেছি, বহুত পিয়াস লেগেছে, এক কাপ গরম চা তৈরী করে আনো। আরো কিছু মিঠাই—ভুক ভি লেগেছে।

ব্যাপারটাকে যেন অত্যন্ত লঘু করে সুধন্য সুরতিয়ার দিকে চেয়ে কথাগুলো বললে।

ওকে এখান থেকে বের করে দে সুরতিয়া! চিত্রাঙ্গদা দেবী সুরতিয়ার দিকে চেয়ে বললেন।

সুরতিয়া কিন্তু দাঁড়িয়ে থাকে। বিব্রত, কেমন যেন মুহ্যমান তাকে মনে হয়।

যাও সুরতিয়া, চা আর মিঠাই নিয়ে এস। সুধন্য আবার বলে সুরতিয়ার দিকে চেয়ে।

সুরতিয়া! তীক্ষ্ণ কণ্ঠে আবার ডাকেন চিত্রাঙ্গদা দেবী। কি বললাম শুনতে পাচ্ছিস না!

সুধন্য এবার হঠাৎ এগিয়ে এসে একটা সোফার ওপর বসে পড়ল। এবং এতক্ষণে বোধ হয় তার ঘরের মধ্যে উপস্থিত কিরীটী ও জয়ন্তর দিকে নজর পড়ল।

তাড়াতাড়ি সে আবার সোফা ছেড়ে উঠে পড়ল, ওঃ, আপনারা এখানে আছেন! আচ্ছা, তাহলে আমি পাশের ঘরেই যাচ্ছি। আপনার কাজ সেরে আপনি আসুন রাণীমা।

সুধন্য কথাগুলো বলে ঘর থেকে বের হয়ে গেল।

সুরতিয়া আর চিত্রাঙ্গদা দেবী দুজনেই যেন পাথর। অদ্ভুত একটা স্তব্ধতা যেন ঘরের মধ্যে থমথম করে।

কারো মুখে কোন কথা নেই। আকস্মিক ঘটনাটা যেন সকলকেই কেমন স্তব্ধ করে দিয়েছে।

॥ ছয় ॥

স্তব্ধতা ভঙ্গ করলেন চিত্রাঙ্গদা দেবীই। বললেন, মিস্টার মিশ্র, আপনারা একটু বসুন, আমি আসছি—

কথাগুলো বলে চিত্রাঙ্গদা দেবী সোফা থেকে উঠে দাঁড়ালেন এবং লাঠি হাতে আস্তে আস্তে ঘর থেকে বের হয়ে গেলেন।

কিরীটী বুঝতে পারে, চিত্রাঙ্গদা দেবী যেন বেশ একটু বিচলিত। বিব্রত।

মিস্টার চৌধুরী!

কিরীটীর ডাকে জয়ন্ত চৌধুরী ফিরে তাকাল, কিছু বলছিলেন?

এই লোকটি কে?

চিনতে পারলাম না ঠিক। জয়ন্ত চৌধুরী মৃদু কণ্ঠে জবাব দিল।

আগে কখনো ওকে এখানে দেখেননি? কিরীটী পুনরায় প্রশ্ন করে।

না, এই প্রথম দেখলাম।

কিন্তু মনে হল লোকটার এ বাড়িতে আসা-যাওয়া আছে!

আমারও সেই রকম মনে হচ্ছে, তবে আমি তো এখানে থাকি না।

এবং আপনার বড়মার বিশেষ পরিচিতও মন হল। কিরীটী আবার বলে।

বিশেষ পরিচিত! বিস্মিত হয়েই তাকাল জয়ন্ত চৌধুরী কিরীটীর মুখের দিকে।

হ্যাঁ, দেখলেন না—কেমন করে এ ঘরের মধ্যে এসে সোজা ঢুকে পড়ল, ঢুকে টাকা চাইল। ওর এ ঘরে ঢোকা ও চাওয়ার ধরনটা দেখে মনে হল মধ্যে মধ্যে এসে ও ওইভাবে আপনার বড়মার কাছ থেকে টাকা নিয়ে যায়—আর আপনার বড়মার কথা শুনেও তো তাই মনে হল।

সেই রকমই তো মনে হল। জয়ন্ত চৌধুরী মৃদু কণ্ঠে বলে।

মনে হল না মিস্টার চৌধুরী, তাই—কিন্তু কেন? আপনার বড়মা ওকে মধ্যে মধ্যে টাকা দেন কেন?

শেষের কথাগুলো যেন কতকটা স্বগতোক্তির মতই মনে হল জয়ন্তর।

কি বললেন? জয়ন্ত চৌধুরী প্রশ্ন করে।

না, কিছু না। কিন্তু লোকটা কে হতে পারে? আপনাদের পরিচিত বা আপনজন কেউ নয় ; তাহলে তো আপনারা চিনতেনই। অথচ একেবারে নিঃসম্পর্কীয় বাইরের কেউ হলেই বা ওইভাবে অন্দরে এই রাত্রে সোজা একেবারে রাণীমার খাসমহলে এসে প্রবেশ করেই বা কি করে, আর অমন করে নিঃসঙ্কোচে টাকার দাবিই বা করে কি করে?

দাবি!

নয় কি—ওর টাকা চাওয়ার ধরনটা দেখলেন না! শুধু দাবিই নয়, ও যে মধ্যে মধ্যে টাকা পেয়েও থাকে, তা তো শুনলেন আপনার বড়মার মুখেই। হ্যাঁ, তাই তো শুনলাম।

এই সময় সুরতিয়া এসে আবার ঘরে ঢুকল। হাতে তার ট্রেতে চায়ের সরঞ্জাম। ট্রে-টা সামনের একটা গোল টেবিলের ওপরে নামিয়ে রেখে সে জিজ্ঞাসা করল, চা তৈরী করে দেব বাবুজী?

কিরীটী সঙ্গে সঙ্গে বলল, হ্যাঁ হ্যাঁ, দাও।

সুরতিয়া চা তৈরী করতে থাকে। ঝুঁকে পড়ে নীচু হয়ে সুরতিয়া কাপে চা ঢালতে ঢালতে জিজ্ঞাসা করে, কত চিনি দেব বাবুজী?

দু' চামচ। কিরীটী বলে।

জয়ন্ত চৌধুরীকে চিনি সম্পর্কে কোন প্রশ্ন করে না সুরতিয়া। কিরীটী বুঝতে পারে সুরতিয়া জানে জয়ন্ত চায়ে কতটুকু চিনি খায়, তাই হয়ত ও সম্পর্কে কোন প্রশ্ন বা জিজ্ঞাসাবাদ করল না।

সুরতিয়া চা তৈরী করছে নীচু হয়ে ঝুঁকে। মুখটা তার ভাল করে স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে না। কিন্তু তার হাত নাড়া দেখে কিরীটীর মনে হয় সুরতিয়া যেন একটু চিন্তিত—একটু বিচলিত।

চা সে তৈরি করছে বটে ওদের জন্য, কিন্তু মনটা তার বোধ হয় চা তৈরি করার মধ্যে নেই। অন্য কোথাও বিক্ষিপ্ত হয়ে আছে।

কিরীটী তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে লক্ষ্য করছিল সুরতিয়াকে।

চা তৈরি করে দিয়ে সুরতিয়া আর দাঁড়াল না। ঘর থেকে বের হয়ে গেল।

কিরীটীর চোখের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি সুরতিয়াকে ঘর ছেড়ে চলে যাওয়া পর্যন্ত লক্ষ্য করে কিরীটীর মনে হল যেন একটু দ্রুত এবং চঞ্চল পায়েই ঘর ছেড়ে গেল সে।

কিরীটী এবার জয়ন্ত চৌধুরীর দিকে তাকিয়ে আবার ডাকল, মিস্টার চৌধুরী!

কিছু বলছিলেন?

হ্যাঁ। এই দাসীটি অনেকদিন ইন্দ্রালয়ে আছে, না? মানে ঐ সুরতিয়া—

হ্যাঁ, অনেক দিনকার দাসী।

আপনার স্বর্গীয় জেঠামশাইয়ের আমলের বোধ হয়?

মৃদু কণ্ঠে এবার জবাব দেয় জয়ন্ত, হ্যাঁ, ওর যখন ভরা যৌবন, তখন ও এখানে আসে

এখন বয়স কত হবে ওর?

তা ধরুন চল্লিশ-পঁয়তাল্লিশ তো হবেই।

সেই রকম আমারও মনে হল।

একটা কথা বোধ হয় আপনাকে আমার বলা উচিত,—একটু ইতস্তত করে যেন জয় চৌধুরী।

কি বলুন তো?

আপনাকে তো একটু আগেই বলছিলাম, শ্বশুরের মত জামাইয়ের—অর্থাৎ আমা জেঠামশাইয়ের স্ত্রীলোকের ব্যাপারে একটু দুর্নাম ছিল—

কিরীটী ওর মুখের দিকে তাকাল।

জয়ন্ত চৌধুরী বলে, ওই সুরতিয়া কিন্তু এ দেশের মেয়ে নয়, একদিন এসেছিল ও স্বামীর সঙ্গে রাজপুতানা থেকে।

রাজপুতানা!

হ্যাঁ, জিতেন্দ্র চৌধুরীর ঘোড়ার শখ ছিল। সেই ঘোড়ার দেখাশোনা করবার জ জশলমীর থেকে ভূপৎ সিং আসে, সঙ্গে আসে তার তরুণী বউ সুরতিয়া। তখন উদ্ভিন্নযৌবনা। সুরতিয়া এখানে আসার সঙ্গে সঙ্গে বলা বাহুল্য জিতেন্দ্র চৌধুরীর নজ পড়ে গেল—সঙ্গে সঙ্গে অন্দরের কাজে বহাল হল সে।

তারপর?

ভূপৎ সিং কৃতার্থ হয়ে গেল। বেচারী জানত না তো যে জিতেন্দ্র চৌধুরীর ও বদান্যতার অন্তরালে কি উদ্দেশ্য লুকিয়ে আছে! যা হোক, সুরতিয়া অন্দরে এসে ঢুক একেবারে চিত্রাঙ্গদা দেবীর খাস চাকরাণী হয়ে—

বলেন কি!

হ্যাঁ। কিন্তু তার আগে থেকেই জিতেন্দ্র চৌধুরী পৃথক ঘরে শয়ন করতেন।

কেন, চিত্রাঙ্গদা দেবীর সঙ্গে কি তাঁর সদ্ভাব ছিল না?

না, এবং সেটা বিবাহের কিছুদিন পর থেকেই।

চিত্রাঙ্গদা দেবীর বাবা জানতেন না সে-কথা?

মৃত্যুর বৎসর দুই পূর্বে জানতে পেরেছিলেন এবং মেয়ে-জামাইয়ের মনো-মালিন্যটা মিটিয়ে দেবার চেষ্টাও করেছিলেন, কিন্তু সফল হননি। আর তার কারণও বড়মা—

কি রকম?

সে তো আপনাকে আগেই বলেছি—আমার ধারণা, তার মানে বড়মার চিরদিনের ঐ উদ্ধত দাম্ভিক প্রকৃতি ও অন্যকে সর্বক্ষণ দাবিয়ে রাখবার সেই বিচিত্র complex-এর জন্যই—

মনোমালিন্যের কারণটা কি স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে, সেটাই আপনি মনে করন?

তাছাড়া আর কি হতে পারে?

হুঁ, তারপর?

তারপর বড়মার বাবা তাঁর সমস্ত সম্পত্তি স্থাবর-অস্থাবর **একমাত্র** মেয়ের নামে লিখে দেন।

আপনার জেঠামশাই তাতে কিছু বলেননি?

না।

আশ্চর্য!

ব্যাপারটা শোনার পর আমরাও কম আশ্চর্য হইনি। যাই হোক, তারপর বড়মার বাবা রায় বাহাদুরের মৃত্যুর পর জেঠামশাই আরো বছর পাঁচেক বেঁচে ছিলেন। তিনি তাঁর শিকার, মদ্যপান, গান-বাজনা ও মেয়েমানুষ নিয়েই থাকতেন—বিজনেস বা সংসারের কোন ব্যাপারে কোনদিন মাথা গলাননি। সব কিছু থেকে দূরে থেকেছেন। নীচের মহলেই জেঠামশাই থাকতেন শুনেছি—কদাচিৎ কখনা কালে-ভদ্রে হয়ত ওপরে আসতেন।

কিরীটীর কাছে যখন জয়ন্ত চৌধুরী অতীত ইতিহাস বলছিল, চিত্রাঙ্গদা দেবীর শয়নঘরে তখন অন্য এক পর্ব চলছিল।

চিত্রাঙ্গদা সুধন্যকে নিয়ে তাঁর শয়নঘরে এসে ঢুকলেন।

গতবার টাকা নেওয়ার সময় কি বলেছিলে তুমি? ঘরে ঢুকেই ঘুরে দাঁড়িয়ে চিত্রাঙ্গদা সুধন্যকে প্রশ্ন করেন।

কি জানি, ঠিক মনে পড়ছে না কি বলেছিলাম! কি বলেছিলাম বলুন তো রাণীমা? সুধন্য স্মিতহাস্যে প্রশ্নটা করে চিত্রাঙ্গদার মুখের দিকে তাকাল।

ভুলে গেছো, না?

হ্যাঁ—মনে পড়ছে না সত্যিই বিশ্বাস করুন—

বলেছিলে আর এক বছরের মধ্যে টাকা চাইতে আসবে না।

বলেছিলাম নাকি? তা যদি বলেও থাকি—এক বছর নিশ্চয়ই হয়ে **গেছে।**

তিন মাসও পার হয়নি।

সত্যি! আমি তো ভাবছিলাম এক বছরেরও বেশী হয়ে গেছে।

শোন, তোমার সঙ্গে আমার এবার একটা শেষ বোঝাপড়া দরকার—

তার মানে?

মানে, আজ যা হবার হয়ে যাক শেষবারের মত। আর কখনো জীবনে এ বাড়িতে তুমি পা দেবো না।

বাঃ, তা কি করে হবে! আমার চলবে কি করে? আমার তো আর আপনার মত কাঁড়ি-কাঁড়ি টাকা নেই।

কি করে তোমার চলবে না চলবে, সেটা আমার ভাববার কথা নয়—সেটা সম্পূর্ণ তোমার। তুমি কি করবে না করবে, কিভাবে তোমার চলবে, না চলবে সে তুমিই ভাববে।

আমিই ভাববো!

হ্যাঁ।

কিন্তু তা কি সম্ভব হবে?

আমি তোমার ঠাট্টার পাত্রী নই সুধন্য।

ছিঃ, ছিঃ, তা কি আর আমি জানি না!

শোন, তোমাকে আজ আমি শেষবারের মত কিছু টাকা দেবো একটি শর্তে, ভবিষ্যতে কোন দিন আর একটি আধলাও তুমি আমার কাছে পাবে না—একটি কপর্দকও তোমাকে আর কখনো আমি দেব না। আর তুমি যদি ভবিষ্যতে কখনো এ বাড়ির ত্রিসীমানায় পা দাও তো সেই মুহূর্তে তোমাকে আমি গুলি করে মারব।

মারবেন!

হ্যাঁ, মেরে বাগানে পুঁতে রাখব মাটির নীচে।

সুধন্য যেন কি ভাবল কিছুক্ষণ, তারপর বললে, বেশ তাই হবে। কিন্তু কত দেবেন?

আপাতত এই মুহূর্তে তোমাকে পাঁচ হাজার টাকা দেবো।

পাঁচ হাজার!

হ্যাঁ। আর যদি দেখি দু বছর এ বাড়ির ত্রিসীমানায় তুমি আসোনি তাহলে আরো পাঁচ হাজার টাকা তোমাকে আমি পাঠিয়ে দেবো।

বেশ, তাই হবে। তাহলে এখান থেকে যাবার দিনই টাকাটা নেবো।

এখুনি তোমাকে টাকা নিয়ে এখান থেকে চলে যেতে হবে।

॥ সাত ॥

এখুনি চলে যেতে হবে?

হ্যাঁ।

আপনার জন্মদিন-উৎসব কাল থেকে। কত লোকজন আসবে, কত খাওয়া-দাওয়া নাচ-গান হবে—আর এ সময় আমাকে আপনি তাড়িয়ে দেবেন রাণীমা?

সুধন্যর কথাটা হঠাৎ যেন চিত্রাঙ্গদার মনকে নাড়া দেয়। মনে হয়, সত্যিই তো, এই উৎসবের মুখে লোকটাকে বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দেবেন! কিন্তু পরক্ষণেই মনে হয় আবার, ওর মত একটা জঘন্য প্রকৃতির লোক বুঝি তাঁর সে অনুকম্পারও যোগ্য নয়।

চুপ করে থাকেন চিত্রাঙ্গদা দেবী।

থাকি না দুটো দিন?

না।

কতদিন ভালমন্দ দুটো খাইনি রাণীমা—

আর আপত্তি করতে পারলেন না চিত্রাঙ্গদা দেবী। বললেন, ঠিক আছে, থাক। কিন্তু মাত্র দুদিন, তার বেশি নয়।

বেশ, তাই।

BanglaBook.org

কিন্তু বাড়ির ভেতরে আসবে না, বাইরে বাগানে তাঁবুতে থাকবে।

তাই থাকব।

যাও, এখন তাহলে নীচে যাও।

সুধন্য ঘর থেকে বের হয়ে গেল।

সুধন্য ঘর থেকে চলে যাবার পর চিত্রাঙ্গদা ঘরের দেওয়ালে টাঙানো তাঁর স্বামী জিতেন্দ্রর বিরাট অয়েল-পেন্টিংটার দিকে তাকান।

জিতেন্দ্র যেন তাঁর দিকে তাকিয়ে মিটিমিটি হাসছেন।

চিত্রাঙ্গদার চোখ দুটো যেন জ্বলতে থাকে।

উঃ, কি লজ্জা, কি লজ্জা! তাঁর জন্মমুহূর্ত থেকে যে লজ্জা তাঁর সমস্ত জীবনের সঙ্গে একেবারে ওতপ্রোত হয়ে গেছে, তার হাত থেকে বুঝি সত্যিই কোন দিনই আর মুক্তি নেই।

এতকাল বয়ে এসেছেন সে লজ্জা, এবং যতদিন বাঁচবেন তাঁকে টেনে যেতে হবে।

কিন্তু সত্যি কথা বলতে কি, জিতেন্দ্রর দোষ কি? তার জন্মের জন্য তো জিতেন্দ্র দায়ী নন?

দায়ী যদি কেউ হন তা তাঁর জন্মদাতা —তাঁর বাবা হরপ্রসাদ। যার জঘন্য লালসা এক নর্তকীর কন্যার গর্ভে তাঁর জন্ম দিয়েছিল।

হঠাৎ মনে পড়ে, পাশের ঘরে কিরীটী আর জয়ন্ত এখনো তার জন্য অপেক্ষা করছে। কিন্তু এই মুহূর্তে আর তাদের সামনে গিয়ে দাঁড়াতে ইচ্ছা করছে না চিত্রাঙ্গদা দেবীর।

চিত্রাঙ্গদা ডাকে, সুরতিয়া!

সুরতিয়া ঘরে এসে ঢুকল, ডাকছিলে রাণীমা?

হ্যাঁ। শোন্, ওঘরে গিয়ে জয়ন্তকে বলে দে, শরীরটা ভাল লাগছে না আমার, আজ আর ও ঘরে যাব না।

সুরতিয়া মাথা হেলিয়ে ঘর থেকে বের হয়ে গেল।

পাশের ঘরে গিয়ে যখন ঢুকল, জয়ন্ত আর কিরীটী তখনো গল্প করছে।

রাণীমা বললেন, তাঁর শরীরটা ভাল লাগছে না, এখন আর আসবেন না।

জয়ন্ত আর কিরীটী পরস্পর পরস্পরের মুখের দিকে তাকাল নিঃশব্দে।

সুরতিয়া সংবাদটা দিয়ে আর অপেক্ষা করে না, ঘর থেকে বের হয়ে যায়।

কিরীটী জয়ন্তর মুখের দিকে তাকিয়ে বলে, তাহলে চলুন মিস্টার চৌধুরী, ওঠা যাক।

হ্যাঁ, চলুন।

জয়ন্ত উঠে দাঁড়াল।

পূর্বের সেই সিঁড়িপথেই পুনরায় দুজনে নীচে নেমে এল। এবং কিরীটীকে ঘরে পৌঁছে দিয়ে জয়ন্ত চলে গেল।

কিরীটী পাইপটা ধরিয়ে একটা আরাম-কেদারার ওপর গা ঢেলে দিল—মনের মধ্য তখন তার একটি মুখ বার বার ভেসে ভেসে উঠছে।

সুধন্য!

কে ওই ছেলেটি? চিত্রাঙ্গদা দেবীর কাছ থেকে বোঝা গেল প্রায়ই এসে কিছু কিছু টাকা নিয়ে যায়, চিত্রাঙ্গদা দেবীও ওকে টাকা দেন।

মুখে দেবো না বললেও শেষ পর্যন্ত ওকে দেন।

চিত্রাঙ্গদা দেবীর মত লোকের কাছ থেকে টাকা নিয়ে যাচ্ছে—কোন গূঢ় কারণ না থাকলে নিশ্চয়ই চিত্রাঙ্গদা দেবী ওকে অমন করে বার বার টাকা দিতেন না।

কেন দেন ওকে চিত্রাঙ্গদা দেবী টাকা?

ভয়ে যে টাকা দেন না, তা বোঝা যায়। ভয় পাবার স্ত্রীলোক চিত্রাঙ্গদা দেবী নন। তাঁকে ভয় দেখিয়ে অর্থাৎ ব্ল্যাকমেইল করে টাকা নিচ্ছে সুধন্য, মনে হয় না কিরীটীর।

কিন্তু তার কারণটা কি? কি কারণ থাকতে পারে?

আর একটা মুখও মধ্যে মধ্যে কিরীটীর মনের পাতায় আনাগোনা করছিল। চিত্রাঙ্গদা দেবীর বসবার ঘরে দেওয়ালে টাঙানো ওঁর স্বামী জিতেন্দ্র চৌধুরীর ফটোর মুখখানা।

জিতেন্দ্র চৌধুরী জেনেশুনেই চিত্রাঙ্গদা দেবীকে একদিন বিবাহ করেছিলেন। এক বাঈজী কন্যার ঔরসজাত চিত্রাঙ্গদা দেবী—কথাটা হরপ্রসাদ গোপন করেননি জিতেন্দ্র চৌধুরীর কাছে। লোকটাও একেবারে শান্তশিষ্ট গঙ্গাজলে ধোয়া তুলসী পাতাটি ছিলেন না। গান-বাজনার শখের সঙ্গে নারীপ্রীতিও ছিল তাঁর—প্রীতি না বলে নারীর প্রতি দুর্বলতা বললেই বোধ হয় ভাল হয়। তার প্রমাণ এখনো ইন্দ্রালয়েই রয়েছে—ওই বিগতযৌবনা ভূপৎ সিংয়ের স্ত্রী সুরতিয়া—রাজপুতানী।

এখনো যার দেহের গড়ন অমন, সে যে যৌবনে সত্যিকারের আকর্ষণীয় ছিল বুঝতে কষ্ট হয় না। জিতেন্দ্র চৌধুরীর ওর যৌবনের প্রতি আকর্ষণ হওয়াটা এমন কিছু বিচিত্র নয়।

কে জানে ওই সুরতিয়া শেষ পর্যন্ত জিতেন্দ্র ও চিত্রাঙ্গদা—স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে বিচ্ছেদের কারণ কিনা!

হঠাৎ—হঠাৎই যেন একটা সম্ভাবনা কিরীটীর মনের পাতায় উঁকি দেয়। আশ্চর্য! হ্যাঁ—সত্যিই তো, আশ্চর্য রকমের একটা মিলও আছে দুটো মুখে। তবে—তবে কি ওইটাই কারণ?

গণেশ এসে ঘরে ঢুকল।

বাবুজী!

কে?

খাবার দেব কি?

খাবার? রাত কটা হল?

রাত সোয়া নটা।

তাহলে একটু পরে।

গণেশ কিন্তু তথাপি ঘর থেকে যায় না, দাঁড়িয়েই থাকে।

কিছু বলবে গণেশ?

আজ্ঞে—কোন ড্রিঙ্ক দেব কি?

ড্রিঙ্ক!

হ্যাঁ।

হুইস্কি আছে?

আছে।

দাও এক পেগ। সোডা দিয়ে দিও।

গণেশ চলে গেল।

BanglaBook.net

পরের দিন কিরীটীর ঘুম ভাঙল সানাইয়ের শব্দে। ভৈরো রাগে সানাই বাজছে। মনে পড়ল রাণীমার জন্মতিথি-উৎসব আজ থেকেই।

॥ আট ॥

সত্যই চিত্রাঙ্গদা দেবীর জন্মতিথি উৎসব রাত পোহানোর সঙ্গে সঙ্গেই সানাইয়ের মাঙ্গলিক দিয়ে শুরু হয়ে গিয়েছিল।

বিখ্যাত সানাই বাজিয়ে রহিম এসেছিল।

ভোর হল, চিত্রাঙ্গদা দেবী তাঁর ঘরে স্নান করে একটা দুধ-গরদের থান পরে এসে বসলেন—একে একে সকলে তাঁকে শুভকামনা জানিয়ে যায়।

সকলকেই হাসি মুখে চিত্রাঙ্গদা দেবী সম্ভাষণ জানান—এ যেন এক নতুন চিত্রাঙ্গদা। প্রশান্ত সৌম্য সুন্দর হাস্যময়ী —আভিজাত্য ও দম্ভের খোলসটা যেন আজ তিনি খুলে ফেলে দিয়েছেন।

সকাল থেকে সারাটা দিন দলে দলে কত যে লোক আসে চিত্রাঙ্গদাকে শুভকামনা জানাতে! কেউ কিছু ফুল, কেউ অন্য কোন উপঢৌকন, কেউ কিছু মিষ্টি। চিত্রাঙ্গদাও উদ্যানে বড় বড় দুটো তাঁবুতে অতিথি অভ্যাগতদের জলযোগ আপ্যায়নের ব্যবস্থা করেছিলেন। দুদিন ধরে হালুইকরেরা সব মিষ্টান্ন তৈরি করেছে—ভারে ভারে সব মিষ্টান্ন।

তারপর ক্রমশঃ সন্ধ্যা নামল। লাল-নীল সবুজ হলুদ—হরেক রকম আলোয় সারা ইন্দ্রালয় যেন ইন্দ্রপুরীর মতই ঝলমল করে ওঠে।

প্রথম দিন যাত্রার ব্যবস্থা ছিল। সারটা রাত ধরে যাত্রাগান হল। দ্বিতীয় দিনও অতিথি-অভ্যাগতদের ভিড়। রাত্রে বসল গানের আসর। অনেক সব বড় বড় ওস্তাদ গাইয়েরা এসেছে।

পর পর তিন রাত্রি এবার গানের জলসা চলবে।

প্রথম রাত্রে আধুনিক, দ্বিতীয় রাত্রে রাগসঙ্গীত ও রবীন্দ্রসঙ্গীত, তৃতীয় রাত্রে ওস্তাদদের আসর।

রাত আটটা থেকেই আসর বসেছিল। কিরীটীও উপস্থিত ছিল আসরে।

চিত্রাঙ্গদা দেবীকেও কিরীটী দেখেছে আসরে বসে গান শুনতে। তারপর যে কখন একসময় আসর ছেড়ে উঠে গেছেন, টের পায়নি কিরীটী—গানের সুরে বোধ হয় তন্ময় হয়ে গিয়েছিল।

রাত তখন বোধ হয় এগারোটা বেজে কয়েক মিনিট হবে—

বড়ে গোলাম আলি মাত্র কিছুক্ষণ আগে আসরে নেমেছেন—গণেশ এসে কিরীটীর পাশে দাঁড়াল।

বাবুজী!

ফিস্ ফিস্ করে ডাকে গণেশ।

কে, গণেশ! কি খবর?

জয়ন্ত দাদাবাবু আপনাকে এখুনি একবার ডাকছেন!

জয়ন্তবাবু! কোথায় তিনি?

রাণীমার ঘরে।

কিরীটী নিঃশব্দে সঙ্গীতের জমাটি আসর ছেড়ে উঠে পড়ল। প্রায় শতাধিক শ্রোতা—সবাই গানের সুরের মধ্যে ডুবে রয়েছে।

কিরীটীর পুর্বেই স্বাতী ও তার ছোটদা শচীন্দ্র ছাড়া মণীন্দ্র, জগদীন্দ্র ও ফণীন্দ্র আসরেই উপস্থিত আছে। তারাও তন্ময় হয়ে গান শুনছিল।

চিত্রাঙ্গদা দেবীও তাঁর আসনে বসেছিলেন, কিন্তু আসর ছেড়ে যাবার সময় তাঁকে দেখা গেল না। তাঁর আসনটি শূন্য। কখন যে এক সময় তিনি উঠে চলে গেছেন, সে জানতে পারেনি।

আগের দু-রাত্রিতেও চিত্রাঙ্গদা দেবী যাত্রাগান শেষ হবার আগেই মাঝামাঝি সময় উঠে চলে গিয়েছিলেন যাত্রাগানের আসর ছেড়ে।

আজও হয়তো গেছেন—

যেতে যেতে লক্ষ্য পড়ল, সুধন্যও একপাশে শ্রোতাদের মধ্যে বসে গান শুনছে।

কিরীটী চিন্তা করতে করতে অগ্রসর হয়, এত রাত্রে চিত্রাঙ্গদা দেবীর ঘরে কেন তার ডাক পড়ল!

জয়ন্ত চৌধুরী ডেকে পাঠিয়েছে তাকে।

আজ সন্ধ্যার সময় জয়ন্ত চৌধুরী একবার তার ঘরে এসেছিল, বলেছিল কাল সকালেই সে নাকি কলকাতা ফিরে যাবে।

চিত্রাঙ্গদা দেবীর সঙ্গে সেই যে প্রথম দিন এখানে পৌঁছাবার পর সন্ধ্যায় তাঁর ঘরে আলাপ শুরু হতেই ঘরে সুধন্যর আবির্ভাব ঘটল এবং চিত্রাঙ্গদা দেবী একটু পরে ঘর ছেড়ে হঠাৎ চলে গেলেন, তারপর আর চিত্রাঙ্গদা দেবীর সঙ্গে কোন আলাপ বা কথাবার্তা হয়নি। যদিও গত দুদিন যাত্রার আসরে ও আজ সঙ্গীতের আসরে দূর থেকে তাঁকে সে দেখেছে।

সাধারণের সিঁড়িপথেই কিরীটী গণেশকে অনুসরণ করে দোতলায় গিয়ে হাজির হল একসময়। সিঁড়ির আলোতে ও বারান্দার উজ্জ্বল আলোয় সব কিছু চোখে পড়ে—নির্জন, একেবারে খাঁ খাঁ করছে চারদিক।

দুর থেকে গানের সুর ভেসে আসছে।

বসবার ঘরের দিকে নয়, গণেশ চিত্রাঙ্গদার শয়নঘরের দিকেই এগিয়ে গেল—

কিরীটীও এগোয়।

দরজাটা ভেজানো ছিল।

গণেশ হঠাৎ ভেজানো দরজার সামনে দাঁড়িয়ে পড়ে কিরীটীর দিকে চেয়ে নিম্নকণ্ঠে বললে, ভেতরে যান, জয়ন্ত দাদাবাবু ভেতরেই আছেন।

কিরীটী দরজা ঠেলে ঘরের মধ্যে পা দিল।

ঘরের মধ্যেও আলো জ্বলছিল—এবং ঘরে পা দিয়ে সামনের দিকে ভূমিতলে দৃষ্টি পড়তেই কিরীটী যেন আচমকা নিজের অজ্ঞাতেই থমকে দাঁড়ল। তার গলা দিয়ে অস্ফুট একটা শব্দ বের হয়ে এল শুধু—তারপরই সে যেন বোবা হয়ে গেল।

ধবধবে সাদা মার্বেল পাথরের মসৃণ মেঝের ওপর পড়ে আছে চিত্রাঙ্গদার দেহটা। পরনে সেই সন্ধ্যার দুধ-গরদ থান। সাদা মার্বেল পাথরের মেঝের অনেকটা জায়গা ও পরনের দুধ-গরদ থান রক্তে একেবারে লাল—যেন রক্তস্রোতের মধ্যে ভাসছে একটি শ্বেতপদ্ম।

উপুড় হয়ে মেঝের ওপর পড়ে আছেন মুখ থুবড়ে চিত্রাঙ্গদা দেবী। ডান হাতটা সামনের দিকে ছড়ানো, বাঁ হাতটা ভাঁজ করা বুকের কাছে।

মাথার কেশভার খানিকটা পিঠের ওপর পড়ে ও খানিকটা দুপাশে ছড়িয়ে আছে। আর অদূরে দাঁড়িয়ে জয়ন্ত চৌধুরী।

দৃশ্যটা এমনি মর্মন্তুদ ও আকস্মিক যে কিরীটী কয়েকটা মুহূর্ত বিহ্বল বোবাদৃষ্টিতে সামনের দিকে কেমন যেন অসহায়ের মত তাকিয়ে থাকে।

কোন শব্দই তার মুখ দিয়ে বের হয় না। তারপর একসময় নিজের সম্বিৎ ফিরে পেয়ে জয়ন্ত চৌধুরীর দিকে তাকায়, ধীরে ধীরে এগিয়ে ভূপতিত রক্তাক্ত দেহটার সামনে ঝুঁকে পড়ে প্রথমে শ্বাস-প্রশ্বাস পরীক্ষা করে, যদিও ভূপতিত দেহটার দিকে তাকিয়েই সে বুঝতে পেরেছিল চিত্রাঙ্গদা দেবী আর বেঁচে নেই।

তবু একবার ক্ষণেকের জন্য ভূপতিত দেহটা পরীক্ষা করে ধীর ধীরে উঠে দাঁড়াল কিরীটী।

কখন জানতে পারলেন আপনি মিস্টার চৌধুরী?

কিছুক্ষণ আগে ঘরে ঢুকেই। মৃদুকণ্ঠে বললে জয়ন্ত চৌধুরী।

কখন আপনি এ ঘরে এসেছেন?

এগারোটা বাজবার বোধ হয় মিনিট কয়েক আগে—কারণ ঘরে ঢুকে ওই দৃশ্য দেখবার একটু পরেই বারান্দার ঘড়িতে এগারোটা বেজেছিল। আমিও ঠিক আপনার মত প্রথমটায় হতভম্ব হয়ে গেছলাম, মিস্টার রায়। কি করব বুঝতে পারিনি, তারপর হঠাৎ আপনার কথা মনে পড়ল—গণেশকে দিয়ে আপনাকে ডাকতে পাঠাই।

গণেশ কোথায় ছিল?

গণেশ আমাকে ডাকতে গিয়েছিল।

আপনি কোথায় ছিলেন?

ঘরে। সন্ধ্যেবেলা থেকেই মাথাটা ধরেছিল, তাই দোতলায় নিজের ঘরে শুয়েছিলাম।

আপনি গানের আসরে যাননি?

না।

হুঁ। গণেশ আপনাকে ডাকতে গিয়েছিল কেন?

বড়মা ডেকে পাঠিয়েছিলেন আমাকে। শুয়ে শুয়ে বোধ হয় একটু তন্দ্রামত এসেছিল, গণেশের ডাকাডাকি ও দরজার গায়ে ধাক্কার শব্দে ঘুম ভেঙে উঠে পড়ি।

তারপর?

আমার আসতে বোধ হয় মিনিট দশ বারো লেগে থাকবে। এসে দেখি, ঘরের দরজাটা ভেজানো। দরজা ঠেলে ঘরে পা দিয়েই দেখি ওই বীভৎস দৃশ্য। তখনো প্রাণটা একেবারে বের হয়ে যায়নি, মাঝে মাঝে মৃদু মৃদু আক্ষেপ করছেন যন্ত্রণায়। ঝুঁকে পড়ে ওঁর মুখের দিকে তাকালাম, কিন্তু বার দুই ঠোঁটটা কাঁপল, তারপরেই সব শেষ হয়ে গেল।

গণেশ জানে ব্যাপারটা?

জানে।

তাকে ডাকুন তো একবার। কোথায় সে?

বোধ হয় বাইরে দাঁড়িয়ে আছে। জয়ন্ত ডাকল অতঃপর, গণেশ—গণেশ—

গণেশ ভেতরে এল।

তার দু চোখে জল। বেচারী কাঁদছিল তখনো।

॥ নয় ॥

গণেশ! কিরীটী ডাকল।

বাবুজী—

সব কথা আমাকে বল গণেশ, তোমাকে তোমার রাণীমা কেন জয়ন্তবাবুকে ডাকতে পাঠিয়েছিলেন এবং কখন?

গণেশ কাঁদতে কাঁদতে ধরা গলায় যা বললে, তার সারার্থ হচ্ছে ঃ গানের আসর থেকে আধঘণ্টাটাক আগে রাণীমা উঠে আসেন। এসে সুরতিয়াকে দিয়ে গণেশকে ডেকে পাঠান নীচের থেকে। গণেশ এলে তাকে বলেন জয়ন্তকে ডেকে আনতে। গণেশ প্রথমে ভেবেছিল, জয়ন্ত দাদাবাবু বুঝি নীচে গান শুনছে, কিন্তু সেখানে গিয়ে খোঁজ করে না পেয়ে তাঁর ঘরে এসে তাঁকে ডাকে।

তুমি এই ঘরে এসেছিলে?

হ্যাঁ, ঘরে ঢুকে দেখি,—গণেশ বলে, রাণীমা জানলার কাছে পিছন ফিরে দাঁড়িয়ে আছেন।

তারপর?

রাণীমা আমাকে ঘরে ঢুকতে দেখে বলেন জয়ন্ত দাদাবাবুকে ডেকে দিতে।

সুরতিয়া কোথায়? তাকে দেখছি না কেন? কিরীটী প্রশ্ন করে।

কেন, সে তো রাণীমার কাছেই ছিল!

কোথায় গেল সুরতিয়া—দেখ তো। ডেকে আনো তাকে।

তাহলে বোধ হয় নীচে গেছে গান শুনতে। রাণীমা ফিরে এলে তো সে নীচে যেত গান শুনতে।

যাও, দেখ—তাকে ডেকে আনো জলসা থেকে।

গণেশ চলে গেল।

মৃদু কণ্ঠে জয়ন্ত বলে, শেষ পর্যন্ত বড়মার আশঙ্কাটাই সত্যি হল।

কিরীটী জয়ন্তর কথায় কোন জবাব দেয় না। সে তখন আবার নীচু হয়ে মৃতদেহটা পরীক্ষা করছিল।

পিঠের বাঁদিকে একটা গভীর ক্ষত। বোঝা যায় কোন ধারাল তীক্ষ্ণ অস্ত্র দ্বারা অতর্কিতে পিছল দিক থেকে আঘাত করা হয়েছে। মনে হয় ছোরা জাতীয় কোন ধারাল তীক্ষ্ণ অস্ত্র।

মিস্টার রায়!

উঁ!

এখন কি করা যায় বলুন তো?

কিরীটী সে কথার জবাব না দিয়ে কতকটা যেন আপন মনেই বলে, মনে হচ্ছে অতর্কিতে পিছন দিক থেকে কেউ ছোরা জাতীয় কিছু দিয়ে আঘাত করেছে—

আপনার তাই মনে হয়?

হ্যাঁ। তারপর একটু থেমে আবার কিরীটী বলে, রাত তখন কত হবে? যদি এখন থেকে আধঘন্টা আগে গানের আসর থেকে চিত্রাঙ্গদা দেবী উঠে এসে থাকেন, তাহলে রাত সোয়া দশটা মত হবে—

কিরীটী কথাগুলো কতকটা যেন আপন মনেই উচ্চারণ করে কি যেন চিন্তা করতে থাকে।

মিস্টার চৌধুরী?

বলুন।

কিরীটীর মুখের দিকে তাকাল জয়ন্ত।

আজ আপনার সঙ্গে শেষবার কখন ওঁর দেখা হয়েছিল?

সন্ধ্যার সময়।

আন্দাজ কটা হবে তখন?

বোধ হয় ছটা—আমাকে ডেকে পাঠান সুরতিয়াকে দিয়ে।

তারপর?

ঘরে ঢুকে দেখি বড়মা যেন অত্যন্ত উত্তেজিত—বিচলিত—

কেন?

তা তো জানিনা, তবে আমাকে বললেন, মণিদা—মানে মেজ জেঠামশাইয়ের মেজ ছেলেকে তিনি এক কপর্দকও দেবেন না ঠিক করেছেন এবং তাকে এ বাড়ি ছেড়ে চলে যেতে বলেছেন।

কেন?

তা জানি না। আরো বললেন, আমি যেন আপনাকে বলে দিই তার ওপর একটু নজর রাখতে—

আর কিছু?

না। এ কথাটা বলার জন্যই বোধ হয় আমাকে ডেকে পাঠিয়েছিলেন।

কিন্তু গতকাল তো আপনি বলছিলেন, ওই মণীন্দ্রবাবুকেই চিত্রাঙ্গদা দেবী চার ভাইয়ের মধ্যে একটু বেশী পছন্দ করতেন ও স্নেহ করতেন!

আমার ধারণা তো তাই ছিল। হঠাৎ যে কেন মণিদার ওপর চটে গেলেন জানি না।

ঘরে সেই সময় আর কেউ ছিল?

সুরতিয়া ছাড়া আর কেউ ছিল না।

ওই সময় কে যেন মনে হল দরজাপথে উঁকি দিয়েই সরে গেল। কিরীটী চট করে ঘুরে দাঁড়িয়ে দরজার দিকে চেয়ে প্রশ্ন করে, কে—কে ওখানে?

কিন্তু কোন সাড়া পাওয়া গেল না, শোনা গেল একটা দ্রুতপায়ের শব্দ। কিরীটী ক্ষিপ্রপদে ঘর থেকে বের হয়ে বারান্দায় পড়ে।

কে যেন সিঁড়ির দিকে দ্রুত চলে যাচ্ছে।

এ কি সুধন্যবাবু!

ছেড়ে দিন—ছেড়ে দিন আমাকে। সুধন্য কিরীটীর হাত থেকে নিজেকে ছাড়াবার চেষ্টা করে, কিন্তু পারে না।

দাঁড়ান। আসুন আমার সঙ্গে ঘরে।

ঘরে?

হ্যাঁ—চিত্রাঙ্গদা দেবীর শোবার ঘরে।

জয়ন্ত চৌধুরীও ততক্ষণে ঘর থেকে বের হয়ে এসেছিল বারান্দায়।

কি ব্যাপার! কে ও—এ কি, সুধন্য না?

হ্যাঁ। চলুন—ঘরে চলুন।

না না, ও-ঘরে আমি যাব না। ছেড়ে দিন—ছেড়ে দিন আমাকে।

চলুন।

কিরীটী একপ্রকার জোর করেই টানতে টানতে যেন সুধন্যকে ঘরের মধ্যে নিয়ে এল। এবং সুধন্য ঘরে ঢুকে মেঝের ওপর রক্তস্রোতের মধ্যে শায়িতা চিত্রাঙ্গদা দেবীর মৃতদেহটা দেখে অস্ফুট চিৎকার করে ওঠে।

কিরীটীর হাত থেকে মোচড় দিয়ে নিজেকে ছাড়াবার আবার চেষ্টা করে কিন্তু ব্যর্থ হয়।

ছেড়ে দিন—ছেড়ে দিন আমাকে—যেতে দিন।

আর ঠিক সেই মুহূর্তে গণেশের সঙ্গে সুরতিয়া এসে ঘরে পা দিল। সেও সঙ্গে সঙ্গে চিত্রাঙ্গদা দেবীর রক্তাপ্লুত মৃতদেহটা দেখে অস্ফুষ্ট ভয়ার্ত কণ্ঠে একটা চিৎকার করে ওঠে।

সুধন্য তখনো নিজেকে ছাড়াবার চেষ্টা করছে।

দাঁড়ান। পালাবার চেষ্টা করলে এখুনি আপনাকে পুলিসে খবর দিয়ে ধরিয়ে দেব। কিরীটী কঠিন কণ্ঠে বলে।

কেন, কেন—পুলিসে ধরিয়ে দেবেন কেন আমাকে? আমি তো খুন করিনি ওঁকে।

সুরতিয়া হঠাৎ ওই সময় বলে ওঠে, না না, ও খুন করেনি। ওকে ছেড়ে দিন আপনারা, ওকে ছেড়ে দিন।

কিরীটী ফিরে তাকাল সুরতিয়ার মুখের দিকে তার কণ্ঠস্বরে। সুরতিয়ার সমস্ত মুখটা যেন রক্তশূন্য—ফ্যাকাশে হয়ে গিয়েছে আতঙ্কে।

কি করে তুমি জানলে যে ও খুন করেনি?

ও তো নীচে গান শুনছিল।

তাই যদি হবে তো, ও পালাচ্ছিল কেন অমন করে ছুটে ঘরের দরজায় উঁকি দিয়ে একটু আগে? কিরীটী আবার প্রশ্ন করে।

তারপরই সুধন্যর দিকে তাকিয়ে কিরীটী প্রশ্ন করে, কেন একটু আগে ঘরে উঁকি দিচ্ছিলে?

আমি—আমি—

বল—কেন এসেছিলে?

আমি রাণীমার কাছে একটা কথা বলতে এসেছিলাম।

এত রাত্রে কথা বলতে এসেছিলে! সত্যি বল, কেন এসেছিলে?

টাকা—

টাকা!

হ্যাঁ—টাকা চাইতে এসেছিলাম রাণীমার কাছে।

এত রাত্রে টাকা চাইতে এসেছিলে?

হ্যাঁ। সত্যি বলছি বিশ্বাস করুন, কাল সকালেই এখান থেকে চলে যাব বলে টাকা চাইতে এসেছিলাম।

তাই যদি হবে তো, টাকা না চেয়ে ঘরের দরজা থেকে অমন করে উঁকি দিয়ে পালিয়ে যাচ্ছিলে কেন?

ভয়ার্ত দৃষ্টিতে সুধন্য মেঝেতে পড়ে থাকা চিত্রাঙ্গদা দেবীর রক্তাক্ত মৃতদেহটার দিকে তাকাল।

বল?

ভয় পেয়ে। আমি—আমি জানতাম না—

মিস্টার চৌধুরী! কিরীটী জয়ন্তর মুখের দিকে তাকাল।

বলুন।

এ বাড়িতে ফোন আছে তো?

হ্যাঁ—পাশের ঘরেই আছে।

যান, থানায় একটা ফোন করে দিন।

জয়ন্ত ঘর থেকে বের হয়ে গেল।

শোন সুধন্য, তুমি পাশের ঘরে গিয়ে বসে থাক, পালাবার চেষ্টা কোরো না।

আমাকে ছেড়ে দিন—সত্যি বলছি, আমি কিছু জানি না স্যার।

যাও। যা বললাম পাশের ঘরে গিয়ে বসে থাক। পালাবার চেষ্টা করো না—কারণ পালিয়ে তুমি বাঁচতে পারবে না জেনো। তাহলে পুলিস তোমাকে ঠিক খুঁজে বের করে এনে একেবারে ফাঁসিকাঠে ঝুলিয়ে দেবে মনে রেখো।

ফাঁসি!

হ্যাঁ, মনে থাকে যেন! যাও, পাশের ঘরে গিয়ে বসো।

সত্যিই ফাঁসি দেবে?

যদি পালাও বা পালাবার চেষ্টা কর।

সুধন্য আর কোন কথা বলে না, নিঃশব্দে পাশের ঘরে চলে যায় দু-ঘরের মধ্যবর্তী দরজাপথে ধীরে ধীরে ভূপতিত দেহটার দিকে তাকাতে তাকাতে।

কিরীটী এবার ফিরে তাকাল সুরতিয়ার দিকে, সুরতিয়া!

বাবুজী!

তুমিই তো বরাবর রাণীমার খাস দাসী ছিলে?

জী।

সব সময় তাঁর কাছে-কাছেই থাকতে?

তবে আজ থাকনি কেন?

রাণীমা বলল গণেশকে ডেকে দিয়ে নীচে গিয়ে গান শুনতে। তাই গণেশকে ডেকে দিয়ে গান শুনতে গিয়েছিলাম।

তার আগে পর্যন্ত তো তুমি রাণীমার কাছে-কাছেই ছিলে?

জী।

আজ সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত কে কে রাণীমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছিল মনে করে বলতে পার?

কেন পারব না!

বল কে কে এসেছিল?

সকাল নটায় প্রথম আসেন এখানকার অফিসের ম্যানেজারবাবু—চক্রবর্তী সাহেব।

কে, অনিন্দ্য চক্রবর্তী?

নাম তো জানি না তাঁর—সবাই বলে তাঁকে চক্রবর্তী সাহেব—আমিও তাই বলি।

তারপর কতক্ষণ ছিলেন চক্রবর্তী সাহেব রাণীমার ঘরে?

তা প্রায় ঘণ্টা দেড়েক।

অফিসের কাজে এসেছিলেন বোধ হয় চক্রবর্তী সাহেব?

না।

তবে?

তিনি আর চাকরি করবেন না, তাই বলতে এসেছিলেন।

তাতে রাণীমা কি বললেন?

তাঁদের সব কথাবার্তা তো শুনিনি। তবে একবার রাণীমাকে বলতে শুনেছিলাম, চাকরি ছেড়ে দিলেও দিদিমণির সঙ্গে তাঁর বিয়ের কোন আশা নেই।

তাতে চক্রবর্তী সাহেব কি জবাব দিলেন?

বলেছিলেন, বিয়ে তাদের হবেই—রাণীমার সাধ্য নেই তাদের বিয়ে আটকান।

বলতে বলতে তিনি ঘর থেকে বের হয়ে গেলেন।

॥ দশ ॥

চক্রবর্তী সাহেব ছাড়া আর কে এসেছিল আজ রাণীমার কাছে? কিরীটী আবার প্রশ্ন করে।

বড়দাদাবাবু এসেছিলেন দুপুরে—খাওয়ার পর রাণীমা যখন বিশ্রাম নিচ্ছিলেন। বড়দাদাবাবুর সঙ্গে রাণীমার কি কথা হচ্ছিল জানি না, তবে মনে হয়েছিল রাণীমা বড়দাদাবাবুকে খুব বকাবকি করছেন, দাদাবাবু একসময় ঘর থেকে বের হয়ে গেলেন।

আর কেউ আসেনি?

ওই সময় জয়ন্ত চৌধুরী এসে ঘরে ঢুকল। মিস্টার চৌবেকে ফোন করে এলাম, তিনি এখুনি আসবেন বললেন।

কিরীটী সুরতিয়ার দিকে আবার তাকাল, আর কে এসেছিল?

মেজদাদাবাবু আর জয়ন্তদাদাবাবু।

আর কেউ আসেনি?

না।

ঠিক করে মনে করে দেখ!

না—আর কেউ আসেনি।

তোমার দিদিমণি?

দিদিমণি!

হ্যাঁ, দিদিমণি আসেনি?

না তো!

হ্যাঁ। আচ্ছা, মণিদাদাবাবুর সঙ্গে রাণীমার কি কথা হয়েছিল, কিছু শুনেছিলে?

না। তবে—

কি?

একটা কথা কানে এসেছিল। রাণীমা চিৎকার করে মেজদাদাবাবুকে বাড়ি ছেড়ে চলে যেতে বলছিলেন।

আর কেউ আসেনি রাণীমার সঙ্গে দেখা করতে, তোমার ঠিক মনে আছে?

কিরীটী আবার প্রশ্নটা করে।

ঠিক মনে আছে। তবে—

কি?

আসর থেকে রাণীমা ফেরবার পর আমি যখন গণেশকে ডেকে বাগানে যাচ্ছি, তখন সিঁড়ির পাশ দিয়ে যেতে যেতে মনে হয়েছিল কে যেন ওপরে যাচ্ছে সিঁড়ি দিয়ে।

মনে হয়েছিল কেন, দেখনি?

দেখছি।

তবে?

পিছন থেকে দেখেছি। ঠিক চিনতে পারিনি।

পুরুষ, না স্ত্রীলোক?

পুরুষই —গায়ে একটা কালো রঙের ওভারকোট ছিল। আর—

আর?

লম্বা লম্বা পা ফেলে একসঙ্গে দুটো করে সিঁড়ি টপকে টপকে যেন লোকটা ওপরে চলে গেল।

তুমি দেখলে না কেন, কে ওপরে যাচ্ছে?

না, দেখিনি। আমি ভেবেছিলাম—

কি—কি ভেবেছিলে?

সুরতিয়া জয়ন্তর মুখের দিকে তাকাল, যেন ইতস্তত করছে একটু—

কি, বল! কি ভেবেছিলে?

ভেবেছিলাম বুঝি জয়ন্তদাদাবাবুই ওপরে যাচ্ছেন!

জয়ন্তবাবু! কিরীটীর মুখ থেকে কথাটা উচ্চারিত হয়।

জয়ন্তও সবিস্ময়ে বলে ওঠে, আমি!

হ্যাঁ।

আশ্চর্য! তা হঠাৎ তোমার মনে হল কেন যে সে আমিই? জয়ন্তই আবার প্রশ্ন করে সুরতিয়াকে।

আপানার ছাড়া তো কালো ওভারকোট এ বাড়িতে কারো নেই! তাই মনে হয়েছিল।

কিরীটী এবার জয়ন্তর মুখের দিকে তাকাল। জিজ্ঞাসা করল, আপনার কালো রঙের ওভারকোট আছে নাকি সত্যিই মিস্টার চৌধুরী?

হুঁ। গ্রেট কোট আমি একটা বড় ব্যবহার করি না, তবে এখানে এ সময় খুব শীত বলে কোটটা সঙ্গে এনেছিলাম। কিন্তু একদিনও এসে পর্যন্ত ব্যবহার করিনি—হুকে দেওয়ালে ঝোলানোই রয়েছে।

হুঁ। কি যেন এক মুহূর্তে ভাবল কিরীটী। তারপর জয়ন্ত চৌধুরীর দিকে তাকিয়ে বললে, যান, দেখে আসুন তো কোটটা আছে কিনা?

এখুনি দেখে আসছি।

জয়ন্ত দ্রুতপায়ে ঘর থেকে বের হয়ে গেল।

সুরতিয়া!

বাবুজী!

জয়ন্তবাবুর সঙ্গে তোমাদের রাণীমার কি কথা হয়েছিল, জান?

শুনিনি। তবে একটা কথা কানে এসেছিল রাণীমার।

কি কথা?

জয়ন্ত, আমি তোমাকেও এখন যেন বিশ্বাস করতে পারছি না!

বলেছিল ওই কথা রাণীমা?

হ্যাঁ। আরো বলেছিল রাণীমা, মনে হচ্ছে—এখন মনে হচ্ছে, তোমরা সবাই আমাকে মারতে পার। মারবার জন্য সবাই তোমরা আমাকে ওৎ পেতে বসে আছ।

জয়ন্তবাবু তার কি জবাব দিলেন?

জয়ন্তদাদাবাবু বললেন, তোমাকে দেখছি সত্যিসত্যিই মৃত্যু-বিভীষিকায় পেয়েছে বড়মা। তোমার মাথা সত্যিসত্যিই খারাপ হয়ে গেল বলে আমার মনে হচ্ছে।

জয়ন্ত ওই সময় হন্তদন্ত হয়ে ফিরে এল, আশ্চর্য,—strange—

কি হল?

কোটটা ঘরে নেই!

নেই?

না।

সারাদিন কোটটা ছিল কিনা মনে আছে আপনার?

মনে আছে স্পষ্ট, দিনের বেলায় দেখেছি। তবে সন্ধ্যার পর বড়মার ঘর থেকে ফিরে এসে মনে পড়ছে না দেখেছি কিনা।

কিরীটী কোটটা সম্পর্কে আর কোন কৌতূহল প্রকাশ করে না বা কোন প্রশ্ন করে না। মনের মধ্যে তখন তার অন্য একটা চিন্তা ক্রমশ যেন একটা নির্দিষ্ট রূপ নেবার চেষ্টা করছে।

রাত সোয়া দশটা নাগাদ চিত্রাঙ্গদা দেবী গানের আসর থেকে উঠে ভেতরে চলে আসেন। তারপর চিত্রাঙ্গদা দেবী তাঁর খাস দাসী সুরতিয়াকে বলেন গণেশকে ডেকে দিতে। গণেশ সঙ্গে সঙ্গেই প্রায় রাণীমার এই ঘরে যদি এসে থাকে, তাহলে সেটা দশটা কুড়ি-পঁচিশ খুব জোর হবে। চিত্রাঙ্গদা দেবী তখনো বেঁচে ছিলেন। কারণ গণেশ এসে এই ঘরে ঢুকবার পর তাকে চিত্রাঙ্গদা দেবী বলেন, জয়ন্তকে গানের আসর থেকে ডেকে আনবার জন্য। গণেশ বের হয়ে যায়। ধরা যাক সময় তখন ঘড়িতে সাড়ে দশটা মত হবে।

গণেশ প্রথমে জয়ন্তবাবুকে ডাকতে গানের আসরে যায়—সেখানে খোঁজ না পেয়ে ফিরে আসে আবার বাড়ির মধ্যে। জয়ন্ত চৌধুরীর ঘরে যায়, তাকে ডাকাডাকি করে তোলে—যেহেতু জয়ন্ত চৌধুরী তখন ঘুমোচ্ছিল।

জয়ন্ত চৌধুরী এসে মিনিট পনেরো-কুড়ির মধ্যেই এই ঘরে ঢোকে এবং ঢুকে দেখতে

পায়—চিত্রাঙ্গদা দেবী মৃত।

তাহলে বোঝা যাচ্ছে, রাত সাড়ে দশটা থেকে পৌনে এগারোটা—ওই পনেরো মিনিট সময়ের মধ্যেই কোন একসময় হত্যাকারী এই ঘরে ঢুকে তার কাজ শেষ করে চলে গিয়েছে।

রাত সাড়ে দশটা থেকে পৌনে এগারোটা!

শেষের কথাটা কিরীটী মৃদু কণ্ঠে উচ্চারণ করে কতকটা বুঝি স্বগতোক্তির মতই।

কিছু বলছেন মিস্টার রায়? জয়ন্ত চৌধুরী প্রশ্ন করে।

বলছি চিত্রাঙ্গদা দেবীকে সম্ভবত রাত সাড়ে দশটা থেকে পৌনে এগারোটার মধ্যে কোন এক সময় হত্যাকারী পিছন দিক থেকে অতর্কিতে ছোরার দ্বারা আঘাত করে সরে পড়েছে বলেই আমার মনে হচ্ছে। অর্থাৎ সে সময় দোতলায় একমাত্র চিত্রাঙ্গদা দেবী তাঁর ঘরে ও আপনি আপনার ঘরে ছাড়া তৃতীয় কোন ব্যক্তি ছিল না বাড়ির মধ্যে। কাজেই—

কি?

যদি অতর্কিতে আঘাত পেয়ে একটা চিৎকার করেও উঠে থাকেন সেই মুহূর্তে চিত্রাঙ্গদা দেবী, একমাত্র আপনি ছাড়া আর কারো কানে পৌঁছবার কথা নয়—কিন্তু আপনিও ঘুমিয়ে ছিলেন।

জয়ন্ত কোন জবাব দেয় না।

নিঃশব্দে কিরীটীর মুখের দিকে চেয়ে থাকে। কিরীটী কি তাকে সন্দেহ করছে নাকি!

কিরীটী আবার বলে, গণেশ গানের আসরে আপনাকে খুঁজে না পেয়ে যখন ওপরে এসেছে, তখন আততায়ী তার কাজ শেষ করে চলে গিয়েছে। গণেশ কি চিত্রাঙ্গদার এই ঘরে আর ঢোকেনি? হয়েতো ঢুকেছিল—ঢুকে এই দৃশ্য দেখে ভয়ে তাড়াতাড়ি আপনার কাছে ছুটে যায়।

কিন্তু গণেশ তো—

বলেনি সে ধরণের কোন কথা জানি। আমিও সেই রকমই যে কিছু ঘটেছে তা বলছি না। আমি বলছি, ওই রকমও কিছু হয়ে থাকতে পারে মাত্র।

বাইরে দালানে ওই সময় ঘড়িতে ঢং করে রাত সাড়ে বারোটা ঘোষণা করল।

গানের আসর তখনো পুরোদমে চলেছে। মধ্যরাত্রির স্তব্ধতায় এতদূর থেকেও গানের লাইনগুলো যেন স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে।

কিরীটীর মনে হয়, কি বিচিত্র পরিবেশ!

বাড়ির একাংশে যখন সঙ্গীতের সুধা ঝরে পড়ছে, অন্য অংশে তখন বাড়ির কর্ত্রী নিহত হয়ে রক্তস্রোতে ভাসছেন!

জীবন ও মৃত্যু!

॥ এগারো ॥

গণেশ! কিরীটী ডাকে।

গণেশ নিঃশব্দে একপাশে ঘরের মধ্যেই তখনো দাঁড়িয়ে ছিল। গণেশ কিরীটীর ডাকে ফিরে তাকাল তার মুখের দিকে!

তুমি একবার নীচে যাও, গানের আসর থেকে জগদীন্দ্র, মণীন্দ্র ও ফণীন্দ্রবাবুকে ডেকে

pathagar.net

নিয়ে এস।

কি বলব তাঁদের? গণেশ জিজ্ঞাসা করে।

কি বলবে? বল—বল—হ্যাঁ বল, তাদের বড়মার বিশেষ জরুরী ব্যাপার, তাদের ডাকছে। হ্যাঁ শোন, একসঙ্গে নয়, পাঁচ-ছ মিনিট পর পর এক একজনের কাছে গিয়ে কথাটা বলবে, বুঝলে?

আজ্ঞে।

যাও ওদের ডেকে দিয়ে সরকারমশাইকে ডেকে দেবে। সুরতিয়া, আপাতত তুমি এ ঘরে থাক।

গণেশ বের হয়ে গেল।

কিরীটী আবার জয়ন্তর দিকে ফিরে তাকাল।

মিস্টার চৌধুরী!

বলুন?

ঘরের দরজাটা বন্ধ করে দিয়ে চলুন পাশের ঘরে যাই, ওখানেই কথাবার্তা হবে। চলুন।

মৃতদেহ যেমন ছিল তেমনই পড়ে রইল, সুরতিয়াকে ঘরে রেখে দুজনে মধ্যবর্তী দরজার দিকে অগ্রসর হল।

ঘর ছেড়ে যাবার আগে কিরীটী আর একবার চিত্রাঙ্গদা দেবীর শয়ন-ঘরটার চারদিকে দৃষ্টি বুলিয়ে নিল।

নিভাঁজ শয্যা—বোঝা গেল সেরাত্রে খাটের ওপরে বেচারী শয়নেরও আর সুযোগ পাননি। ঘরের মেঝেতে কেবল খাটের কাছে দামী পুরু একটা কার্পেট বিছানো, বাকি মেঝেটা এমনি—আ-ঢাকা।

এক কোণে একটা বিরাট দু-পাল্লার আলমারি—সেকেলে সেগুন কাঠের তৈরী এবং কারুকার্য করা। তার পাশেই একটা গোলাকার বেশ বড় সাইজের শ্বেতপাথরের টপ টেবিল—টেবিলের ওপরে নানা টুকিটাকি নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসপত্র।

উল্টোদিকে ঘরের সংলগ্ন বাথরুম।

কিরীটী ইতিমধ্যে বাতরুমটাতে পরীক্ষা করে দেখছিল। বাথরুমের দরজা, যেটার বাইরের ঘোরানো লোহার সিঁড়ির সঙ্গে যোগাযোগ আছে, সেটা ভেতর থেকে বন্ধই ছিল।

বাথরুমটাও বেশ প্রশস্ত। আগাগোড়া ইটালিয়ান গ্লেজটাইলের দেওয়াল-মেঝেও ইটালিয়ান মোজাকের। বাথ্‌টব, শাওয়ার, বেসিন—সব ঝকঝকে তকতকে।

ঘরের মধ্যে শ্বেতপাথরের গোলাকার টেবিলটা ছাড়াও একটা মাঝারি আকারের টেবিল আছে। কিছু বই ও নানা ধরনের ফাইল খাতাপত্র টেবিলের ওপরে সাজানো।

সামনে একটা দামী কুশন মোড়া চেয়ার। একটা আরাম-কেদারাও ধরের মধ্যে আছে। আর একটা লোহার দেওয়ালে গাঁথা সিন্দুক। সিন্দুকটার একেবারে গা থেকে শোবার খাটটা।

আগে আগে চলেছিল জয়ন্ত—পিছনে কিরীটী, হঠাৎ কিরীটীর নজরে পড়ে ঘরের মেঝেতে মধ্যবর্তী দরজার একেবারে গা থেকে কি একটা পড়ে আছে—চিকচিক করছে।

কিরীটী ঝুঁকে নীচু হয়ে জিনিসটা মেঝে থেকে তুলে নিল। রঙিন কাচের চুড়ির একটা ভাঙা টুকরো।

কি হল? জয়ন্ত ঘুরে দাঁড়ায়।

না, কিছু না। চলুন।

দুজনে এসে পাশের ঘরে ঢুকল।

সুধন্য একা একা ঘরের মধ্যে বসেছিল—ওদের ঘরে ঢুকতে দেখে মুখ তুলে তাকাল।

আমি নীচে যেতে পারি? সুধন্য জিজ্ঞাসা করে।

পালাবার চেষ্টা করবে না তো?

না।

তাহলে যাও। ডাকলেই যেন পাই।

হ্যাঁ, নীচে গেস্টরুমের পাশের ঘরেই আমি থাকব।

যাও তাহলে। কিরীটী মৃদু হেসে বললে।

সুধন্য ঘর থেকে বের হয়ে গেল। মনে হল সে হাঁফ ছেড়ে বাঁচল।

ওকে যেতে দিলেন মিস্টার রায়, যদি পালিয়ে যায়? জয়ন্ত চৌধুরী বলে কিরীটীকে।

কিরীটী মৃদু হেসে বলে, না, পালাবে না। তাছাড়া পালালে তো ক্ষতি নেই কিছু।

ক্ষতি নেই!

না। সুধন্য হত্যা করেনি।

কি করে বুঝলেন?

স্বর্ণডিম্বপ্রসূ হংসীকে হত্যা করবে নিজের হাতে, অন্তত এত বড় গদর্ভ সুধন্য নয়।

স্বর্ণডিম্বপ্রসূ হংসী!

হ্যাঁ—চিত্রাঙ্গদা দেবী তো ওর কাছে তাই ছিলেন। এলেই টাকা পেত—তা সে যে কারণেই হোক। আর সেই টাকাই যে ওর ভরসা, সেও আমি জানি।

কিন্তু—

না মিস্টার চৌধুরী, হত্যাকারী শুধু ক্ষিপ্রগতিসম্পন্নই নয়, অসম্ভব তার নার্ভ এবং বুদ্ধি। এবং তার হত্যার পিছনে বড় রকমের কোন মোটিভ রয়েছে জানবেন।

কিন্তু—

হ্যাঁ—আপাততঃ যা আমার মনে হচ্ছে, হত্যাকারী পূর্ব হইতে প্রস্তুত হয়ে সুযোগের অপেক্ষায় ছিল এবং সুযোগ পাওয়া মাত্র এতটুকুও দেরি করেনি আর —সঙ্গে সঙ্গে চরম আঘাত হেনেছে, তারপর সরে পড়েছে।

বাইরে ওই সময় পদশব্দ পাওয়া গেল।

দেখুন তো কে এল!

জয়ন্তকে উঠে দেখতে হল না, থানার অফিসার মিঃ চৌবে ও চিত্রাঙ্গদা দেবীর সরকার যোগেন বা যোগীন মিত্র ঘরে এসে ঢুকল।

এই যে জয়ন্তবাবু,—যোগেন মিত্রই প্রথমে কথা বলে, কি ব্যাপার? আমাকে ডেকেছেন কেন? আর মিস্টার চৌবেই বা—

কথা বললে এবারে কিরীটী, প্রয়োজন ছিল মিত্রমশাই।

কি বলুন তো? একটু যেন বিস্মিত হয়েই যোগেন মিত্র কিরীটীর মুখের দিকে তাকায়।

বিস্ময়ের তার কারণ ছিল, কারণ কিরীটীর সত্যি পরিচয়টা সে জানে না এখনো। অথচ এত রাত্রে এ ঘরে —

কিরীটী আবার বলে, একটা দুর্ঘটনা ঘটেছে।

দুর্ঘটনা!

হ্যাঁ। মিসেস চৌধুরী অর্থাৎ আপনাদের রাণীমা—

কি—কি হয়েছে তাঁর? ব্যাকুল কণ্ঠে প্রশ্ন করে যোগেন মিত্র।

তিনি খুন হয়েছেন।

সে কি!

হ্যাঁ।

কিরীটীই তখন সংক্ষেপে ব্যাপারটা বিবৃত করে।

চৌবেজী এবার বলে, কিন্তু আপনি কে?

এবারে জয়ন্ত তার পরিচয় দিল, উনি বিখ্যাত রহস্যসন্ধানী কিরীটী রায়।

সত্যি! নমস্তে—নমস্তে বাবুজী। চৌবেজীর কণ্ঠস্বর শ্রদ্ধায় একেবারে বিগলিত, কি সৌভাগ্য, আপনার দেখা পেলাম!

যোগেন মিত্র বলে, তাহলে আপনি যে বলেছিলেন জয়ন্তবাবু—

জয়ন্তবাবু তখন সংক্ষেপে কিরীটীর এখানে আসার ব্যাপারটা বলে গেল, বড়মার ইচ্ছাক্রমেই সব ব্যবস্থা করা হয়েছিল।

মৃতদেহ পরীক্ষা করল চৌবে।

চিত্রাঙ্গদা দেবীর সমস্ত শয়নকক্ষটা খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখল। তারপর কিরীটীর মুখের দিকে চেয়ে বললে, তাজ্জব কি বাত— এইসা কেইসে হো সেক্‌তা মেরে সমঝ মে নেহি আতা রায় সাহাব! আপকো রায় কেয়া হ্যায়?

কিরীটী বলে, যতদূর বুঝতে পারছি, আততায়ী মিসেস চৌধুরীর কোন অপরিচিত জন নন—কোন বাইরের লোকও নয়।

তব কৌন হো সেক্‌তা?

সেটা এখনো ঠিক বোঝা যাচ্ছে না—সকলের সঙ্গে কথাবার্তা না বললে—

কিরীটীর কথা শেষ হল না, জগদীন্দ্র প্রথমে ও তার পশ্চাতে মেজ মণীন্দ্র এসে ঘরে ঢুকল, এবং ঘরে ঢোকার সঙ্গে সঙ্গেই যুগপৎ ওদের কণ্ঠ হতে একটা অস্ফুট আর্তচিৎকার নির্গত হয়, এ কি!

তারপরই যেন দু ভাই বোবা হয়ে গেল। প্রস্তরমূর্তির মত ভূপতিত প্রাণহীন রক্তাক্ত দেহটার দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে রইল।

গানের আসর তখনো ভাঙেনি। গানের সুর তখনো শোনা যাচ্ছে।

একপাশে সুরতিয়া তখনো পাথরের মত নিশ্চল দাঁড়িয়ে।

চৌবেজীই কথা বলে, চলিয়ে সাব, ও কামরামে চলিয়ে।

চৌবেজীর সঙ্গে সঙ্গে জগদীন্দ্র, মণীন্দ্র, যোগেন মিত্র ও জয়ন্ত পাসের ঘরে চলে গেল।

কিরীটী চৌবেজীকে সম্বোধন করে বললে, আপ যাইয়ে চৌবেজী, ম্যায় আতা হুঁ।

॥ বারো ॥

সুরতিয়া!

কিরীটীর ডাকে সুরতিয়া ওর মুখের দিকে তাকাল। ফ্যাকাশে বিবর্ণ মুখ।

সুরতিয়া!

বাবুজী!

তুমি তো ভূপৎ সিংয়ের স্ত্রী, তাই না?

কথাটা শুনে হঠাৎ যেন চমকে ওঠে সুরতিয়া, কয়েকটা মুহূর্ত কোন জবাব দিতে পারে না। তারপর ধীরে ধীরে নিঃশব্দে মাথা হেলিয়ে সম্মতি জানাল।

শোন সুরতিয়া, আমি তোমার অনেক কথাই জানি—

সুরতিয়ার দুচোখের দৃষ্টিতে যেন একটা অজানিত আশঙ্কা ঘনিয়ে ওঠে। নিঃশব্দে চেয়ে থাকে ও।

কিরীটী আবার বলে, তোমাকে কয়েকটা কথা জিজ্ঞাসা করছি, তার ঠিক ঠিক জবাব দাও। জবাব না দিলে জানবে যাকে তুমি বাঁচাবার চেষ্টা করছ, তাকে কেউ বাঁচাতে পারবে না।

সুরতিয়া তথাপি নীরব।

রাজাবাবুর সঙ্গে তোমার খুব ঘনিষ্ঠতা ছিল, সত্যি কিনা?

সুরতিয়া নীরব। নিঃশব্দে সে কেবল চেয়ে আছে কিরীটীর মুখের দিকে।

আমি জানি ছিল—কিরীটী বলতে থাকে, আর সে ঘনিষ্ঠতার কথা রাণীমা জানত, তাই না?

সুরতিয়া পূর্ববৎ নীরব।

এবার বল ওই সুধন্য কে?

আ—আমি জানি না বাবুজী!

জান—বল কে?

আ—আমি জানি না।

তুমি বলতে চাও তুমি জান না কেন রাণীমা অমন করে সুধন্য এসে তাঁর সামনে দাঁড়ালেই তাকে টাকা দিতেন?

রাণীমা ওকে পেয়ার করতেন, তাই—

কিরীটী হেসে ফেলে, কি বললে পেয়ার!

হ্যাঁ।

মিথ্যে কথা—ঝুট। উসসে রাণীমাকো বহুৎ নফরৎ থি।

নেহি বাবুজি—নেহি, সাচমুচ—রাণীমা—

শোন সুরতিয়া, তুমি যাই বল আমি জানি রাণীমা ঐ সুধন্যকে দুচক্ষে একেবারে দেখতে পারত না—বল, সত্যি কথা বল— রাণীমা কেন সুধন্যকে অমন করে টাকা দিতেন বল?

বিশ্বাস করুন বাবুজী, আমি জানি না।

আমি কিন্তু জানি কেন রাণীমা ওকে টাকা দিতেন!

আ—আপনি জানেন? গলার স্বরে যেন একটা চাপা আতঙ্ক ফুটে ওঠে স্পষ্ট হয়ে সুরতিয়ার হঠাৎ।

তুমি বলছ রাণীমা সুধন্যকে পেয়ার করত—কিন্তু কেন? কি সম্পর্ক ছিল সুধন্যর সঙ্গে রাণীমার? কে ও রাণীমার?

কেউ না।

BOIRAGAR.NET

তবে?

কিন্তু বাবুজী—

যাক সেকথা, এবার সত্যি করে বল তো, সিঁড়ি দিয়ে কোট গায়ে যে লোকটা ওপরে উঠছিল, সে কে?

তাকে আমি চিনতে পারিনি।

আবার মিথ্যে কথা বলছ, তাকে তুমি চিনতে পেরেছ।

না, না, আমি চিনতে পারিনি।

তোমার কথা আমি বিশ্বাস করতে পারছি না। ঠিক আছে, এই ঘরেই তুমি থাক। কোথাও যেও না যেন।

কিরীটী কথাগুলো বলে মধ্যবর্তী দরজাপথে পাশের ঘরে গিয়ে ঢুকল।

চৌবেজী তখন জবানবন্দি নিচ্ছেন এক এক করে ঘরে যারা উপস্থিত ছিল।

জগদীন্দ্র ও মণীন্দ্র চিত্রাঙ্গদা দেবীর আকস্মিক মৃত্যুতে যেন কেমন মুহ্যমান হয়ে গিয়েছিল। তারা যেন কিছু ভাল করে ভাবতেও পারছিল না।

তারা তাদের জবানবন্দিতে বলেছে, সন্ধ্যা থেকেই তারা গানের আসরে গিয়ে বসেছিল। এবং বাগানে গেস্টদের জন্য যে খাবার ব্যবস্থা হয়েছিল, সেখানেই কয়েকজন পরিচিত স্থানীয় ভদ্রলোকের সঙ্গে খেয়ে নিয়েছিল। খাবার জন্য বাড়ির মধ্যে পর্যন্ত আসেনি। গানের আসর ছেড়ে তারা একবারের জন্যও উঠে আসেনি। কিছুই তারা জানে না—কিছুই তারা বলতে পারে না।

আর জয়ন্ত কিরীটীর কাছে যা বলেছিল, চৌবেজীর প্রশ্নের জবাবেও তাই বলেছে—অর্থাৎ পুনরাবৃত্তি করেছে।

বাইরে গানের আসর তখনো পুরোদমে চলেছে। রাতও প্রায় পৌনে দুটো হল।

কিরীটী মণীন্দ্রর দিকে তাকিয়ে তাকে এবার প্রশ্ন করে, কয়েকটা কথা আপনাকে আমি জিজ্ঞাসা করতে চাই মণীন্দ্রবাবু!

মণীন্দ্র কিরীটীর মুখের দিকে তাকাল।

আজ সন্ধ্যার সময় আপনি আপনার বড়মার ঘরে এসেছিলেন, না?

হ্যাঁ।

কি কথা হয়েছিল আপনার চিত্রাঙ্গদা দেবীর সঙ্গে?

এমন বিশেষ কিছু না—

কিন্তু আমি যতদূর জানি, আপনাদের পরস্পরের মধ্যে বেশ কথা কাটাকাটি হয়েছিল এবং তিনি উত্তেজিত হয়ে উঠেছিলেন। তেমন বিশেষ কিছুই যদি না হবে তো—

হ্যাঁ—স্বাতীর বিয়ের ব্যাপার নিয়ে আমাদের মধ্যে একটু কথা-কাটাকাটি হয়েছিল।

আর কিছু না!

না। অনিন্দ্য আমার পরিচিত—বন্ধু, স্বাতী তাকে বিয়ে করতে চায়, অনিন্দ্যও স্বাতীকে বিয়ে করতে চায়। অথচ বড়মা কিছুতেই রাজী নন। আমি কথাটা উত্থাপন করতেই বড়মা আমাকে যা-তা বলতে শুরু করেন।

তিনি আপনাকে বাড়ি ছেড়ে চলে যেতে বলেছিলেন?

হ্যাঁ।

হুঁ। আচ্ছা মণীন্দ্রবাবু, আপনাদের ভাইদের মধ্যে কাকে বেশি চিত্রাঙ্গদা দেবী পছন্দ করতেন বলে আপনার মনে হয়?

সত্যি কথা বলতে গেলে কাউকেই তিনি আমাদের সত্যিকারের পছন্দ করতেন না। ভালবাসতেন বলে আমার মনে হয় না।

আপনাদের ছোট ভাই শচীন্দ্রবাবুকে?

না।

জয়ন্তবাবুকে?

ওকে তো তিনি দু'চক্ষে দেখতে পারতেন না।

জগদীন্দ্রও মণীন্দ্রর কথার পুনরাবৃত্তি করল।

গণেশ!

কিরীটী এবারে গণেশের দিকে ফিরে তাকাল।

গণেশ একপাশে দাঁড়িয়েছিল। জবাব দিল, আজ্ঞে?

শচীন্দ্রবাবুকে ডেকে নিয়ে এস তো। আর শোন, তোমাদের স্বাতী দিদিমণিকেও একটা খবর দাও।

গণেশ বের হয়ে গেল।

জগদীন্দ্রবাবু, মণীন্দ্রবাবু, আচ্ছা আপনাদের বড়মার কোন শত্রু ছিল কি?

শত্রু!

হ্যাঁ।

মণীন্দ্রই এবার বলে, না—তাঁর আবার কোন শত্রু থাকতে পারে?

কিন্তু এটা তো ঠিক মণীন্দ্রবাবু, আপনারা ভাইবোনেরা কেউ আপনাদের বড়মাকে পছন্দ করতেন না?

পছন্দ করতাম না!

হ্যাঁ—কেউ আপনারা সুখী নন।

না না—তা কেন হবে?

কিন্তু আমি যতদূর শুনেছি কেউ আপনারা তাঁর ব্যবহারে সন্তুষ্ট ছিলেন না।

জগদীন্দ্র জিজ্ঞাসা করে, কে বলেছে সেকথা আপনাকে? জয়ন্ত?

না।

তবে?

বলেছেন আপনাদের বড়মা।

বড়মা?

হ্যাঁ—আর তাঁর ধারণা হয়েছিল—

কি?

তাকে আপনারা হত্যাও করতে পারেন।

এসব আপনি কি বলছেন?

যা বলছি তা যে মিথ্যা নয় সে আপনারা সকলেই জানেন—আপনি, মণীন্দ্রবাবু, শচীন্দ্রবাবু, স্বাতী দেবী—কেউ আপনারা আপনাদের বড়মাকে সহ্য করতে পারতেন না।

শচীন্দ্র আর স্বাতী একই সঙ্গে ঐ সময় এসে ঘরে ঢুকল। গণেশ কোন কথা তাদের বলেনি। দুজনেই ঘরের মধ্যে অত লোক ও থানা-অফিসারকে দেখে একটু যেন অবাকই হয়।

শচীন্দ্র বলে, কি ব্যাপার, কি হয়েছে রে বড়দা? জগদীন্দ্রর মুখের দিকে তাকিয়ে প্রশ্নটা করে শচীন্দ্র।

আমি বলছি শচীন্দ্রবাবু,—কিরীটীই বলে, আপনাদের বড়মাকে কে যেন একটু আগে খুন করেছে।

খুন!

হ্যাঁ।

কি বলছেন আপনি?

ব্যাপারটা অপ্রত্যাশিত ও বিস্ময়কর হলেও সত্যিসত্যিই তাই ঘটেছে। She has been brutally murdered.

স্বাতী এতক্ষণ চুপ করে ছিল ; সে হঠাৎ বলে, এই রকমই যে কিছু একটা শেষ পর্যন্ত ওর ভাগ্যে ঘটবে সে আমি জানতাম।

কি বললেন? কিরীটী স্বাতীর মুখের দিকে তাকাল।

বলছি ওর বরাতে যে শেষ পর্যন্ত এমনি একটা কিছু ঘটবে, সে তো জানাই ছিল।

কেন?

অমন দাম্ভিক, হৃদয়হীন স্ত্রীলোকের পক্ষে ওই রকম একটা কিছু ঘটাই তো স্বাভাবিক। আপনি তো জানেন না—কতটুকু পরিচয় ওর আর এ দু'দিনে পেয়েছেন? আমরা দীর্ঘদিন ধরে ওর কাছে থেকে বুঝতে পেরেছি, কি টাইপের স্ত্রীলোক ছিল আমাদের বড়মা।

আপনাদের ওপর বুঝি খুব অত্যাচার করতেন?

কিন্তু আপনাকে তো আমি ঠিক চিনতে পারছি না, যদিও দু'দিন থেকে এ বাড়িতে আপনি আছেন আমি জানতে পেরেছিলাম। আজই সকালে গণেশের কাছ থেকে—

জয়ন্ত চৌধুরীই তখন পুনরায় কিরীটীর পরিচয়টা ওদের কাছে ব্যক্ত করে।

স্বাতী সব শুনে বলে, ও আপনি ওই ডাইনি বুড়ীর আমন্ত্রণ নিয়েই এখানে এসেছিলেন আমাদের ওপর খবরদারী করতে যখন, তখন তো তার সত্য পরিচয়টা নিশ্চয়ই আপনার সর্বাগ্রে জানা দরকার বিশেষ করে আমি নিশ্চয় জানি, সে পরিচয়টা আপনি তার পাননি যখন—

বেশ তো, বলুন না শুনি।

এক জঘন্য প্রকৃতির নিষ্ঠুর, হৃদয়হীন প্রকৃতির স্ত্রীলোক ছিলেন তিনি।

কি রকম?

সে ইতিহাস বর্ণনা করতে গেলে পুরো দিন লেগে যাবে। কিন্তু জয়ন্তদাও তো তাকে চিনত, তার কাছেও কিছু আপনি আগে শোনেননি?

শুনেছি কিছু কিছু, আপনিও বলুন না।

এই যে দেখছেন আমার সহোদর ভাই ক'টিকে, এদের চারটেকে একেবারে ভেড়া করে রেখেছিল মহিলা। এই যে বাড়িটা—ইন্দ্রালয় যার নাম—এর আসল নাম কি হওয়া উচিত ছিল জানেন? নরকালয়। কতকগুলো জ্যান্ত মানুষকে অনুকম্পা ও সাহায্য করার ভান করে

দিনের পর দিন রাতের পর রাত চরম জঘন্য নির্যাতন চালিয়েছে, আর তার ফলে যা হবার ঠিক তাই হয়েছিল, এরা সকলে মুখে যতই শ্রদ্ধা ও প্রীতি জানাক না কেন, মনে মনে করত প্রচণ্ড ঘৃণা।

ঘৃণা!

হ্যাঁ, ঘৃণা। অথচ মজা কি জানেন, তবু এরা কেউ বিদ্রোহ করতে পারেনি—এই বিচিত্র বন্দীশালা ছেড়ে চলে যেতে পারেনি। এর চেয়ে দুঃখ, লজ্জা ও ভীরুতার আর কি থাকতে পারে বলতে পারেন?

একটু থেমে স্বাতী আবার বলে, কাজেই আজ যা ঘটেছে, সে তো খুবই স্বাভাবিক। কিন্তু দুঃখ হচ্ছে আমার, আমি যখন এই বন্দীশালা ছেড়ে চলে যাবার জন্য প্রস্তুত হয়েছি, ঠিক সেই মুহূর্তে ব্যাপারটা ঘটল।

আপনি কি—

হ্যাঁ, সকালেই অনিন্দ্যর আসার কথা—আমাকে সে নিয়ে যাবে এখান থেকে বলে গিয়েছে।

আপনার চলে যাবার কথাটা আপনার বড়মা জানতেন?

হ্যাঁ।

আপনি বলেছিলেন বুঝি?

হ্যাঁ, কাল দুপুরেই জানিয়ে দিয়েছিলাম।

তিনি কি বলেছিলেন?

বলেছিল, তাহলে তার সম্পত্তির একটা কপর্দকও আমি পাব না। আমিও সঙ্গে সঙ্গে জানিয়ে দিয়েছিলাম তাকে—চাই না।

তাহলে দুপুরে আপনার সঙ্গে আপনার বড়মার দেখা হয়েছিল?

হ্যাঁ।

আপনার মেজদা কথাটা জানতেন কি?

হ্যাঁ, তাকে বলেছিলাম।

কিরীটী এবার শচীন্দ্রর দিকে ফিরে তাকাল, আপনার নামই শচীন্দ্র চৌধুরী?

হ্যাঁ।

আপনি আপনার ঘরেই ছিলেন এতক্ষণ বোধ হয়?

হ্যাঁ।

গানের আসরে যাননি?

না, ওসব আমার ভাল লাগে না।

আচ্ছা শচীনবাবু, শেষ আপনার বড়মার সঙ্গে কখন দেখা হয়?

গতকাল সন্ধ্যায়।

কি কথা হয়েছিল তাঁর সঙ্গে আপনার?

বিশেষ কিছুই না।

ক্রমশ রাত শেষ হয়ে আসে।

আসর ইতিমধ্যে ভেঙে গিয়েছিল, অতিথি-অভ্যাগতরাও একে একে ইন্দ্রালয় ছেড়ে চলে গিয়েছিল।

॥ তেরো ॥

দুঃসংবাদটা চাপা থাকে না। ভোর হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই এ-কান ও-কান হতে হতে সংবাদ সমস্ত ইন্দ্রালয়ে ছড়িয়ে যায়।

কিরীটীর অনুরোধে চৌবেজী ইন্দ্রালয়ে পুলিস-প্রহরা মোতায়েন করেছিলেন ইতিমধ্যে এবং নির্দেশ জারি করে দিয়েছিলেন তাঁর বিনানুমতিতে কেউ ইন্দ্রালয় ছেড়ে আপাততঃ যেতে পারবে না।

সকলকেই আপাততঃ নজরবন্দী থাকতে হবে। রীতিমত এক অস্বস্তিকর পরিবেশ।

উৎসব আরো ক'দিন হবার কথা ছিল, কিন্তু চিত্রাঙ্গদা দেবীর আকস্মিক মৃত্যু আততায়ীর হাতে হঠাৎ যেন সব কিছুর ওপর একটা পূর্ণচ্ছেদ টেনে দিয়েছিল। আনন্দ-কোলাহল মুখরিত ইন্দ্রালয়ের ওপরে হঠাৎ যেন শোকের একটা কালো ছায়া নেমে এসেছে।

উৎসব থেমে গিয়ে যেন একটা শ্মশান-স্তব্ধতা নেমে এসেছে ইন্দ্রালয়ের ওপর।

দুটো দিন অমনি করে কেটে গেল আরো।

কিরীটী মধ্যে মধ্যে এক-একজনকে আলাদা করে তার ঘরে ডেকে এনে আরো কিছু কিছু প্রশ্ন করেছে এবং সবাই জানতে পেরেছে কিরীটীর কথায়, পুলিস এবং তার ধারণা, বাইরের কেউ চিত্রাঙ্গদা দেবীর নৃশংস হত্যার জন্য দায়ী নয়।

হত্যা করেছে চিত্রাঙ্গদা দেবীকে বাড়ির মধ্যে যারা সে-রাত্রে উপস্থিত ছিল, অর্থাৎ চিত্রাঙ্গদা দেবীর কোন আপনজনই, বিশেষ করে যাদের অন্দরে ও চিত্রাঙ্গদা দেবীর ঘরে অবাধ গতিবিধি ছিল।

কথাটা শোনা অবধি সকলেই যেন হঠাৎ কেমন বোবা হয়ে গিয়েছে। সকলেই পরস্পর মুখ-চাওয়াচাওয়ি করছে সর্বক্ষণ। একের অন্যের প্রতি কেমন যেন সন্দিগ্ধ দৃষ্টি। প্রত্যেকেই যেন প্রত্যেকের দিকে কেমন সন্দেহ নিয়ে তাকাচ্ছে।

কে—তাদের মধ্যে কে? কে হত্যা করল চিত্রাঙ্গদা দেবীকে?

জগদীন্দ্র, মণীন্দ্র, ফণীন্দ্র, শচীন্দ্র ও জয়ন্ত, বিশেষ করে ওই পাঁচজন—পাঁচ ভাইয়ের মনেই যেন ওই কথাটা ঘুরে ফিরে উদয় হয়।

স্বাতীও তাকায় তার ভাইদের দিকে সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে।

কে—কে হত্যা করল?

আর ওদের মধ্যে জড়িয়ে পড়েছে সুধন্যও।

কেউ কারো সঙ্গে মন খুলে কথা পর্যন্ত যেন বলতে পারছে না, কথা বলতে গিয়ে থেমে যাচ্ছে।

সবাই যেন নিজের নিজের মনের মধ্যে গুমরোচ্ছে। বিশ্রী অস্বস্তিকর এক পরিস্থিতি।

সেদিন দুপুরে কিরীটী তার ঘরের মধ্যে বসেছিল, বাইরে ফণীন্দ্রর গলা শোনা গেল।

মিস্টার রায় আসতে পারি?

আসুন—আসুন!

ডান পা-টা খোঁড়া ফণীন্দ্রর। ডান পা-টা একটু টেনে টেনে আস্তে আস্তে চলে সে। পা টেনে টেনে ফণীন্দ্র এসে ঘরে ঢুকল।

বসুন।

মিস্টার রায়!

বলুন?

এরকম করে তো আর পারছি না মিস্টার রায়—এই যে সর্বক্ষণ এক সন্দেহের দুঃসহ যন্ত্রণা—সত্যি বলছি আর ক'টা দিন এভাবে থাকলে হয়ত পাগল হয়ে যাব।

আমি তো আপনাদের প্রত্যেককেই বলেছি ফণীন্দ্রবাবু, আপনারা যে যা জানেন—কোন কথা গোপন না করে অকপটে আমাকে জানতে দিন। তাহলে এভাবে আপনাদের কষ্ট পেতে হয় না। —আমিও ব্যাপারটার একটা মীমাংসায় পৌঁছতে পারি।

কিন্তু আপনি বিশ্বাস করুন, সব কথাই আপনাকে অন্ততঃ আমি বলেছি।

না।

কি বললেন?

আপনি সব কথা বলেননি।

বলিনি!

না।

কি কথা আপনার কাছে আমি গোপন করেছি?

গোপন করেছেন সে-রাত্রে—মানে দুর্ঘটনার রাত্রে, রাত সোয়া নটা থেকে রাত পৌনে এগারোটা পর্যন্ত আপনি কোথায় ছিলেন, কি করেছিলেন।

আমি তো আমার ঘরে ঘুমিয়েছিলাম ওই সময়টা।

না।

হ্যাঁ, আপনি বিশ্বাস করুন—

বিশ্বাস আমি করতে পারছি না।

পারছেন না?

না।

কেন?

কারণ রাত দশটা নাগাদ আপনাকে আমি গানের আসরে দেখেছি।

না না, মানে—

অস্বীকার করবার চেষ্টা করছেন কেন? আমি আপনাকে দেখেছি—বলুন, সেরাত্রে আসরে আপনি যাননি?

হ্যাঁ—গিয়েছিলাম, বড়ে গোলাম আলি যখন গান ধরেন।

হ্যাঁ, রাত ঠিক দশটায়—আমার মনে আছে তিনি গান ধরেছিলেন।

হ্যাঁ, মিস্টার রায়, অস্বীকার করব না—গিয়েছিলাম আমি। কিন্তু শরীরটা ভাল না থাকায় একটু পরে চলে আসি।

তাহলে আপনি যে বলছিলেন, সেদিন সন্ধ্যা থেকে আপনাকে ডাকা পর্যন্ত আপনি ঘরে শুয়েছিলেন, সত্যি নয়?

ফণীন্দ্র মাথা নীচু করে।

কথাটা আপনি সেদিন স্বীকার করেননি কেন?

ভয়ে। কিন্তু আপনি বিশ্বাস করুন, বড়মাকে খুন আমি করিনি। কেন করব—কি স্বার্থ

PATHAGAR.NET

থাকতে পারে আমার?

সেকথা যদি বলেন তো স্বার্থ আপনার আছে বৈকি।

স্বার্থ আছে? কি স্বার্থ? বড় বড় চোখ করে তাকায় ফণীন্দ্র কিরীটীর চোখের দিকে।

প্রথমত ধরুন, বড়মার মৃত্যু হলে আপনি নিয়মিত মোটা একটা মাসোহারা পাবেন তাঁর উইল অনুযায়ী। অন্যান্য সম্পত্তির ভাগ ছাড়াও—আর সব চেয়ে বড় কথা, দিবারাত্র বড়মার মুখের দিকে চেয়ে তাঁর ভয়ে জুজুর মত থাকতে হবে না—এই বন্দী-জীবন কাটাতে হবে না—এই যন্ত্রণা থেকে মুক্তি পাবেন।

যন্ত্রণা থেকে মুক্তি!

নয়? ভেবে দেখুন, আপনারা প্রত্যেক ভাইবোনেরাই কি আপনাদের বড়মার প্রতি, নিরন্তর শাসন আর বিধিনিষেধ, সর্বক্ষণ তাঁর শাসনের ঝাপটা সয়ে সয়ে ভেতরে ভেতরে হাঁপিয়ে ওঠেননি? মানুষ তো কেবল মাথা গোঁজবার একটা ঠাঁই ও সেই সঙ্গে দু-বেলা নিশ্চিন্ত আহার কিংবা খানিকটা অর্থের স্বাচ্ছন্দ্য ও নিশ্চিন্ততা নিয়েই তার জীবনের যা কিছু কাম্য পেয়ে যায় না বা তার মনটা সব দিক দিয়ে ভরে ওঠে না—তার সব অভাব অভিযোগ মিটে যায় না। সে চায়—শুধু সে কেন, প্রতিটি মানুষই চায়, তার ব্যক্তিস্বাধীনতা সবার ওপরে ; এখানে সকল প্রকার স্বাচ্ছন্দ্য ও আরামের মধ্যে থেকেও সেই স্বাধীনতাটুকুর অভাবেই কি আপনারা প্রত্যেকে দিনের পর দিন এই ইন্দ্রালয়ের দেওয়ালে মাথা কুটে মরেননি? এই চার দেওয়াল থেকে মুক্তি চাননি?

চেয়েছি—চেয়েছি মিস্টার রায়—প্রতি মুহূর্তে চেয়েছি। কিন্তু—হঠাৎ উত্তেজিত হয়ে ফণীন্দ্র বলে ওঠে।

তার চোখ-মুখ লাল হয়ে ওঠে।

কিরীটী বাধা দিল, কিন্তু পারেননি—এই বন্দীশালার চৌকাঠ ডিঙিয়ে বাইরে যেতে পারেননি। কারণ এখানকার এই স্বাচ্ছন্দ্য ও আরাম দিনের পর দিন যেমন করে খাঁচায় পাখির ডানাকে অনভ্যস্ত থাকায় অবশ করে দেয়, আপনাদের ঠিক সেই অবস্থা হয়েছিল বলে।

তবু—তবু মাঝে মাঝে মনে হয়েছে—

বের হয়ে পড়েন, তাই না? তবু পারেননি। কারণ পা দুটোই যে আপনাদের অবশ হয়ে গিয়েছিল, তাই নয়? চৌকাঠ ডিঙোবার জন্য মনের যে সাহসের দরকার, সে সাহসের মেরুদণ্ডটাও ভেঙে দিয়েছিলেন আপনাদের ওই বড়মা। আর সেই অক্ষমতা ক্রমশ আপনাদের প্রত্যেকের মনের মধ্যে বড়মার প্রতি যে একটা প্রচণ্ড ঘৃণা পুঞ্জীভূত করে তুলেছিল, তাতে করে কেবলমাত্র আপনি কেন, আপনাদের চার ভাইয়ের মধ্যে যে কারুর পক্ষেই চিত্রাঙ্গদা দেবীকে হত্যা করা শেষ পর্যন্ত আদৌ অসম্ভব ছিল না।

ফণীন্দ্র যেন বোবা হয়ে যায়। সে মাথা নীচু করে বসে থাকে।

কিরীটী ফণীন্দ্রর মুখের দিকে তাকিয়ে বলে, আপনাদের ভাইবোনদের মনের অবস্থাটা যে আমি বুঝিনি তা নয় ফণীন্দ্রবাবু—মানুষ সহ্যের শেষ সীমাটুকু যখন অতিক্রম করে যায়, আমি জানি, তখন সে মরীয়া হয়ে ওঠে—আর তখন তার পক্ষে কোন কাজই অসাধ্য থাকে না।

কিরীটীবাবু!

বলুন?

সত্যিই কি আপনি—

কি?

মনে করেন আমাদের মধ্যেই কেউ—

এই বাড়ির মধ্যে সে-রাত্রে যারা উপস্থিত ছিল তাদের মধ্যেই একজন।

কে?

আপনিই ভেবে দেখুন না কে হতে পারে!

ফণীন্দ্র অতঃপর হঠাৎ যেন চুপ করে গেল। একটু পরে যেন কেমন চোরের মত নিঃশব্দে ফণীন্দ্র ঘর থেকে বের হয় গেল।

কিরীটী চেয়ে থাকে তার গমনপথের দিকে।

ডান পা-টা টেনে টেনে ফণীন্দ্র ঘর থেকে বের হয়ে গেল। এসেছিল একটা প্রতিবাদ জানাতে, এখন যেন ভীত চোরের মত মাথা নীচু করে ঘর থেকে বের হয়ে গেল।

॥ চোদ্দ ॥

কালো রঙের গ্রেট কোটটা শেষ পর্যন্ত পাওয়া গেল বাগানের মধ্যে।

বাগানে একটা গাছের ডালের সঙ্গে ঝুলছিল, একজন পুলিসেরই বাগানটা অনুসন্ধান করতে করতে চোখে পড়ে। কোটটা হাতে পুলিসটা কিরীটীর ঘরেই এসে ঢুকল।

চৌবেজীও ওই সময় কিরীটীর ঘরের মধ্যে বসেছিল। চিত্রাঙ্গদা দেবীর হত্যার ব্যাপার নিয়ে আলোচনা করছিল।

ইতিমধ্যে আরো একটা ব্যাপার ঘটে গিয়েছিল। পুলিস-প্রহরীর চোখে ধুলো দিয়ে হঠাৎ গতরাত্রে সুধন্য ইন্দ্রালয় থেকে উধাও হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু বেচারা বেশি দূরে যেতে পারেনি। কাতরাসগড় ছাড়িয়ে তেতুলিয়া হল্টের কাছাকাছি পরের দিনই সন্ধ্যায়ই সুধন্য ধরা পড়ে যায়।

সুধন্যকে পুলিস ধরে নিয়ে এসেছে।

চৌবেজীর ইচ্ছা ছিল সুধন্যকে নিয়ে গিয়ে একেবারে হাজতে পোরেন ; কারণ তাঁর ধারণা চিত্রাঙ্গদা দেবীর হত্যাকারী আর কেউ নয়—এই সুধন্যই।

কিন্তু কিরীটী বলেছে, না চৌবেজী, তাড়াহুড়ো করে কিছু করবেন না।

আপনি বুঝতে পারছেন না মিস্টার রায়,—চৌবেজী বলেছিলেন, ওকে ছেড়ে রাখলে বিপদ হবে।

কিছু হবে না আমি বলছি। কিরীটী মৃদু হেসে জবাব দিয়েছে।

কিন্তু গ্যারাণ্টিই বা কি?

গ্যারাণ্টি ওর নিজের চরিত্র।

বুঝলাম না আপনার কথাটা মিস্টার রায়!

ও পালিয়ে যেতে পারে না—পালাবার মত শক্তি ওর নেই।

কিন্তু—

আমি আপনাকে আগেই বলেছি চৌবেজী—আবারও বলছি, হত্যাকারী ও নয়।

তাই যদি নয় তো ওকে ছেড়ে দিলেই তো হয়, নজরবন্দী করে রাখবারই বা দরকার

কি?

দরকার আছে। যে দাবাখেলা আমরা শুরু করেছি, সেই দাবার ছকেরই ও জানবেন মোক্ষম একটি ঘুঁটি—একটি বোড়ে। সেই বোড়ের চালটি ঠিক সময়মত যখন দোব, দেখবেন সমস্ত কুয়াশা কেটে গেছে।

কুয়াশা!

হ্যাঁ—লক্ষ্য করেছেন, আজ কদিন থেকেই ভোরের দিকে কি ঘন কুয়াশা নামছে! হঠাৎ কিরীটী বলে ওঠে।

হ্যাঁ, দেখেছি। কথাটা বলে চৌবেজী কেমন যেন বোকার মত ফ্যাল-ফ্যাল করে তাকিয়ে থাকেন কিরীটীর মুখের দিকে।

আজও চৌবেজী আবার এসেছিল সুধন্যকে হাজতে নিয়ে গিয়ে পোরবার জন্য, কারণ ধরা পড়বার পর সুধন্যকে আবার এনে ইন্দ্রালয়ের মধ্যে নজরবন্দী রাখা হয়েছিল কিরীটীরই অনুরোধে। যদিও চৌবেজীর এতটুকু ইচ্ছা ছিল না সুধন্যকে আবার ইন্দ্রালয়ে ফিরিয়ে আনতে, কিন্তু কর্তৃপক্ষের নির্দেশ অমান্য করতে তিনি পারেননি। ওখানকার এস. পি. মিঃ সুন্দরায় চৌবেজীকে ডেকে বলে দিয়েছিলেন, কিরীটী যেমন বলবে, তাই যেন চৌবে করেন।

চৌবেজী বলেছিলেন, খুনীকো এই কোঠিমে রাখনা আচ্ছা নেহি!

লেকিন চৌবেজী, ম্যায়নে ত বহুত দফে কহা চুকা, উয়ো মুজলিম নেহি হ্যায়। কিরীটী বলে।

ম্যায়নে ভি ত ইতনা সাল বহি কাম কর রাহা হ্যায়—আগর উয়ো মুজলিম নেহি হোগা তো—ম্যায় পুলিসকো নোকরি ছোড় দুঙ্গা।

কিরীটী হাসে।

আর ঠিক সেইসময় পুলিসটা কোটটা নিয়ে ঘরে ঢোকে, হুজুর, দেখিয়ে ইয়ে পেরকা উপরসে মিলা!

চৌবেজী বিশেষ কোন আগ্রহ দেখান না ব্যাপারটায়। ওভারকোটটা কিরীটী যখন অনুসন্ধানের কথা বলেছিল, তখনো বিশেষ উৎসাহ প্রকাশ করেননি চৌবেজী।

চৌবেজী বলেন, রাখ দো—আভি—

পুলিসটি চলে যাচ্ছিল কিন্তু কিরীটী বাধা দিল। ডাকল, দেখি, দাও তো কোটটা।

পুলিসটা কোটটা কিরীটীর হাতে তুলে দিল।

কিরীটী প্রথমেই কোটটার পকেটগুলো ভাল করে পরীক্ষা করে একটার পর একটা—উল্লেখযোগ্য কিছুই মেলে না।

মেলে—একটা রুমাল, একটা দেশলাই আর একটা সিগারেট-কেস।

চৌবেজী চেয়ে চেয়ে কিরীটীর ব্যাপারটা দেখছিলেন—ঠোঁটের কোণে একটা অবজ্ঞার হাসির ক্ষীণ বিদ্যুৎ যেন।

কেয়া রায় সাহাব, কুছ মিলা?

কিরীটী কোন জবাব দেয় না। ওভারকোটটার কলারের কাছ থেকে একটা চুল টেনে বের করছে তখন সে।

চুলটা টেনে বের করে নাকের কাছে নিয়ে গিয়ে গন্ধ শোঁকে।

কি দেখছেন চুলটা নিয়ে অত রায় সাহেব,—চৌবেজী আবার বলে ওঠেন, বহি বালসেই কেয়া আপকো মালুম হো জায়গা খুনী কৌন?

কিরীটী ফিরে তাকাল এবার চৌবেজীর মুখের দিকে। কিরীটীর দু-চোখের দৃষ্টিতে যেন বিদ্যুতের আলো ক্ষণেকের জন্য ঝিলিক দিয়ে ওঠে।

শান্ত গলায় সে বলে, বেশখ, এই চুলটা থেকেই খুনীর পাত্তা আমি পেয়ে গেছি চৌবেজী।

সাচ?

হ্যাঁ, মুঝে মিল গিয়া।

কৌন থা উয়ো?

দো দিন বাদ আপকো বাতায়েঙ্গে।

সাচ?

জরুর।

কেয়া ম্যায়নে হ্যাণ্ডকাফ লাউ?

আগর আপকো দিল চাহে ত—আচ্ছা চৌবেজী, আমার একটু কাজ আছে। বলতে বলতে কিরীটী সহসা চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল।

চৌবেজীকেও অগত্যা উঠে দাঁড়াতে হয়।

তাহলে ওই কথাই রইল, কাল আসবেন—সকালেই—আচ্ছা নমস্তে।

কিরীটী আর দাঁড়াল না, মধ্যবর্তী দরজাপথে ঘরের মধ্যে ঢুকে গেল। চৌবেজী তারপরও কয়েক সেকেণ্ড ঘরের মধ্যে একা একা দাঁড়িয়ে থেকে ধীরে ধীরে দরজার দিকে অগ্রসর হল।

ওই দিনই সন্ধ্যার দিকে কিরীটী তার নির্দিষ্ট ঘরের মধ্যে বসে একটা বই পড়ছিল, মণীন্দ্র এসে ঘরে ঢুকল।

এদিকে ওদিকে চাইতে চাইতে মণীন্দ্র ঘরে এসে ঢুকল।

মিস্টার রায়!

আসুন মণীন্দ্রবাবু, আমি গত দুদিন ধরে আপনারই অপেক্ষা করছিলাম। কিরীটী হাতের বইটা মুড়তে মুড়তে মণীন্দ্রর দিকে তাকিয়ে বলল।

আমার অপেক্ষা করছিলেন?

মণীন্দ্র কেমন যেন একটু বিস্মিত হয়েই প্রশ্নটা করে কিরীটীর মুখের দিকে তাকিয়ে।

হ্যাঁ, আপনারই পথ চেয়ে ছিলাম বলতে পারেন। কিন্তু দাঁড়িয়ে কেন? বসুন।

মণীন্দ্র বসে না, কেমন যেন ইতস্তত করে।

আমি জানতাম মণীন্দ্রবাবু, আপনি আসবেন—বসুন।

আপনি জানতেন আমি আসব।

হ্যাঁ, জানতাম।

কিন্তু—

বসুন।

মণীন্দ্র মুখোমখি বসল চেয়ারটায়। সে যেন কেমন চিন্তিত মনে হয়।

কি ভাবছেন—যা বলতে এসেছেন, বলুন। ভয় নেই আপনার, নির্ভয়ে বলুন।

মিস্টার রায়, ফণী এসেছিল আপনার কাছে, তাই না?

হ্যাঁ।

কি বলেছে সে?

অনেক কিছুই বলেছেন, যা পুলিসের কাছে জবানবন্দিতে সে-সময় তিনি বলেননি।

তাহলে সে সব কিছু বলে দিয়েছে আপনাকে?

হ্যাঁ, সব।

উইল বদলের কথা?

উইল!

হ্যাঁ, বড়মা যে সেদিন তাকে বলেছিলেন, তিনি তাঁর আগের উইল বদলে ফেলবেন!

বলেছেন বৈকি।

কথাটা অবিশ্যি বড়মা আমাদের তিন ভাইকেই জানিয়েছিলেন।

কিরীটীর চোখের মণি দুটো সহসা যেন উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। কিন্তু মণীন্দ্রর সেটা নজরে পড়ে না।

আপনাকে কবে বলেছিলেন কথাটা তিনি?

যেদিন দুর্ঘটনাটা ঘটে, সেদিনই সন্ধ্যার সময়, যখন স্বাতীর জন্য আমি বড়মাকে অনুরোধ জানাতে যাই—

কি বলেছিলেন তিনি ঠিক?

স্বাতীর বিয়ের কথা বলতেই হঠাৎ তিনি চটে উঠলেন। বললেন, তোমাদের যার যা খুশি তোমরা করতে পার—যেখানে যার খুশি তোমরা এই মুহূর্তে এ-বাড়ি ছেড়ে চলে যেতে পার। পথের ভিখারী—তোমাদের এনে ক্ষীর আর ঘিয়ের বাটি মুখে তুলে দিয়েছিলাম। এখন দেখছি সে দয়াটা তোমাদের প্রতি দেখানোই আমার ভুল হয়েছে। পথের কুকুর চিরদিন পথের কুকুর থাকে—তাই সব থাকো গে। দূর হয়ে যাও সব এখান থেকে, তোমাদের কারো সঙ্গেই আমার কোন সম্পর্ক নেই—কালই আমি নতুন উইল করে তোমরা কেউ যাতে একটি কপর্দকও না পাও সে ব্যবস্থা করছি।

তারপর?

আমারও হঠাৎ রাগ হয়ে গেল—আমিও কড়া কড়া কয়েকটা কথা শুনিয়ে দিলাম বড়মাকে।

কি বলেছিলেন তাতে তিনি?

বলেছিলেন, তোমাদের সব চাবুক মারা উচিত থামের সঙ্গে বেঁধে, নিমকহারাম কুত্তার দল! তাতে আমি বলেছিলাম—

কি?

তাহলে তোমাকে জ্যান্ত রাখব না জেনো।

বলেছিলেন আপনি?

হ্যাঁ—যা কোনদিন হয় না—হঠাৎ যেন মাথার মধ্যে আমার আগুন জ্বলে উঠেছিল। পরে নিজেই অবাক হয়েছি কি করে বলতে পারলাম ও কথাগুলো বড়মাকে!

মারতে মারতে নিরীহ একটা বিড়ালছানাকে কোণঠাসা করলে, সেও শেষ পর্যন্ত থাবা

তুলে নখর বের করে শেষবারের মত ঝাঁপিয়ে পড়বার চেষ্টা করে মণীন্দ্রবাবু, আপনিও ঠিক তাই করেছিলেন।

কিন্তু বিশ্বাস করুন, সে আমার মনের কথা নয়—রাগের মাথায় যাই বলে থাকি না কেন—

কিরীটী মৃদু হাসে।

মণীন্দ্র বলে, তাঁকে হত্যা করব আমাদের স্বপ্নেরও অতীত।

মণীন্দ্রবাবু, একটা কথা—

মণীন্দ্র কিরীটীর দিকে তাকাল।

সে-সময় ঘরে আর কে ছিল মনে আছে আপনার?

সুরতিয়া ছিল।

আর কেউ না?

না, তবে বের হয়ে যাবার মুখে জয়ন্তদার সঙ্গে দেখা হয়েছিল, সে দরজার কাছেই দাঁড়িয়েছিল, তাই মনে হয়—

কি?

সেও আমাদের সব কথা শুনেছিল।

ঠিক আছে, আপনি এখন আসুন।

কিরীটীবাবু!

বলুন?

আপনি কি সত্যিই বিশ্বাস করেন, আমাদের ভাইদের মধ্যেই কেউ একজন—

সেটা ভাবাই তো স্বাভাবিক।

কেন?

কারণ তাঁর পূর্বের উইল বদল করবার ইচ্ছাটা। সেই আশঙ্কায় তাঁকে আপনাদের হত্যা করাটা খুবই তো স্বাভাবিক।

না না, তাই বলে হত্যা করব?

মানুষ মানুষকে বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই, একমাত্র দুর্ধর্ষ ক্রিমিন্যাল ছাড়া, চরম কোন উত্তেজনার মুহূর্তেই হত্যা করে বসে বা চরম আঘাত হেনে বসে।

মণীন্দ্র আর কোন কথা বলে না।

ধীরে ধীরে একসময় নিজের চেয়ার ছেড়ে উঠে ঘর থেকে বের হয়ে যায়।

আর কিরীটীও যেন নিজের চিন্তায় নিজে ডুবে যায়।

তার পরদিনই ভোরবেলা কিরীটী কলকাতায় চলে গেল এবং একদিন পরে আবার সন্ধ্যায় ফিরে এল।

কাল—আগামী কালই, কিরীটী চৌবেজীকে বলেছে আততায়ীকে ধরিয়ে দেবে।

কিরীটী ফিরে এসেছে শুনে জয়ন্ত চৌধুরী তার ঘরে এসে ঢোকে।

আসুন জয়ন্তবাবু।

মিস্টার রায়, একটা কথা জিজ্ঞাসা করতে এলাম।

কি বলুন তো?

pathagar.net

এভাবে কতদিন আর নজরবন্দী হয়ে এই ইন্দ্রালয়ে থাকতে হবে?

দুঃখের রাত্রি অবসান-প্রায়?

অবসান-প্রায়?

হ্যাঁ। বসুন, আপনার সঙ্গে আমার কিছু কথা আছে।

তারপর কিরীটী ও জয়ন্তর মধ্যে প্রায় ঘন্টাখানেক ধরে কথাবার্তা হল এবং রাত পৌনে আটটা নাগাদ জয়ন্ত কিরীটীর ঘর থেকে বের হয়ে গেল।

কিরীটী তার ক্লান্ত দেহটা আরামকেদারার ওপর শিথিল করে দেয়।

॥ পনের ॥

পরের দিন রাত্রে।

রাত তখন বারোটা বেজে গিয়েছে।

সমস্ত ইন্দ্রালয় যেন একেবারে নিস্তব্ধ নিঝুম হয়ে গিয়েছে। কিরীটী আলো জ্বেলেই শুয়ে ছিল শয্যার ওপর চোখ বুজে। ঘুমোয়নি। ঘড়িতে রাত বারোটা বাজতে দেখে শয্যা হতে উঠে পড়ল।

প্রস্তুত হয়েই ছিল সে। উঠে প্রথমেই ঘরের আলোর সুইচটা টিপে নিভিয়ে দিল। ঘর অন্ধকার হয়ে গেল।

বাইরের বাগানে ঝিঁ ঝিঁ ডাকছে। একটানা ঝিঁঝিঁর শব্দ নিষুতি রাতের কান্নার মতই যেন মনে হয়।

অন্ধকারেই কিরীটী তার শয়নঘরের মধ্যস্থিত গুপ্ত দরজা খুলে—যে দরজাপথে জয়ন্ত তাকে প্রথম রাতে গোপনে অন্য একটা সিঁড়ি দিয়ে চিত্রাঙ্গদা দেবীর বসবার ঘরে নিয়ে গিয়েছিল, সেই সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠে যায়।

চিত্রাঙ্গদা দেবীর বসবার ঘরের দরজার সামনে এসে দাঁড়াল কিরীটী।

দরজাটা ভেতর থেকে বন্ধ। কিরীটী বন্ধ দরজাটার গায়ে টুক টুক টুক করে পর পর তিনটি মৃদু টোকা দিল। ভেতর থেকে দরজা খুলে গেল।

ঘর অন্ধকার।

কিরীটী চট করে ঘরের দরজা খুলতেই ভেতর ঢুকে যায়।

কে!

কিরীট সে-কথার কোন জবাব না দিয়ে এগিয়ে হাত বাড়িয়ে ঘরের আলোটা জ্বেলে দিল।

সামনেই দাঁড়িয়ে সুরতিয়া।

সুরতিয়া কয়েকটা মুহূর্ত যেন বোবাদৃষ্টিতে কিরীটীর মুখের দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করে, বাবুজী আপ?

হ্যাঁ। সুরতিয়া, তোমার সঙ্গে আমার কয়েকটা কথা আছে।

কেয়া আপ পুঝনে চাহতে হে বাবুজী মুঝসে?

কিরীটী সুরতিয়ার মুখের দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে কয়েকটা মুহূর্ত, তারপর তার জামার পকেট থেকে সেদিন চিত্রাঙ্গদা দেবীর শয়নঘরের মেঝেতে কুড়িয়ে পাওয়া ভাঙা

কাচের চুড়ির টুকরোটা বের করে সামনে মেলে ধরে বলে, দেখ তো সুরতিয়া, এটা কি।

সুরতিয়া একটু যেন অবাক হয়ে কিরীটীর হাতের পাতায় ভাঙা কাচের চুড়ির টুকরোটার দিকে তাকিয়ে পালটা প্রশ্ন করে, কেয়া!

বুঝতে পারছ না?

মালুম হোতা হ্যায় চুড়িয়া কি টুকরা!

ঠিক। কিন্তু কোথায় পেয়েছি জান এটা?

কোথায় বাবুজী?

সে-রাত্রে রাণীমার ঘরের মেঝেতে। রাণীমার হাতে তো কাচের চুড়ি ছিল না আর তোমার দিদিমণির হাতেও নেই—আছে দেখছি তোমার হাতে।

কেয়া মতলব?

বুঝতে পারছ না সুরতিয়া?

নেহি ত!

এটা তোমারই হাতের একটা ভাঙা চুড়ির টুকরো।

আমার?

হ্যাঁ। যেটা সে-রাত্রে ভেঙে ঘরের মধ্যে পড়েছিল হয়তো।

আমার চুড়ি-ভাঙা!

হ্যাঁ, তোমারই। আর এটা কখন ভেঙেছিল জান?

কখন?

সে-রাত্রে—গণেশকে ডেকে দেবার পর, গণেশ তোমার রাণীমার ঘরে ঢুকে জয়ন্তবাবুকে ডাকতে বের হয়ে যাবার পর। এখন বল সে-রাত্রে রাণীমার নির্দেশে গণেশকে ডেকে দেবার পর তুমি কোথায় গিয়েছিলে।

কেন, নীচে বাগানে যেখানে গানবাজনা হচ্ছিল—

না।

বিশোয়াস কিজিয়ে বাবুজী—

নেহি, তুম ঝুট কহেতে হো।

ঝুট!

হ্যাঁ ঝুট—সাচ্ সাচ্ বাতাও।

লেকেন বাবুজী—

সাচ্ বাত ছুপানেসে কুছ ফায়দা নেহি হোগা—বাতাও—

সুরতিয়া বোবাদৃষ্টিতে চেয়ে থাকে কিরীটীর মুখের দিকে।

কিরীটী বলে চলে, গণেশকে ডেকে দিয়ে সোজা তুমি বাগানে যাওনি সে-রাত্রে। কোথায় গিয়েছিলে বল?

সুরতিয়া চুপ।

আমার ধারণা যদি মিথ্যে না হয় তো সে-রাত্রে তুমি নীচে আমার ঘরে ঢুকে যে পথ দিয়ে এইমাত্র আমি এসেছি, সে পথ দিয়ে গোপনে ওপরে উঠে আসো—, তারপর বল তুমি কি করেছ?

আপনার কথা কিছুই আমি বুঝতে পারছি না বাবুজী। আমি কেন আবার ওপরে আসব?

এসেছিলে তোমার কাজে এবং তার প্রমাণও আছে।

লেকেন কিঁউ?

কিঁউ? হঠাৎ কিরীটী প্রশ্ন করে, সুধন্য কে?

সুধন্য!

বল সে কে?

ওকে আমি চিনি না।

চেন।

নেহি।

আমি তাহলে বলি সুধন্য তোমার কে, তোমার ছেলে।

বাবুজী!

হ্যাঁ—রাজাবাবুর ঔরসে তোমার গর্ভে ওর জন্ম।

না, না—

আর্ত চিৎকার করে ওঠে সুরতিয়া।

হ্যাঁ, তোমার ছেলে। আর সেকথা তোমার রাণীমাও জানতেন বলেই নিজের স্বামীর লজ্জাকে ঢাকবার জন্য—নিজের আভিজাত্যকে বাঁচানোর জন্য তোমার এবং পাছে তুমি সব কথা প্রকাশ করে দাও, সেই ভয়ে সুধন্যকে থোকে থোকে টাকা দিয়ে এসেছেন বারবার। কেমন, তাই নয় কি!

সুরতিয়া একেবারে নিশ্চুপ।

সুধন্য তোমার ছেলে অবিশ্যি সে কথাটা এখনো জানে না। কিন্তু তোমার ব্ল্যাকমেলিং ক্রমশঃ যখন দিনের পর দিন বেড়েই চলতে লাগল, তখন তিনি আক্রোশের মাথায় বলে বসেন উইল তিনি বদল করবেন—যে উইলে সুধন্যরও একটা মোটা শেয়ারের ব্যবস্থা ছিল তাঁর সম্পত্তির—

কিরীটীর কথা শেষ হল না—একে একে ওই সময় ঘরে এসে ঢুকল জগদীন্দ্র, মণীন্দ্র, ফণীন্দ্র, শচীন্দ্র, স্বাতী, যোগেনবাবু, চৌবেজী ও সবশেষে জয়ন্ত।

এই যে আসুন আপনারা।

হঠাৎ জয়ন্তকে ঘরে ঢুকতে দেখে যেন একটা ক্রুদ্ধ বাঘিনীর মতই কোমর থেকে ধারালো একটা ছোরা বের করে জয়ন্তর ওপরে ঝাঁপিয়ে পড়ল সুরতিয়া।

বেইমান।

সকলে মিলে সুরতিয়াকে ধরে ফেলবার আগেই ছোরাটা জয়ন্তর হাতে বিঁধে গিয়েছিল। তবে বেশী আঘাত লাগেনি।

চৌবেজী ও মণীন্দ্র দুজনে সুরতিয়াকে দু হাতে শক্ত করে ধরে ফেলেন।

সুরতিয়া তখনো ক্ষিপ্র বাঘিনীর মত চেঁচাচ্ছে, ছোড় দো—ছোড় দো মুঝে—ও বেইমানকো হাম খতম কর দুঙ্গি।

চৌবেজীর ইঙ্গিতে দুজন পুলিস এসে ধরে সুরতিয়াকে।

কিরীটী বলে, বলেছিলাম চৌবেজী, আততায়ীকে আজ ধরিয়ে দেব। হাতকড়া লাগান, সে-রাত্রে সুরতিয়াই চিত্রাঙ্গদা দেবীকে হত্যা করেছিল আর ঐ ছোরাটা দিয়েই।

॥ ষোল ॥

ঘরের মধ্যে যেন সহসা বজ্রপাত হল।

সকলেই স্তম্ভিত, নির্বাক।

আরো কিছুক্ষণ পরে—সুরতিয়াকে পুলিস-ভ্যানে তুলে হাজতে পাঠাবার পর চিত্রাঙ্গদা দেবীর ঘরে বসেই কিরীটী ওদের সকলকে সমস্ত কাহিনী বিবৃত করে।

কিরীটী বলতে থাকে, প্রথম দিনই চিত্রাঙ্গদা দেবী সুধন্যকে নিয়ে তাঁর শয়নঘরে চলে যাবার পর চিত্রাঙ্গদা দেবীর স্বামী জিতেন্দ্র চৌধুরীর ফটোটার দিকে আমার নজর পড়ে এবং সঙ্গে সঙ্গে আমার মনের পাতায় ভেসে ওঠে সুধন্যর মুখটা।

দুটো মুখের মধ্যে আশ্চর্য মিল!

তারপরই সুধন্যকে ওইভাবে চিত্রাঙ্গদা দেবীর কাছে বার বার এসে টাকার দাবি করা ও চিত্রাঙ্গদা দেবীর টাকা দেওয়ার ব্যাপারটা মনের মধ্যে আনাগোনা করতে থাকে আমার।

বুঝতে পেরেছিলাম আমি—কোন গূঢ় কারণ না থাকলে চিত্রাঙ্গদা দেবীর মত মানুষ সুধন্যকে টাকা দেয় না। বিশেষ করে যাকে তিনি সবচাইতে বেশী ঘৃণা করতেন।

ভাবতে লাগলাম কিন্তু কি সে কারণ—কি?

তারপর শুনলাম ভূপৎ সিং ও তার স্ত্রী সুরতিয়ার কথা ও সুরতিয়ার প্রতি জিতেন্দ্র চৌধুরীর আকর্ষণের কথাটা।

সঙ্গে সঙ্গে যেন দুয়ে দুয়ে চার মিলে গেল। সব পরিষ্কার হয়ে গেল।

জয়ন্ত প্রশ্ন করে, কিন্তু ওকে আপনি সন্দেহ করলেন কি করে?

কিরীটী বলে, নিশ্চয়ই আপনার মনে আছে, আমি বার বার বলেছি সে-রাত্রে বিশেষ কোন পরিচিত জন, যার এ বাড়ির মধ্যে অবাধ গতিবিধি, তাদেরই কেউ একজন চিত্রাঙ্গদা দেবীকে হত্যা করেছে!

হ্যাঁ।

এবারে মনে করে দেখুন, সেরকম এ বাড়িতে কে কে ছিল—ওঁরা চার ভাই ও আপনি ছাড়া আর একজন, সে হচ্ছে ঐ সুরতিয়া—যে রাণীমার একপ্রকার প্রত্যক্ষ সহচরী ছিল সর্বক্ষণের। মণীন্দ্রবাবু ও জগন্দ্রীবাবুকে অনায়াসেই বাদ দিয়েছি, কারণ ওই সময় তাঁরা গানের আসরে ছিলেন। অর্থাৎ যে সময় হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হয়। শচীন্দ্র ও ফণীন্দ্রবাবুকে পরে জিজ্ঞাসাবাদ করে বাদ দিই সন্দেহের তালিকা থেকে।

তাছাড়া ওঁরা চারজন আর যাই করুন, হত্যা করবার মত নার্ভ বা মনের জোর তাঁদের কারোরই ছিল না। তাহলে বাকি থাকে দুজন—জয়ন্তবাবু ও সুরতিয়া। এবং ওদের দুজনের মধ্যে সবচাইতে সে-রাত্রে হত্যা করবার সুবিধা কার বেশী ছিল! সেটা ভাবতে গিয়েই মনে পড়ল সুরতিয়ার একটা কথা, কালো কোট পরিহিত যে লোকটিকে সুরতিয়া সিঁড়ি দিয়ে উঠে যেতে দেখেছিল তাকে নাকি তার জয়ন্তবাবু বলে মনে হয়েছিল।

তারপর? জয়ন্তই জিজ্ঞাসা করে।

অসাধারণ বুদ্ধিমতী ও দুঃসাহসিকা ছিল সুরতিয়া। কিন্তু সে একটা মারাত্মক ভুল করে—জয়ন্তবাবুর নাম করে ও কালো কোটের কথা বলে তার উপরে সন্দেহটা ফেলার জন্য। ওই কালো কোটের কথা না বললে, তত শীঘ্র সুরতিয়ার ওপরে গিয়ে সমস্ত সন্দেহ আমার

হয়ত পড়ত না। বুঝলাম, কোটটার সঙ্গে রহস্য জড়িয়ে আছে। আর সুরতিয়াও ভেবেছিল, কোটের কথা বললে কোটের অনুসন্ধান আমরা করব, এবং পরে যদি প্রমাণিত হয় কোটটা জয়ন্তবাবুর তাহলে তারই ওপর গিয়ে সকলের সন্দেহ পড়বে। সেই জন্যেই বা সেই উদ্দেশ্যেই সুরতিয়া ওইদিন হয়ত কোন একসময় জয়ন্তর ঘরে ঢুকে কোটটা চুরি করে নিয়ে এসে গোপনে সিঁড়ির ঘরে লুকিয়ে রেখে দেয়।

উ, কি শয়তানী! মণীন্দ্র বলে।

শয়তানির চাইতেও সে রাণীমার উইল বদলের কথা শুনে যে মরিয়া হয়ে উঠেছিল—কারণ সে বুঝতে পেরেছিল আপনাদের কারো জন্যই নয়—ঐ সুরতিয়ার হাত থেকে নিষ্কৃতি পাওয়ার জন্যই তিনি পূর্বের উইল বদলাতে মনস্থ করেছিলেন—যে উইলে হয় ত ঐ সুরতিয়ার চাপে পড়েই বাধ্য হয়ে একদিন তাঁকে উইলের মধ্যে সুধন্যর একটা ব্যবস্থা করতে হয়েছিল। তাঁর লজ্জার গোপন কাঁটা ঐ সুধন্য—যে লজ্জা চিরদিন তাঁর মনের মধ্যে গোপন রক্তক্ষয় করিয়েছে।

সুরতিয়া অস্থির হয়ে উঠলো। হয়ত রাণীমাকে সে নিরস্ত করবারও চেষ্টা করেছে, তারপর কিন্তু পারেনি—তখনই হয়ত মনে মনে রাণীমাকে সে হত্যার সংকল্প নেয় এবং সুযোগও এসে গেল তার অপ্রত্যাশিত ভাবে ঐ উৎসবের রাত্রেই।

অন্যান্য রাত্রের মত রাণীমা যে শেষ পর্যন্ত উৎসবে না উপস্থিত থেকে রাত দশটা নাগাদ ফিরে আসবেন তা সে জানত ও প্রস্তুত হয়েই ছিল—হলও তাই। রাণীমা রাত সোয়া দশটা নাগাদ যখন ফিরে এলেন—সুরতিয়া তখন দরজার আড়ালে ছোরা হাতে ওৎ পেতে আছে। রাণীমা যেই ঘরে ঢুকেছেন, সঙ্গে সঙ্গে পিছন থেকে রাণীমাকে ছোরা মারে সুরতিয়া।

জয়ন্ত প্রশ্ন করে, তাহলে গণেশ কার সঙ্গে দেখা করে কথা বলল?

গণেশ ভয়ে মিথ্যে কথা বলেছে। আদৌ সে রাণীমার সঙ্গে দেখা করেনি। ঘরের ভিতর থেকেই সুরতিয়াই রাণীমার গলার স্বর নকল করে জয়ন্তকে ডেকে আনতে বলে আমার ধারণা। তাই না গণেশ? তুমি ঘরে ঢুকেছিলে কি?

আজ্ঞে না, বাবু।

কিরীটী আবার শুরু করে, গণেশ চলে যাবার পরই ঘরের দরজাটা ভেজিয়ে দিয়ে সুরতিয়া বাগানে চলে যায়, রাণীমাকে হত্যা করে গোপন সিঁড়িপথ দিয়ে নীচে নেমে গিয়ে গণেশকে ডেকে দিয়ে আবার গোপন সিঁড়িপথ ধরেই তাড়াতাড়ি সুরতিয়া ফিরে এসেছিল, গণেশ রাণীমার ঘরের সামনে পৌঁছবার আগেই—আমার ঘর দিয়ে।

জয়ন্তবাবুকে কাল সন্ধ্যায়ই সব কথা আমি খুলে বলি। এবং এও বলি, সুরতিয়া এখন পালাবার চেষ্টা করছে এবং করবেই। কিন্তু পুলিসের জন্য সে পারছে না পালাতে। জয়ন্তবাবুকে বলে দিই, সুরতিয়ার সঙ্গে গিয়ে প্রেমের অভিনয় করে তাকে বলবেন সুরতিয়াকে তিনি ভালবাসেন—পুলিস তাকে সন্দেহ করছে—তারা পালাবে। সুরতিয়া হাতে স্বর্গ পেল—রাজী হয়ে গেল। জয়ন্তবাবুর অভিনয়মত সুরতিয়া প্রস্তুত হয়েই ছিল—কথা ছিল রাত বারোটায় এসে জয়ন্তবাবু ঘরের দরজায় টোকা দেবেন তিনবার।

সুরতিয়া টোপটা সহজেই গিলে ফেলে। তার পরের ব্যাপারও সবই আপনারা জানেন।

জয়ন্ত এবারে প্রশ্ন করে, কিন্তু সুরতিয়া যে আমার কোটটা ব্যবহার করেছিল, জানলেন কি করে?

কোটের কলারে একটা স্ত্রীলোকের চুল লেগেছিল, সেই চুলে ছিল সুরতিয়ার মাথার তেলের গন্ধ। একটা উগ্র তেল সুরতিয়া ব্যবহার করত। গন্ধটাতেই আমি ধরতে পারি ব্যাপারটা।

কিরীটী থামল।

কিন্তু সুধন্য কোথায়?

বাড়িতে এত কাণ্ড—সে কি জানতে পারেনি?

গণেশকে খোঁজ নিতে পাঠাল কিরীটী।

একটু পরে গণেশ এসে বলল, সুধন্য ঘুমোচ্ছে।

কিরীটী মৃদু হাসল।

PATHAGAR.NET

রক্তলোভী নিশাচর

কথামুখ

নিজ হাতে কালকূট নিজের শরীরে সংক্রামিত করে যে কালো ভ্রমর স্বেচ্ছা-মৃত্যুকে বরণ করে নিয়েছিল মিয়াং মিয়াংয়ের মৃত্যুগুহায় ও যার প্রাণহীন (?) দেহ সাশ্রুনেত্রে ইরাবতীর জলে ভাসিয়ে দিয়ে কিরীটী ও সুব্রত পরম নিশ্চিন্তে আবার কলকাতায় ফিরে এসেছিল, সেই সমাপ্ত কাহিনীরই যে আবার নতুন করে জের টানতে হবে কে ভেবেছিল! সত্যিই কি বিচিত্র এই মানুষের চরিত্র!

একটা অত্যাশ্চর্য প্রতিভা নিয়েই ডাঃ এস. সান্যাল—কালো ভ্রমর জন্মেছিল, কিন্তু যেন দুর্ভাগ্যের অভিশাপে রাহুগ্রস্ত হয়ে নিজের জীবনটাকে তো সে নিজে তছনছ করে দিলই, সেই সঙ্গে অত বড় একটা প্রতিভারও ঘটল অপমৃত্যু।

এবং সেই অপমৃত্যু তিলে তিলে তাকে যেন গ্রাস করছিল অজগর যেমন তার ধৃত শিকারকে একটু একটু করে গ্রাস করে তেমনি করেই।

দুইটি বৎসরের ব্যবধান।

ইরাবতীকূলের সেই প্রভাতেরই যেন সন্ধ্যা!

সুদূর বর্মা থেকে এবারে কাহিনী শুরু হল কলকাতার পটভূমিকায়।

মৃত্যুগুহা হতে টালিগঞ্জে স্যার দিগেন্দ্রনারায়ণের মার্বল প্যালেসে।

সুব্রতর জবানীতেই এবারের কাহিনী।

শামুক যেমন খোলার মধ্যে আপনাকে মাঝে মাঝে গুটিয়ে নেয়, ঠিক তেমনি কিরীটীকেও মাঝে মাঝে দেখেছি বাইরের জগৎ থেকে যেন আপনাকে গুটিয়ে নিয়ে অদ্ভুত আত্মস্বতন্ত্র এক জগতের মধ্যে যেন সে নিজেকে নির্বাসিত করত।

কয়েক মাস থেকে লক্ষ্য করছিলাম কিরীটীর সেই অবস্থা। বাড়ি থেকে কোথাও বের হয় না। হয় নিজের ল্যাবরেটারী ঘরে, না-হয় বসবার ঘরে সমস্ত দিনটা তো কাটায়ই, এমন কি কোন কোন দিন গভীর রাত পর্যন্তও কাটিয়ে দেয়।

ঐ সময়টা ও বন্ধুবান্ধব কারো সঙ্গেই বড় একটা দেখা করে না। আমিও দুদিন এসে ফিরে গেছি, কিরীটীর সঙ্গে দেখা হয়নি।

দুদিন এসে জেনেছি কিরীটী ল্যাবরেটারী ঘরেই আছে। কিন্তু আমি জানতাম মনের মধ্যে বাইরের জগৎ থেকে সে যখন নিজেকে এভাবে নির্বাসিত করে, তখন কাউকেই সে সহ্য করতে পারে না। সেই কারণেই আমিও তাকে বিরক্ত করিনি।

দিন দশেক বাদে গেলাম।

সেদিনও জানতে পারলাম কিরীটী সকাল থেকে তার ল্যাবরেটারী ঘরের মধ্যেই আছে।

জংলীর কাছে সংবাদ নিচ্ছি এমন সময় সহসা ল্যাবরেটারীর দরজা খুলে কিরীটী বের হয়ে এল এবং আমাকে ঘরের মধ্যে দেখতে পেয়ে বলল, এই যে সু, খবর কি? হঠাৎ অনেক দিন এদিকে আসিস না!

আমি মৃদু হেসে বললাম, ঠিক উল্টোটি। আজকে নিয়ে তিনদিন বরং তোরই পাত্তা নেই।

পাত্তা নেই মানে! আমি তো দু মাস ধরে বাড়ি থেকে কোথাও বেরই হই না।

আবার বুঝি কোন জটিল মামলা হাতে নিয়েছিস?

মামলা নয়। মামলা-কাহিনী। বলে জংলীর দিকে তাকিয়ে বললে, এই, চা নিয়ে আয়।

জংলী আদেশ পালনের জন্য ঘর হতে বের হয়ে গেল।

মামলা-কাহিনী মানে? বিস্মিত ভাবে ওর মুখের দিকে তাকালাম।

একটা আত্মচরিত লিখছি।

আত্মচরিত লিখছ?

হ্যাঁ। তবে আত্মচরিত সাধারণত যে-রকমটি হয়, এ সে-রকম নয়। আত্মচরিতের 'আত্ম'টিকে বাদ দিয়ে কেবল জীবনের অভিজ্ঞতাগুলোকে সাজিয়ে যাচ্ছি পর পর।

সত্যি?

হ্যাঁ।

॥ এক ॥

কিছু দিনের ব্যাপার।

হাতে কোন কাজকর্ম নেই বলে কিরীটী তার বৈচিত্র্যপূর্ণ আত্মজীবনী লিখছিল। রাত্রে সে লিখত এবং যতটুকু লেখা হত পরদিন প্রত্যূষে সেটা পাঠিয়ে দিত আমাকে পড়তে।

আমি অত্যন্ত আগ্রহের সঙ্গেই সমস্ত দুপুরে পড়ে সেটা আবার সন্ধ্যায় পাঠিয়ে দিতাম।

সত্যিই ডায়েরীটা পড়তে বেশ ভাল লাগছিল।

গতকাল সকালে কী একটা জরুরী কাজে কিরীটী রাণাঘাট গেছে। ডায়েরীটা তাই আমার কাছেই রয়ে গেছে।

নতুন করে আর কিছু লেখা হয়নি।

বিকেলের দিকে সে আমাকে রিং করে জানিয়েছে—রাত্রে আমাদের দুজনের কোথায় নাকি নিমন্ত্রণ আছে ; সে এখানেই আসবে, তারপর সন্ধ্যার পর দুজনে একসঙ্গে বেরুবে ; আমি যেন প্রস্তুত হয়ে থাকি। ঘড়িতে ঢং ঢং করে ছটা বেজে গেল।

শীতের রাত্রি, তারপর আবার সন্ধ্যা থেকেই টিপ টিপ করে বৃষ্টি পড়তে শুরু হয়েছে। শীতের হিমেল হাওয়া মাঝে মাঝে উত্তর দিকের জানলার পর্দার ফাঁক দিয়ে ঘরের মধ্যে এসে ঢুকছে বেপরোয়া। ঠাণ্ডা গায়ে যেন ছুঁচ ফোটাচ্ছে।

সোফার ওপরে গা এলিয়ে দিয়ে কিরীটীর আত্মজীবনীটা আবার খুলে বসলাম।

গতকাল ডায়েরীর একটা জায়গা পড়তে পড়তে সত্যিই অদ্ভুত লেগেছিল।

সেই জায়গাটাই আবার পড়া শুরু করলাম।

এ জীবনে অনেক কিছুই বিচিত্র ও অদ্ভুত দেখলাম। কিন্তু নিশাচরদের মত ভয়ঙ্কর বোধ হয় আর কিছুই নেই। আধুনিক সভ্য সমাজে "নিশাচরে"র অভাব নেই। সাক্ষাৎ শয়তানের যেন প্রতীক এরা, দিনের আলোয় এদের দেখলে চিনতে পারবে না কেউ। অতি শান্ত, শিষ্ট, ভদ্র, বিনয়ী, শিক্ষিত ও মার্জিত রুচিসম্পন্ন, কিন্তু যত রাতের অন্ধকার একটু একটু করে পৃথিবীর বুকে ঘনিয়ে আসে, চারদিক হয়ে আসে নিঝুম, ক্ষুধিত হায়নার মতই ঐ তথাকথিত নিশাচরেরা তখন যেন হয়ে ওঠে রক্তলোলুপ ও হিংস্র ভয়ঙ্কর। তখন এদের দেখলে আঁতকে

উঠবে নিশ্চয়ই। তাই বলছিলাম, যদি কোন গভীর রাত্রে, কখনো এই শহরেও ঘরের বদ্ধ দরজায় করাঘাত শোন, দরজা খুলো না। সাবধান, কে বলতে পারে...

এই পর্যন্ত লিখেই হয়তো সে রাতের মত শেষ করেছে। কেননা এর পর আর কিছু লেখা নেই।

গায়ের মধ্যে যেন কেমন সিরসির করে ওঠে। গায়ের লোমকূপগুলো খাড়া হয়ে ওঠে কি একটা দুর্জ্ঞেয় ভয়ে।

একটা অশরীরী ছায়ার মত অদ্ভুত আশঙ্কা যেন মনের মধ্যে মাকড়সার বাঁকানো বাঁকানো রোমশ সরু সরু কুৎসিত ঠ্যাং ফেলে ফেলে এগিয়ে আসে।

বাইরের দরজায় কড়া নাড়ার শব্দ শোনা গেল।

কে? উঠে দরজাটা খুলে দিতেই কিরীটী এসে ঘরে প্রবেশ করল, সুব্রত, রেডি!

হ্যাঁ। মৃদুস্বরে জবাব দিলাম। তারপর ওর মুখের দিকে তাকিয়ে বললাম, এক্ষুনি বের হবে তো?

না। বাড়িতে ঢুকেই মাকে বলে এসেছি এক কাপ গরম কফি পাঠিয়ে দিতে। বলতে বলতে কিরীটী একটা সোফার ওপরে গা এলিয়ে দিল, উঃ, কি ঠাণ্ডা পড়েছে দেখেছিস? এক কাপ স্ট্রং এবং গরম কফি না হলে আর যেন যুৎ হচ্ছে না!

অদূরে রক্ষিত টেবিল-ল্যাম্পের আলোর খানিকটা কিরীটীর মুখের ওপর ছড়িয়ে পড়েছে। আজ কিরীটীর পরিধানে সার্জের অ্যাস্-কল্যারের সুট, গলায় সাদা শক্ত উঁচু কলার ও বড় বড় রক্তলাল বুটি দেওয়া টাই, ব্যাকব্রাশ করা চুল। সূক্ষ্ম মৃদু একটা অতিমিষ্টি ল্যাভেণ্ডারের গন্ধ ঘরের বাতাসকে আমোদিত করে তুলেছে।

কিরীটীর চিরকালের অদ্ভুত শান্ত মুখখানা যেন আজ আরো শান্ত ও গম্ভীর মনে হচ্ছিল। ওর মুখের দিকে তাকিয়ে বললাম, এ বেশে কেন বন্ধু? একেবারে বিলিতী!

আজ আমরা কোথায় নিমন্ত্রণে চলেছি জানিস?

কোথায়? প্রশ্ন করলাম।

বিশালগড়ের কুমার দীপেন্দ্রনারায়ণের জন্মতিথি উৎসব আজ।

কোন্ দীপেন্দ্রনারায়ণ? সকৌতুকে প্রশ্ন করলাম।

স্যার দিগেন্দ্রনারায়ণকে নিশ্চয়ই ভুলিসনি! যাঁর মাথা খারাপ হয়েছে বলে বছর দুয়েক আগে রাঁচির পাগলা-গারদে রাখা হয়েছিল!

কোন্ স্যার দিগেন্দ্র, বিখ্যাত সেই সায়েন্টিস্ট, না? আমি প্রশ্ন করলাম।

হ্যাঁ স্যার দিগেন্দ্র আর গণেন্দ্রনারায়ণ ছিলেন দুই ভাই। গণেন্দ্রনারায়ণ বড়, আর দিগেন্দ্র ছোট। দিগেন্দ্র অবিবাহিত, আজন্ম ব্রহ্মচারী। গণেন্দ্রর একটি মাত্র ছেলে—ঐ দীপেন্দ্র। দীপেন্দ্রর যখন বছর ষোল বয়স তখন তাঁর ভয়ানক অসুখ হয়। স্যার দিগেন্দ্র শহরের সমস্ত বড় বড় ডক্তারকে ডাকলেন, অনেক চেষ্টা করা হল, কিছুতেই কিছু হয় না। এমন সময় এক সন্ধ্যায় ডাক্তারেরা শেষ জবাব দিয়ে গেলেন। বলতে বলতে কিরীটী থামল, বাইরে তখন সমগ্র আকাশ আসন্ন ঝড়ের ইশারায় ভয়ঙ্কর হয়ে উঠেছে।

তারপর? রুদ্ধশ্বাসে কিরীটীর কথা শুনছিলাম।

তারপর সেই রাত্রেই দীপেন্দ্রনারায়ণ মারা গেলেন। সে রাত্রে ঝড়জলের বিরাম ছিল না। সেই ঝড়জলের মধ্যেই দাহকারীরা শবদেহ নিয়ে শ্মশানের দিকে রওনা হয়ে গেল।

ভৃত্য এসে কাচের একটা প্লেটের ওপর ছোট একটা কাচের জাগে ভর্তি ধূমায়িত কফি দিয়ে গেল।

কিরীটী জাগটা তুলে নিল।

গরম কফিতে মৃদু চুমুক দিতে লাগল।

সারাটা শহর সে রাত্রে ঝড়জলে তোলপাড় হয়ে যাচ্ছে। জনহীন রাস্তা, শুধু মাঝে মাঝে অল্প দূরে গ্যাসপোস্টগুলো একচক্ষু ভূতের মতই যেন এক পায়ে ঠায় দাঁড়িয়ে ভিজছে। দাহকারীরা শবদেহ নিয়ে এগিয়ে চলল নিঃশব্দে, দুর্যোগ মাথায় করেই। কেওড়াতলার কাছাকাছি আসতে সহসা একটা প্রকাণ্ড কালো রংয়ের সিডনবডি গাড়ি ওদের পথ রোধ করে দাঁড়াল। গাড়ির ভিতর থেকে বেরিয়ে এল আপাদমস্তক ওয়াটারপ্রুফে ঢাকা একটা লোক, হাতে তার উদ্যত একটা রিভলবার। রিভলবারের ইস্পাতের চোংটা চকচক করে ওঠে। লোকটা কঠিন আদেশের সুরে বললে, শবদেহ এখানে রেখেই তোমরা চলে যাও। লোকগুলো প্রাণের ভয়ে শবদেহ রাস্তার ওপরে ফেলে দিয়েই ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটে পালিয়ে প্রাণ বাঁচাল।

বাড়িতে যখন ওরা কোনমতে ফিরে এল, রাত্রি তখন অনেক। বাইরের ঘরে একাকী স্যার দিগেন্দ্র ভূতের মত পায়চারি করছিলেন। সব কথা ওরা স্যার দিগেন্দ্রকে একটু একটু করে খুলে বললে। স্যার দিগেন্দ্র ওদের মুখে সমস্ত কথা শুনে স্তম্ভিত হয়ে গেলেন ; পুলিসে সংবাদ দেওয়া হল, কিন্তু শবদেহের কোন কিনারাই আর হল না। শবদেহের অদৃশ্য হওয়ার ব্যাপারটা আগাগোড়া একটা মিস্ট্রি হয়েই থেকে গেল।

কিরীটী নিঃশেষিত কফির কাপটা টিপয়ের ওপর নিঃশব্দে নামিয়ে রেখে হাত-ঘড়িটার দিকে তাকিয়ে বললে, ওঠ্ সু, সময় হয়েছে, বাকিটা গাড়িতে বসে বসে শেষ করব। পাশের ঘরেই দেওয়ালে টাঙানো ঘড়িটায় ঢং ঢং করে রাত্রি আটটা ঘোষণা করল।

বাড়ির দরজাতেই রাস্তায় কিরীটীর সদ্যক্রীত কালো রংয়ের সিডনবডি প্লাইমাউথ গাড়িখানা শীতের অন্ধকার বাদলা রাত্রির সঙ্গে মিশে গিয়ে যেন একপ্রকার নিশ্চিহ্ন হয়েই দাঁড়িয়ে ছিল। শিখ ড্রাইভার হীরা সিং আমাদের দরজার একপাশে নিঃশব্দে অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে চুপটি করে দাঁড়িয়ে ছিল। আমরা দুজনে গিয়ে গাড়িতে উঠে বসলাম ; হীরা সিংও আমাদের পিছু পিছু এসে গাড়িতে উঠল। গাড়িতে উঠতে গিয়ে দেখলাম দুজন ভদ্রলোক আগে থেকেই গাড়িতে চুপ করে বসেছিলেন। আমি কোন প্রশ্ন করবার আগেই কিরীটী বললে, এঁরা দুজন আমাদের সঙ্গেই যাবেন।

বুঝলাম কোন বিশেষ উদ্দেশ্যেই ওঁরা আমাদের সঙ্গে চলেছেন। গাড়ি স্টার্ট দিল।

কিরীটী হীরা সিংকে সম্বোধন করে বললে, বেহালা, কুমার দীপেন্দ্রনারায়ণের মার্বেল হাউস। নিঃশব্দ গতিতে গাড়ি ছুটল।

শীতের অন্ধকার রাত্রি কালো মেঘের ওড়না টেনে দিয়ে নিঃশব্দে টিপ টিপ করে অশ্রুবর্ষণ করছে। এর মধ্যেই শহরের দোকানপাট একটি দুটি করে বন্ধ হতে শুরু হয়েছে। কিরীটী নিঃশব্দে গাড়ির সীটে গা এলিয়ে দিয়ে একটা চুরুট টানছিল। কিরীটীর ওষ্ঠধৃত চুরুটের জ্বলন্ত অগ্রভাগটা যেন একটা আগুনের চোখের মত অন্ধকারে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে। সহসা এক সময় সেই কঠিন স্তব্ধতা ভঙ্গ করে কিরীটীই প্রথম কথা বললে, তারপর দীর্ঘ বারো বছর পরে সেই দীর্ঘ বারো বছর আগেকার শ্মশানরাত্রির স্মৃতি যেন আবার স্পষ্ট

হয়ে উঠল। সহসা এক সন্ধ্যায় সেই মৃত দীপেন্দ্রনারায়ণ অকস্মাৎ সজীব হয়ে ফিরে এলেন। এসে বললেন, একদল নাগা সন্ন্যাসী সেই রাত্রিতে শ্মশান থেকে মৃত বলে পরিত্যক্ত তাঁর দেহ কুড়িয়ে এনে কি সব তন্ত্রমন্ত্র ও বন্য ঔষুধ খাইয়ে বাঁচিয়ে তোলে। বছর পাঁচেক বাদে তাদের কবল থেকে কোনক্রমে তিনি পালিয়ে এসেছেন ; কিন্তু দুর্ভাগ্য, হঠাৎ পথিমধ্যেই একদল দস্যুর পাল্লায় গিয়ে পড়লেন। আট বছর তাদের কাছে বন্দী থাকার পর এক রাত্রে অদ্ভুত উপায়ে পালিয়ে আসতে সক্ষম হয়েছেন। বিচিত্র রহস্যময় সে কাহিনী।

কিছুক্ষণ থেমে আবার কিরীটী শুরু করে, স্যার দিগেন্দ্র অবিশ্যি প্রথমে ভাইপোকে বিশ্বাস করতে পারেননি। কিন্তু ভাইপো অনেক কিছু প্রমাণের দ্বারা কাকার সমস্ত সন্দেহের নিরবসান করে দিলেন। আত্মীয়স্বজনদের মধ্যেও অনেকেই তাঁকে নিঃসন্দেহে গণেন্দ্রনারায়ণের একমাত্র সন্তান 'দীপেন্দ্র' বলে মেনে নিলেন। এবং অতঃপর স্যার দিগেন্দ্র ভাইপো দীপেন্দ্রকে প্রাসাদে স্থান দিলেন। এরপর কিছুদিন নির্বিঘ্নে কেটে গেল। তারপর হঠাৎ একদিন শোনা গেল, স্যার দিগেন্দ্রর নাকি কেমন মাথায় গোলমাল দেখা দিয়েছে। দিনের বেলায় লোকটি ধীরস্থির, অত্যন্ত ভদ্র ও অমায়িক ; কিন্তু রাত্রি হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই যেন তাঁর মাথায় খুন চাপে ; ধারালো ছুরি ও ক্ষুর নিয়ে সামনে যাকে দেখেন তাকেই খুন করতে যান। ডাক্তার এল, বললে, রোগটা ভাল না। অত্যাধিক চিন্তার ফলে নাকি এরকমটি হয়েছে। বিশেষজ্ঞরা পরামর্শ দিলেন রোগীকে এখন সর্বদা চোখে চোখে রাখতে হবে। এমনি করেই কিছুদিন চলল, সহসা এক রাত্রে স্যার দিগেন্দ্র কুমার দীপেন্দ্রনারায়ণকেই ধারালো একটা ক্ষুর দিয়ে কাটতে উদ্যত হলেন।

হ্যাঁ, আমিও খবরের কাগজে এ ব্যাপারটা পড়েছি। বললাম, খুব বাঁচা বেঁচে গিয়েছিলেন সেদিন কুমারসাহেব। এবং তারপরই স্যার দিগেন্দ্রকে রাঁচির পাগলা-গারদে ভর্তি করে দেওয়া হয়, না?

কিরীটী মৃদুকণ্ঠে বলল, হ্যাঁ।

এখনও বোধ হয় পাগলা-গারদেই আছেন? বেচারী! অত বড় একটা প্রতিভাসম্পন্ন লোক!

না, মোটেই না। কিরীটী মৃদু হেসে বললে, তোমরা জান লক্ষপতি স্যার দিগেন্দ্রনারায়ণকে রাঁচির পাগলা-গারদে একটা প্রাইভেট সেলে বছর তিন আগে যেমন রাখা হয়েছিল, এখনও বুঝি তেমন আছেন!

তবে? বিস্মিত দৃষ্টিতে কিরীটীর মুখের দিকে তাকালাম।

বছর দুই হল সহসা এক রাত্রে স্যার দিগেন্দ্র সবার অলক্ষ্যে পাগলা-গারদ থেকে পালিয়ে যান।

বল কি! তারপর?

তারপর,—তারপর আর কি? পুলিস ও আই. বি. ডিপার্টমেণ্টের লোকেরা অনেক খোঁজাখুঁজি করেও তাঁর টিকিটির দর্শন আজ পর্যন্ত পাননি।

তারপর একটু থেমে কিরীটী বললে, কিন্তু মাত্র সপ্তাহখানেক হল একটা মজার সংবাদ পাওয়া গেছে। সংবাদটা অবিশ্যি অত্যন্ত গোপনীয়, আই. বি. ডিপার্টমেণ্টের এক 'কনফিডেনসিয়াল' ফাইলেই মাত্র টোকা আছে।

আমি রুদ্ধনিশ্বাসে প্রশ্ন করলাম, কী?

মাস দুই আগে খবরের কাগজে বিখ্যাত ডাঃ রুদ্রের অদ্ভুতভাবে নিহত হবার কথা পড়েছিলি, মনে আছে সু?

মৃদু স্বরে বললাম, মনে আছে বৈকি।

কিরীটী প্রায়-নিভন্ত চুরুটটা গাড়ির জানলা দিয়ে ফেলে দিল। তারপর বলতে লাগল, সমগ্র ভারতবর্ষে ডাঃ রুদ্রের মত Plastic surgery-তে (গঠন-মূলক অস্ত্র চিকিৎসা) অদ্ভুত পারদর্শিতা আর কারও ছিল না। তিনি দেহ ও মুখের ওপর অস্ত্র দিয়ে সামান্য কিছু কাটাকুটি করে দেহ ও মুখের চেহারা এমন ভাবে পরিবর্তন করে দিতে পারতেন যে, তাকে পরে আর আগেকার সেই লোক বলে চেনবারও কোন উপায় পর্যন্ত থাকত না।

কিন্তু ডাঃ রুদ্র যেমন একদিকে ছিলেন অদ্ভুত প্রতিভাসম্পন্ন, অন্যদিকে ছিলেন তেমনি একটু বেশ আধপাগলাটে ধরনের ও খামখেয়ালী প্রকৃতির। লোকটার একটা প্রচণ্ড নেশা ছিল, প্রত্যেক রবিবার রাঁচির পাগলা-গারদে গিয়ে বেছে বেছে যারা criminal পাগল তাদের সঙ্গে নানারকম কথাবার্তা বলে বহু সময় কাটিয়ে আসা। ডাঃ রুদ্র আগে যখন কলকাতায় প্র্যাকটিস করতেন, শোনা যায় তখনও তিনি নাকি বছরের মধ্যে প্রায় চার-পাঁচ বার রাঁচি ও বহরমপুরের পাগল-গারদে ছুটে যেতেন।

শেষটায় বছর দুই হল কলকাতার প্র্যাকটিস তুলে দিয়ে রাঁচিতে গিয়েই সুন্দর চমৎকার একটা বাড়ি তৈরী করে নানকুমে স্থায়ীভাবে বসবাস ও প্র্যাকটিস শুরু করেন। ডাক্তার রুদ্র ছিলেন আজন্ম ব্রহ্মচারী। মাস দুই আগে অকস্মাৎ একদিন অতি প্রত্যুষে ডাঃ রুদ্রের দেহহীন মস্তকটি তাঁরই ল্যাবরেটারী-ঘরের কাচের টেবিলের ওপর রক্ষিত একটা কাচের জারের মধ্যে দেখতে পাওয়া যায়। পুলিস অনেক খোঁজাখুঁজি করেও তাঁর দেহটি খুঁজে পায়নি। কাটা মাথাটা দেখে স্পষ্টই মনে হয়, কোন ধারালা অস্ত্র দিয়েই নিখুঁতভাবে দেহ থেকে মাথাটা পৃথক করে নেওয়া হয়েছিল। কিরীটী আবার একটা সিগারে অগ্নিসংযোগ করল। গাড়ি তখন কালীঘাট ব্রীজ ক্রস করে ছুটে চলেছে বেলভেডিয়ার রোড ধরে।

শীতের জলসিক্ত হিমেল হাওয়া চলন্ত গাড়ির মুক্ত জানলা-পথে প্রবেশ করে নাকেমুখে আমাদের যেন ছুঁচ ফোটাচ্ছিল। জ্বলন্ত সিগারের লাল আগুনের আভায় ঈষৎ রক্তাভ কিরীটীর গম্ভীর মুখের দিকে তাকিয়ে আমি চুপটি করে বসে রইলাম।

কিরীটী আবার বলতে লাগল, পুলিসের ধারণা স্যার দিগেন্দ্রই নাকি হতভাগ্য ডাঃ রুদ্রের হত্যার ব্যাপারে অদৃশ্যভাবে লিপ্ত।

কেন? আমি প্রশ্ন করলাম।

কেন, তা ঠিক বলতে পারব না, কিরীটী বলতে লাগল, পুলিসের লোকেরা ডাঃ রুদ্রের অ্যাসিস্টান্ট ডাঃ মিত্রের কাছে কতগুলো কথা জানতে পারে। অ্যাসিস্টান্ট ডাঃ মিত্র বলেন, একটি পেসেন্ট নাকি ডাক্তারের নিহত হবার দিন দশেক আগে তাঁর কাছে চিকিৎসার জন্য আসে এবং ডাক্তার নিজেই একা একা পেসেন্টকে ক্লোরোফর্ম করে তার মুখে অপারেশন করেন—পেসেন্টেরই ইচ্ছাক্রমে ডাঃ মিত্রের কোন সাহায্য না নিয়ে। অ্যাসিস্টান্ট ডাঃ মিত্র অবিশ্যি জীবনে কখনো স্যার দিগেন্দ্রকে দেখেননি বা চিনতেনও না এবং লোকটি যে ঠিক কেমন দেখতে তাও তিনি বলতে পারেননি। ডাঃ মিত্রের জবানবন্দি থেকে জানা যায়, সেই পেসেন্ট ডাক্তারের সঙ্গে অন্ধকার ঘরে বসে নাকি কথাবার্তা বলত ; তবে অপারেশনের পর রাত্রে একবার অ্যাসিস্টান্টটি পেসেন্টকে পথ্য ও ঔষধ খাওয়াতে কয়েকবার গিয়েছিল

সামনে ; কিন্তু তখন পেসেন্টের সমস্ত মুখে ব্যাণ্ডেজ বাঁধা, চিনবার উপায় ছিল না। অপারেশনের দিন দুই বাদে এক গভীর রাত্রে পেসেন্ট ডাক্তারের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে চলে যায়। আগেই বলেছি, শহরের একধারে ছিল ডাঃ রুদ্রের বাড়ি।

তারপর? আমি প্রশ্ন করলাম।

তারপর সেই রাত্রে একজন লোককে নাকি কালো একটা ওভারকোট গায়ে, মাথায় কালো একটা টুপি, চোখের পাতা পর্যন্ত নামানো, ডাক্তারের বাড়ি থেকে বের হয়ে আসতে একজন প্রহরারত পুলিস দেখেছিল। প্রহরারত পুলিসটা তখন নাকি সেই রাস্তা দিয়েই ফিরছিল। পুলিস যাকে সেই রাত্রে ডাঃ রুদ্রের বাড়ির সামনে রাস্তা দিয়ে যেতে দেখেছিল সেই লোকটি পুলিসের দিকে একটিবারও না তাকিয়ে তার পাশ দিয়েই রাস্তা ধরে নাকি চলে যায় খোসমেজাজে একটা গানের সুর শিস দিতে দিতে। পুলিস তাকে সন্দেহ করেনি, কারণ তাকে সে কোন একজন সাধারণ পথচারীই ভেবেছিল।

আগেই বলেছি পরদিন ভোরবেলা ডাক্তারের মুণ্ডুটা তাঁরই ল্যাবরেটারী-ঘরে টেবিলের ওপর রক্ষিত একটা কাচের জারের মধ্যে পাওয়া যায়। সে যাই হোক, এই এতগুলো ঘটনাকে যদি এক সূত্রে গাঁথা যায় তবে একটা কথা বিশেষভাবে মনের মধ্যে স্বতঃই উদিত হয়।

কী? আমি প্রশ্ন করলাম।

স্যার দিগেন্দ্র বোধ হয় এখনও জীবিত। এবং তাঁর সেই বিকৃত-মস্তিষ্কের কল্পনা—

কিরীটী হঠাৎ চুপ করে গেল।

কিরীটী কি বলতে বলতে থেমে গেল জানি না, তবে আমার মনে হল স্যার দিগেন্দ্র এখনও যেন রাতের অন্ধকারে বিকৃত একটা রক্ত-নেশায় কুমার দীপেন্দ্রর পিছু পিছু ছায়ার মতই ঘুরে বেড়াচ্ছেন।

মনটার মধ্যে যেন সহসা কি একটা অজানিত আতঙ্কে ছাঁত করে উঠল।

একটা অদৃশ্য ভয় যেন অন্ধকারে অক্টোপাশের মতই ক্লেদাক্ত পিচ্ছিল অষ্টবাহু দিয়ে আমার চারপাশে ঘন হয়ে উঠছে।

গাড়ির মধ্যকার মৃদু নীলাভ আলোয় কিরীটীর মুখের দিকে দৃষ্টিপাত করলাম—কিরীটীর দুটি চক্ষু বোজা।

কি এক গভীর চিন্তায় যেন সে তলিয়ে গেছে।

বাকি দুজন ভদ্রলোক, যাঁরা ঠিক আমার পরেই সেই একই সীটে **পাশাপাশি বসে** অন্ধকারে তাদের মুখগুলো যেন পাথরের মতই কঠিন ভাবহীন।.....

আমি চোখটা ফিরিয়ে নিলাম।

॥ দুই ॥

গাড়িটা একটা মৃদু ঝাঁকুনি দিয়ে থেমে গেল। একটা মৃদু গোলমাল অস্পষ্ট গুঞ্জনের মত আমাদের কানে এসে বাজল।

আমরা এসে গেছি সুব্রত। চল্, নামা যাক। কিরীটী বললে।

আমরা দুজনে গাড়ি থেকে নামলাম প্রথমে এবং আমাদের সঙ্গে সঙ্গে বাকি দুজন

ভদ্রলোকও গাড়ি থেকে নামলেন।

কুমার দীপেন্দ্রর প্রাসাদতুল্য মার্বেল প্যালেস আজ নানা বর্ণের আলোকমালায় ফুল ও পাতাবাহারে সুশোভিত। সবুজ, নীল, লাল নানা বর্ণ-বৈচিত্র্য আলোর নয়নাভিরাম দৃশ্য।

বহু সুবেশ ও সুবেশা নরনারীর কলকাকলীতে সমগ্র প্রাসাদটি মুখরিত।

দরজার গোড়ায় একজন ভদ্রলোক অভ্যাগতদের অভ্যর্থনার জন্য দাঁড়িয়েছিলেন, আমাদের কক্ষে প্রবেশ করতে দেখে সাদর আহ্বান জানালেন। বললেন, আসুন আসুন।

কিরীটী তার পরিচয় দিতেই সেই ভদ্রলোক বললেন, ওঃ, আপনি মিঃ কিরীটী রায়? কুমারসাহেব ওপরে আছেন,—সোজা ওপরে চলে যান।

সামনে একটা সুপ্রশস্ত মার্বেল পাথরে বাঁধানো টানা বারান্দা গোছের। ডানদিকে প্রকাণ্ড একটা হলঘর। সেখানে টেবিল চেয়ার পেতে আধুনিক কেতায় অতিথি-অভ্যাগতদের খাবার বন্দোবস্ত করা হয়েছে। সেই হলঘরের বাঁ দিকে একটা ছোট ঘর, কয়েকখানি সোফা পাতা, সাত-আটজন ভদ্রলাক খোসগল্পে মগ্ন।

ঘরে ঘরে অত্যুজ্জ্বল বৈদ্যুতিক আলো। বারান্দার এক পাশ দিয়ে দোতলায় ওঠবার সিঁড়ি, সেটাও মার্বেল পাথরে তৈরী। ভদ্রলোকের নির্দেশমত আমরা সিঁড়ি দিয়ে দ্বিতলের দিকে অগ্রসর হলাম।

দ্বিতলে উঠে কিরীটী সঙ্গের সেই দুজন ভদ্রলোককে যেন নিম্নকণ্ঠে কি বললে, তারা সঙ্গে সঙ্গে নীচে চলে গেল। আমরা অতঃপর দোতলায় উঠেই সামনে যে প্রকাণ্ড হলঘর, সেই হলঘরের মধ্যে গিয়ে প্রবেশ করলাম। প্রচুর সাজসজ্জায় ও আলোকমালায় যেন ইন্দ্রপুরীর মতই মন হচ্ছিল ঘরটাকে।

ঘরের মেঝেত দামী পুরু লাল রংয়ের কাশ্মীরী কার্পেট বিছানো। হলঘরের সংলগ্ন একটা নাতি-প্রশস্ত ঘর দেখা যায়। হলঘরের সঙ্গে যোগাযোগ করে পর পর পাশাপাশি দুটি দরজায় দামী সবুজ রঙের পর্দা ঝুলছে ; এবং পর্দা ভেদ করে সেই ঘর থেকে আনন্দ-কলরব কানে ভেসে আসে মাঝে মাঝে।

হলঘরের মধ্যে ছোট ছোট সব গোলাকার টেবিল পেতে তার চারপাশে চেয়ার রাখা হয়েছে। ভদ্রলোকেরা সেই চেয়ারে বসে চা ও সরবৎ সহযোগে খোসগল্পে মত্ত।

একজন ভদ্রলোককে দেখে কুমারসাহেবের খোঁজ নিতেই, কুমারসাহেব ঐ সামনের ঘরে আছেন বলে ভদ্রলোকটি দুই-দরজাওয়ালা ঘরটি আমাদের দেখিয়ে দিলেন। আমরা এগিয়ে গেলাম।

ঘরের ঠিক নীচে দিয়েই ট্রাম-রাস্তা চলে গেছে। ট্রাম-রাস্তার দিকে মুখ করে ঘরে প্রায় পাঁচ-ছটি জানলা, প্রত্যেকটিতে দামী নেটের বাহারে পর্দা টাঙানো। ঘরের বাঁ দিকে কতকগুলো দেওয়াল-আলমারির মত আছে। তাতেও পর্দা ঝুলানো। বোধ হয় সেগুলিতে জিনিসপত্র রাখা হয়। ঘরের ডান দিকের দেওয়ালটা ঘরের ছাদ থেকে ডিমের মত ঢালু হয়ে যেন মেঝেতে নেমে এসেছে ; মাঝখানে একটা দরজা। ঘরের মধ্যে সোফা ও চেয়ারে বসে কয়েকটি ভদ্রলোক গল্প করছেন। কুমারসাহেব সেখানে নেই।

মাঝে মাঝে উচ্চহাসির রোল উঠছে।

ঘরের দেওয়ালে দেওয়ালে দামী ফ্রেমের সব সুদৃশ্য ছবি ঝুলছে। ঘরের মাঝখানে একটা টেবিলের চারপাশে বসে চারজন ভদ্রলোক তাস খেলছেন।

ঘরে ঢুকে যেটাকে গা-আলমারি মনে হয়েছিল, হঠাৎ সেই দিকের পর্দার আড়াল থেকে একটা হাসির শব্দ শোনা গেল ; কিরীটী আর আমি দুজনেই চমকে সেদিকে ফিরে তাকালাম।

ঐ যে কুমারসাহেবের গলা, চল, পর্দার ওধারে বসে আছেন বোধ হয়!

কিরীটী আমার হাত ধরে মৃদু আকর্ষণ করল।

দুজনে পর্দার দিকে এগিয়ে গেলাম।

কিরীটীর অনুমানই ঠিক। গা আলমারি না হলেও অনেকটা গা-আলমারি মত খানিকটা জায়গা। সেখানে অর্ধ-চন্দ্রাকৃতি একটা ভেলভেট মোড়া দামী সোফা পাতা। এবং তার সামনে ঐ আকারেরই একটি ছোট টেবিল। টেবিলের ওপর নীল রংয়ের ঘেরা টোপে ঢাকা একটি ক্ষুদ্র টেবিল-ল্যাম্প জ্বলছে। টেবিল-ল্যাম্পের মৃদু নীলাভ আলো সামনে ঝুলন্ত নীল রংয়ের পর্দার সঙ্গে যেন মিশে একাকার হয় গেছে—তাই ওদিক থেকে তেমন বিশেষ কিছু বোঝা যায়নি।

সোফার ওপর সাহেবী বেশ-পরিহিত চোখে কালো কাচের চশমা একজন ভদ্রলোক ও অন্য একজন প্রৌঢ় ভদ্রলোক বসে মৃদুস্বরে গল্প করছিলেন, আমাদের দেখে সাহেবী বেশ-পরিহিত ভদ্রলোকটি উঠে দাঁড়ালেন এবং সসম্ভ্রমে বললেন, হ্যালো মিঃ রায়, গুড ইভনিং! ইনিই বোধ হয় মিঃ সুব্রত রায়? আমার দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করলেন।

কিরীটী নমস্কার করে বলল, হ্যাঁ কুমারসাহেব, ইনিই সুবিখ্যাত মিলিও-নিয়ার সুব্রত রায় আমার বিশিষ্ট বন্ধু ও সহকারী।

কিরীটীর কথায় বুঝলাম বক্তাই কুমারসাহেব।

কুমারসাহেবের দিকে ভাল করে চেয়ে দেখলাম। নীতি-দীর্ঘ সবল দেহাবয়ব ; মাথায় লম্বা কাঁচা-পাকা চুল, মাঝখানে সিঁথি কাটা, পরিধানে দামী সার্জের সুট, চোখে একজোড়া রঙিন কাচের চশমা। তাছাড়া মুখের ভাব অত্যন্ত শান্তশিষ্ট প্রকৃতির।

এই সময় দ্বিতীয় প্রৌঢ় ভদ্রলোকটি বিদায় নিয়ে চলে গেলেন। আমরা তিনজনে সোফার ওপর কুমারসাহেবের নির্দেশক্রমে উপবেশন করলাম।

ইনিই আমাদের কুমারসাহেব দীপেন্দ্রনারায়ণ, সুব্রত। কিরীটী বললে আমার দিকে এবারে তাকিয়ে।

একজন বেয়ারা ট্রেতে করে কাপ-ভর্তি ধূমায়িত চা ও প্লেটে করে কিছু প্লাম-কেক দিয়ে গেল। ট্রের ওপর হতে একটা ধূমায়িত চায়ের কাপ তুলে নিয়ে কাপে মৃদু চুমুক দিতে দিতে কিরীটী বলল, জানিস, ভারী বৈচিত্র্যপূর্ণ এঁর জীবন-কথা সুব্রত!

এমন সময় দামী সুট-পরা একজন বৃদ্ধ গোছের ভদ্রলোক পর্দা তুলে এসে সেখানে প্রবেশ করলেন।

হ্যালো ডাঃ চট্টরাজ! কলকাতায় কবে ফিরলেন? কিরীটী সোল্লাসে বলে উঠল।

এই তো কদিন হল। তারপর রায়, তোমার সংবাদ কী বল? ডাঃ চট্টরাজ কিরীটীর দিকে চেয়ে প্রশ্ন করলেন এবং সহাস্যমুখে বললেন, দাও হে রহস্যভেদী, একটা বর্মা সিগার দাও তোমার। অনেক দিন খাই না। খেয়ে দেখি!

কিরীটী মৃদু হেসে তার পকেট থেকে সুদৃশ্য হাতীর দাঁতের সিগার কেসটা বের করে ডাক্তারকে একটা সিগার দিল।

কুমারসাহব বললেন, মিঃ রায়, আপনারা ততক্ষণ আলাপ করুন, আমি ওদিকটা একটু দেখে আসি।

কুমারসাহেব চলে গেলেন।

তারপর ডাক্তার, আপনি এক সময় স্যার দিগেন্দ্রর চিকিৎসা করেছিলেন, না? কিরীটী প্রশ্ন করলে ডাঃ চট্টরাজের মুখের দিকে সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে তাকিয়ে।

হ্যাঁ, সে প্রায় বছর তিন সাড়ে তিন আগেকার কথা। কিন্তু তাহলেও তাঁর সম্পর্কে সব কিছুই আমার আজও বেশ স্পষ্ট মনে আছে।

একটা কথা আপনাকে আজ জিজ্ঞাসা করব ডাঃ চট্টরাজ?

বলুন!

আচ্ছা, স্যার দিগেন্দ্রর কি সত্যিসত্যিই মাথার কোন গোলমাল হয়েছিল বলে আপনার মন হয়?

ডাঃ চট্টরাজ যেন অল্পক্ষণ কি একটু ভাবলেন, তারপর মৃদুস্বরে বললেন, দেখুন আমার যতদূর মনে হয়, ভদ্রলোকের Hyperoes-thisia ছিল। তাঁর মধ্যে প্রায়ই একটা খুনোখুনি করবার যে tendency জেগে উঠেছিল তাতে ও ধরনের ব্যাপারকে Lust Murder বলা যায়, অর্থাৎ যাকে সহজ ভাষায় খুন করবার একটা ইচ্ছা বলা চলে এবং স্যার দিগেন্দ্রর মত ঠিক ঐ ধরনের 'কেস' আমার ডাক্তারী-জীবনে চোখে বড় একটা পড়েনি। ডাক্তারী শাস্ত্র ও নানা প্রকারের নজির থেকে বলা যায়, এধরনের মনের বিকৃতি যাদের হয় তারা প্রিয়জনের বড় একটা ক্ষতি করে না। অথচ আশ্চর্য, স্যার দিগেন্দ্র তাঁর অতি প্রিয় ভাইপোকেই শেষটায় খুন করতে গিয়েছিলেন। ভাগ্যে বেচারা চিৎকার করে লোকজন জড়ো করে; তা ছাড়া কুমারসাহেবের গায়েও অসীম ক্ষমতা ছিল। ভদ্রলোককে অমন হাবাগবা বোকাটে ধরনের দেখতে হলে হবে কি, গায়ে শুনেছি নাকি অসুরের মতই ক্ষমতা রাখেন।

ডাক্তার আবার বলতে লাগলেন, আমি তখন স্বাস্থ্য উদ্ধারের জন্য পুরী বেড়াতে গেছি, সেই সময় হঠাৎ একদিন সকালে কুমারসাহেবের বাড়ি থেকে call পেয়ে স্যার দিগেন্দ্রকে দেখতে যাই। সেও আজ বছর কয়েক আগেকার কথা। সকালবেলা রোগী দেখতে গেলাম, পুরীতে সমুদ্রের ধারেই ওঁদের সুন্দর একখানা বাংলো প্যাটার্নের বাড়ি আছে। স্যার দিগেন্দ্র তখন বারান্দায় একটা ডেকচেয়ারে বসে শেক্‌স্‌পীয়র পড়ছিলেন; কুমারসাহেবও তাঁর কাকার পাশেই বসেছিলেন, আলাপ পরিচয় হবার পর স্যার দিগেন্দ্র আমার দিকে চেয়ে হাসতে হাসতে বললেন, দীপু আমার জন্য বড্ড ব্যস্ত হয়ে পড়েছে ডাক্তার চট্টরাজ।

আমি হাসতে হাসতে বললাম, কেন?

স্যার দিগেন্দ্র জবাবে বললেন, ওর ধারণা আমার কিছুদিন থেকে রাত্রে ভাল ঘুম হচ্ছে না বলে শীঘ্রই নাকি অসুস্থ হয়ে পড়ব।

বলতে গেলে অতঃপর কুমারসাহেবের বিশেষ অনুরোধেই স্যার দিগেন্দ্রকে আমি পরীক্ষা করি এবং আশ্চর্য আমি স্যার দিগেন্দ্রকে খুব ভাল ভাবেই পরীক্ষা তো করলামই এবং অনেকক্ষণ ধরে সে রাত্রে তাঁর সঙ্গে কথাবার্তাও বললাম, দেখলাম মাথার কোন গোলমাল নেই, চিন্তাশক্তিও স্বাভাবিক শান্ত ও ধীর; মস্তিষ্কের কোন রোগের লক্ষণই পাওয়া গেল না। তবে পূর্বপুরুষদের ইতিহাস জানতে গিয়ে একটা জিনিস পাওয়া গেল।

কী? কিরীটী সাগ্রহে প্রশ্ন করল।

ডাক্তার বলতে লাগলেন, ওদের ফ্যামিলিতে নাকি কবে কোন্ এক পূর্বপুরুষের 'এপিলেপ্‌সি' (অনেকটা ফিটের মত ব্যারাম) ছিল। যাহোক স্যার দিগেন্দ্রকে পরীক্ষা করে দেখলাম, দেহ তার বেশ সুস্থ ও সবল এবং রোগের কোন লক্ষণমাত্রও নেই। তবে চোখের দৃষ্টি-শক্তি একটু কম ছিল। সম্ভবত অতিরিক্ত পড়াশুনার জন্যই সেটা হয়ে থাকবে। লোকটি উঁচু, লম্বা, বলিষ্ঠ গঠন। চোখের তারা দুটো অন্তর্ভেদী ও স্থিরপ্রতিজ্ঞ। ভদ্রলোক বহু ভাষায় সুপণ্ডিত। কথায় কথায় একসময় স্যার দিগেন্দ্র বললেন, বিকেলের দিকে সমুদ্রের ধারে একটিবার আসবেন ডাক্তার, আপনাকে আরও গোটাকতক কথা বলব।

জবাবে বললাম, বেশ তো। এবং কথামত বিকেলের দিকে সমুদ্রের ধারে স্যার দিগেন্দ্রর সঙ্গে দেখা হল। খানিকটা ঘুরে বেড়াবার পরই সন্ধ্যা হয়ে এল। সমুদ্রের ধারে একটু অপেক্ষাকৃত নির্জন স্থান দেখে নিয়ে বালুবেলার ওপরেই দুজনে পাশাপাশি বসলাম। নানা ধরনের গল্প করতে করতে সহসা এক সময় স্যার দিগেন্দ্র আমার মুখের দিকে তাকিয়ে মৃদুস্বরে বললেন, দেখুন ডাক্তার, দীপু যাই বলুক না কেন, আমার নিজের ব্যাপারটা আমি নিজেই আপনাকে বুঝিয়ে বলছি, শুনুন।

শান্ত গম্ভীর কণ্ঠে স্যার দিগেন্দ্র বলতে লাগলেন, সত্যি বলতে কি, আমার মনে সত্যি সত্যি কোন abnormal idea বা instinct বা কোন কুৎসিত ভয়ঙ্কর গোপন ইচ্ছা লুকিয়ে আছে কিনা আমি নিজেই তা জানি না বা আজ পর্যন্ত ঘুণাক্ষরেও কোনদিন টেরও পাইনি। আর এও আমি মনে করি না, যদি বা অমন কুৎসিত ভয়ঙ্কর কোন গোপন ইচ্ছা আমার মনের কোথাও থাকেই, সেটা আমার পুরুষানুক্রমে পাওয়া। আমার নিজের যতদূর মনে হয়, ছেলেবেলা হতেই অদ্ভুত অদ্ভুত সব বই পড়ে পড়ে ও-রকম একটা কুৎসিত ভয়ঙ্কর ইচ্ছা আমার মনে মাঝে মাঝে আমার চিন্তাশক্তির অজ্ঞাতে আমাকে আচ্ছন্ন করে ফেলে। মানুষকে যেমন ভুতে পায় এও অনেকটা তেমনি। এটা আমার অবচেতন মনের একটা ক্ষণিক পাগলামিও বলতে পারেন ; কিংবা দুর্বলতাও বলতে পারেন।

একটু থেমে আবার স্যার দিগেন্দ্র বলতে শুরু করলেন, ডাক্তার, শিশু বয়স থেকেই আমি চিরদিন অনুভব করেছি, আমার মনের চিন্তাশক্তি যেন একটু বেশী প্রখর। সেটাকে অবিশ্যি সাধারণ অকালপক্কতাও বলতে পারেন। যে বয়সে যা ভাবা উচিত নয় চিরদিন আমি সেই সব ভেবেছি। অদ্ভুত ছিল আমার মনের ভাবনাগুলি। অন্য সকলের কাছে যেটা মনে হবে অসংবদ্ধ অসম্ভব এলামেলো অর্থহীন, আমার কাছে সেগুলো ছিল একান্ত স্পষ্ট ও সত্য। যাহোক, কেন জানি না, ছোটবেলা হতেই মধ্যযুগের শক্তিমান ইংরেজ লেখকদের লেখা সব বই পড়তে আমার বড় ভাল লাগত। বিশেষ করে যেসব লেখকদের লেখা একটু বেশী রকম কল্পনাময়, সেইগুলিই আমি বেশি পড়তাম। যেমন ধরুন 'বডিলেয়ার' 'ডিকুইনসি' 'পোয়ে' ইত্যাদি। এদের বইগুলো পড়তে পড়তে আমার কি মনে হত জানেন? যেন একটা অদৃশ্য দুর্নিবার অদ্ভুত ইচ্ছা আমার সমগ্র চিন্তা ও মনের ভিতরকার ভাল-মন্দের বোধশক্তিকে ঘুম পাড়িয়ে ফেলছে ধীরে ধীরে, যেমন করে সাপুড়ের হস্তচালনায় সাপ হয়ে পড়ে মন্ত্রমুগ্ধ! বিশেষ করে, রাত্রের ঘন অন্ধকারে যেন একটা অদম্য রক্ত দেখবার লালসা ভূতের মতই আমায় তাড়া করে ফিরছে। সেই অদ্ভুত তাড়নায় কতদিন আমি পাগলের মতই হয়ে উঠেছি। রক্ত! রক্ত চাই! টাট্‌কা, তাজা, লাল টকটকে রক্ত, তা সে মানুষেরই হোক বা পশু-পক্ষীরই হোক—রক্ত! রক্ত চাই! মনে হয়েছে রক্তের জন্য আমার সমগ্র দেহ ও

মন যেন মরুভূমির মতই তৃষ্ণাকাতর হয়ে উঠেছে। আমি যেন কতকালের তৃষ্ণার্ত বুভুক্ষিত উপবাসী।

ডাঃ চট্টরাজ বলতে লাগলেন, আমরা সেই অন্ধকার সাগরকিনারে বালুবেলার ওপরে বসে, কেউ কোথাও নেই ; শুধু মাথার ওপরে কালো আকাশপটে অগণিত তারা মিটিমিটি জ্বলছে আর নিভছে। অদূরে উচ্ছ্বসিত সাগর-তরঙ্গ সেই ম্লান নক্ষত্রালোকে যেন কোন এক ক্ষুধার্ত হিংস্র ভয়ঙ্কর পশুর ধারালো দাঁতের মত মনে হয়। একটা অশরীরী ভয়ে যেন সহসা বুকের মধ্যে শির শির করে ওঠে।

দুই হাতে হাঁটুটা জড়িয়ে স্যার দিগেন্দ্র বসে। অস্পষ্ট আলো-আঁধারিতে তাঁকে যেন কেমন অশরীরী ভয়াবহ বলে মনে হচ্ছিল। সহসা এক সময় আমার মুখের দিকে তাকিয়ে স্যার দিগেন্দ্র কেমন যেন একপ্রকার কুৎসিত বীভৎস হাসি হাসলেন। অন্ধকারেও তাঁর চোখের তারা দুটো ঝক্‌ঝক্ করে জ্বলছিল। ভদ্রলোকের গায়ের রং ছিল অস্বাভাবিক রকম ফরসা। মুখে ফ্রেঞ্চকাট দাড়ি।

স্যার দিগেন্দ্র আবার বলতে লাগলেন, ডাক্তার, আপনার কাছে আমি গোপন করব না। খুন আমি অনেকগুলো করেছি, এবং প্রায় করি। রাত্রের নিঃশব্দ অন্ধকারের সঙ্গে সঙ্গে আমার শিক্ষা, সংযম, সভ্যতা, কৃষ্টি সব কিছু নিঃশেষে লোপ পায়। আমি যেন পাগল হয়েই রক্ত-তৃষ্ণায় ক্ষুধিত হায়েনার মত ছুটে বেড়াই। ডাক্তার, ডাক্তার, তুমি পালাও, আমার কাছ থেকে শীঘ্র পালাও। Get away! Get away from me !

এবং প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই সহসা পাগলের মতই বুকপকেট থেকে একটা ধারালো কালো হাড়ের বাঁটওয়ালা ক্ষুর স্যার দিগেন্দ্র টেনে বের করলেন। অস্পষ্ট আলোয় ক্ষুরের ইস্পাতের ধারালো ফলাটা যেন মৃত্যু-ক্ষুধায় লক্‌লক্ করে উঠল। আমি বিদ্যুৎগতিতে এক লাফে উঠে দাঁড়িয়েই ছুটলাম। সঙ্গে সঙ্গে একটা দুর্দমনীয় অট্টহাসির বেগ সমুদ্রের একটানা গর্জনকে ছাপিয়ে হা হা করে সাগর-কূল সচকিত করে তুলল। উঃ, সে কী হাসি! যেন শরীরের সমস্ত রক্ত জমাট বেঁধে বরফ হয়ে যাবে। সারারাত ঘুমিয়ে দুঃস্বপ্ন দেখলাম। ঐ দিনই গভীর রাত্রে আমার ঘরের দরজায় কার মৃদু করাঘাতে আমার ঘুম ভেঙে গেল। কে যেন অতি মৃদু মিষ্টি কোমল স্বরে দরজার ওপাশ থেকে আমায় ডাকছে—দরজা খোল! দরজা খোল! আমি ভয়ে কাঠ হয়ে মড়ার মত বিছানায় চোখ বুজে পড়ে রইলাম। ঘামে সর্বাঙ্গ আমার ভিজে যেতে লাগল। পরের দিন ভোরেই পুরী থেকে রওনা হয়ে এখানে ফিরে আসি। এরই দু-তিন দিন বাদে শুনলাম, স্যার দিগেন্দ্র ধারালো ক্ষুর দিয়ে নাকি নিজের ভাইপোকেই কাটতে উদ্যত হয়েছিলেন।

ডাঃ চট্টরাজ চুপ করলেন। বড্ড গরম বোধ হচ্ছিল, তাই সামনের পর্দাটা তুলে দিলাম।

হঠাৎ আমার নজরে পড়ল, কুমার দীপেন্দ্র আমাদের দিকেই ধীর পায়ে এগিয়ে আসছেন। চোখের দৃষ্টি ভাবলেশহীন। যেন অনেকটা ঘুমক্লান্ত তন্দ্রাতুর। মাথাটা নীচু করে তিনি এগিয়ে আসছেন।

আমাদের কাছে এসে দাঁড়ালেন।

ঘরের আলো তাঁর মুখের ওপরে প্রতিফলিত হয়েছে। সমগ্র **মুখখানি রক্তশূন্য ফ্যাকাশে,** মনে হয় যেন অত্যন্ত ভীত হয়ে পড়েছেন কোন কারণে।

॥ তিন ॥

বরাবর আমাদর সামনে এসে কুমারসাহেব একটা চেয়ার টেনে নিয়ে বসলেন অত্যন্ত ক্লান্তভাবে।

আমি, কিরীটী ও ডাঃ চট্টরাজ ওঁর মুখের দিকে নিঃশব্দে একদৃষ্টে চেয়ে রইলাম।

হঠাৎ একসময় কঠিন স্তব্ধতা ভঙ্গ করে কুমারসাহেব চাপা উৎকণ্ঠিত স্বরে বললেন, মিঃ রায়, আপনাকে গতকাল ফোনে যা বলেছিলাম সেই রকম ব্যবস্থা করেছেন তো!

কিরীটী ম্লান একটু হেসে বলে, নিশ্চয়ই। কিন্তু আপনাকে বড় উদ্বিগ্ন দেখাচ্ছে কুমারসাহেব। আপনি কি অসুস্থ? বলতে বলতে কিরীটী হাতীর দাঁতের সিগার-কেসটা পকেট থেকে বের করে নিজে একটা তুলে নিয়ে কুমারসাহেবের দিকে খোলা কেসটা এগিয়ে দিল, সিগার প্লিজ!

নো, থ্যাংকস্। বলে কুমারসাহেব নিজের পকেট থেকে বহুমূল্য সুদৃশ্য সোনার ওপর ডায়মণ্ডে নাম লেখা সিগারেট কেসটি বের করে তার থেকে একটি দামি সিগারেট তুলে ধরলেন।

টেবিল-ল্যাম্পের মৃদু নীলাভ আলো কুমারসাহেবের মুখের ওপর ছড়িয়ে পড়েছে। ডান হাতে সিগারেটটি ধরে বাঁ হাত দিয়ে কুমারসাহেব মাঝে মাঝে কপালটা বুলাতে লাগলেন।

সহসা কিরীটীই প্রথম প্রশ্ন করল, আপনার সেই নবনিযুক্ত প্রাইভেট সেক্রেটারী মিঃ শুভঙ্কর মিত্র এখানেই আছেন, না?

কে, শুভঙ্কর? হ্যাঁ। মৃদুস্বরে কুমারসাহেব বলতে লাগলেন, বেচারী বড্ড নার্ভাস হয়ে পড়েছে। অবিশ্যি আমি তাকে দোষ দিই না। এক্ষেত্রে ওরকম না হওয়াটাই আশ্চর্য। আপনারা হয়তো বিশ্বাস করতে চাইবেন না। আজ আবার স্বচক্ষে আমি এই বাড়িতেই কাকাবাবুকে স্পষ্ট দেখেছি। তিন-তিনখানা চিঠি তাঁর কাছ থেকে আমি ডাকে পেয়েছি, আপনি তো সবই জানেন মিঃ রায়, আমাকে তিনি প্রত্যেক চিঠিতেই বারংবার সাবধান করে দিয়েছেন, আমার রক্ত তিনি দেখবেনই! এ নাকি তাঁর জীবন-পণ!

কিরীটী অস্ফুট কণ্ঠে বলে উঠল, ঠিক বোঝা গেল না। কাকে দেখেছেন?

অস্ফুট স্বরে কুমারসাহেব বললেন, যেন মনে হল দিগেন্দ্রনারায়ণ, স্যার দিগেন্দ্রনারায়ণকে! ওই যে, আমার সেক্রেটারী মিঃ মিত্র আমার প্রাইভেট রুমে ঢুকছেন।

আমরা তিনজনেই একসঙ্গে চোখ তুলে সামনের দিকে তাকিয়ে দেখলাম, ডানদিককার দেওয়ালে যে ছোট দরজাটি ছিল, সেটার কপাট দুটো আস্তে আস্তে বন্ধ হয়ে গেল। এবং যে ভদ্রলোক একটু আগে দরজা ঠেলে ঘরে ঢুকল, তার শরীরের পিছন দিকের কালো রঙের কোটের খানিকটা অংশ দেখতে পেলাম। দরজার কপাট দুটো বন্ধ হয়ে গেল।

হাতঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখলাম রাত্রি প্রায় সাড়ে নটা।

সহসা আবার কুমারসাহেবের কণ্ঠস্বর নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করল, মিঃ রায়, আজ সন্ধ্যার দিকে স্বচক্ষে আমি কাকাকে দেখেছি।

আমি বা ডাঃ চট্টরাজ কোন কথা বললাম না। কিরীটী শুধু মৃদুকণ্ঠে প্রশ্ন করল, আপনি ঠিক জানেন কুমারসাহেব, দেখতে ভুল হয়নি তো?

আজ দুপুর থেকেই বাড়িতে আমার জন্মোৎসবের আয়োজন চলছিল। আমি আর আমার

সেক্রেটারী মিঃ মিত্র বৈষয়িক কাগজপত্র নিয়ে ব্যস্ত ছিলাম। দুপুরের পর থেকেই আকাশ মেঘাচ্ছন্ন থাকায় চারিদিক থমথম করছিল, মাঝে মাঝে কড় কড় করে মেঘ ডাকছে, বিদ্যুৎ চমকে উঠছে। কাজ সারতে বোধ করি সন্ধ্যা সাতটা হবে তখন—আমন্ত্রিত ভদ্রলোকেরা সব একে একে এখানে আসতে শুরু করেছেন, মিঃ মিত্রকে নীচে সকলের অভ্যর্থনার জন্য পাঠিয়ে দিয়ে আমি নিজে পোশাক বদলাবার জন্য সাজঘরে গিয়ে ঢুকেছি, বাইরে তখন ঘন অন্ধকার, মাঝে মাঝে মেঘ ডাকছে, বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে।.....সাজঘরের ড্রেসিং টেবিলের ওপরে একটা লাল ঘেরাটোপে ঢাকা টেবিল-ল্যাম্প জ্বলছে। মিঃ রায়, আমি যা বলছি তার একবর্ণও মিথ্যা বা অতিরঞ্জিত নয়, পোশাক পরা হয়ে গেছে ; আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে গলার টাইটা ঠিক করছি, এমন সময় দ্বারে মৃদু করাঘাতের শব্দ শোনা গেল, কুমারসাহেব!

দরজা খুলে দেখি সামনে দাঁড়িয়ে মিঃ মিত্র আর মিঃ কালিদাস শর্মা। মিঃ শর্মা এখানকার এক কলেজের প্রফেসার, কিছুদিন হল তাঁর সঙ্গে আমার বেশ আলাপ হয়েছে। মিঃ শর্মা মিঃ মিত্রের ছোটবেলার বিশেষ বন্ধু। তাঁদের সঙ্গে কথা বলতে বলতে সহসা আমার মনে পড়ল বাথরুমে আমার মুখ ধোয়ার সময় হাতের অনামিকা থেকে হীরের আংটিটা খুলে সাবানের বাক্সের ধারে রেখেছিলাম, আসবার সময় নিয়ে আসতে ভুলে গেছি....

কথা বলতে বলতে ইতিমধ্যে কুমারসাহেবের হাতে সিগারেটটা শেষ হয়ে গিয়েছিল, সেটা তিনি অ্যাসট্রেতে ফেলে দিলেন। পাশের হলঘর থেকে পিয়ানো সহযোগে সুমিষ্ট গানের লহরী ভেসে আসছিল।

কুমারসাহেব আবার বলতে শুরু করলেন, কিন্তু আপনাকে আমি ঠিক বোঝাতে পারব না মিঃ রায়, সে দৃশ্য কী ভয়ানক! ভাবতে গেলে এখনও আমার সর্বাঙ্গ কাঁটা দিয়ে ওঠে, মাঝে মাঝে বিদ্যুতের আলো ঘরের কাচের জানলা দিয়ে হঠাৎ আলোর চমকানি লাগিয়ে যাচ্ছিল। মিঃ মিত্র ও মিঃ শর্মা দুজনে আমার সামনেই ঘরের মধ্যে দাঁড়িয়ে, তাঁদের একটু অপেক্ষা করতে বলে আমি বাথরুমের দিকে অগ্রসর হলাম।

বাথরুমের আলো নেভানো ছিল—অন্ধকার। দরজাটা যেমন আমি খুলেছি, সহসা অন্ধকার বাথরুমটা বাইরের বিদ্যুতের আলোকে ক্ষণিকের জন্য উদ্ভাসিত হয়ে উঠল ; কড়কড় করে মেঘের গর্জন শোনা গেল, হঠাৎ চমকে উঠলাম। বিদ্যুতের আলোয় ঘরের জানালার দিকে চোখ পড়তেই... আমি স্পষ্ট দেখলাম...কাকা! হ্যাঁ, আমার কাকা স্যার দিগেন্দ্র জানালার কাচ দিয়ে রক্তচক্ষুতে চেয়ে দাঁতে দাঁত ঘষছেন। আমি সভয়ে অস্ফুট চিৎকার করে চোখ বুজলাম।

কথা বলতে বলতে অধীর আগ্রহে কুমারসাহেব কিরীটীর হাত দুটো সজোরে চেপে ধরলেন, যেন অত্যন্ত ভীত হয়ে পড়েছেন। চোখেমুখে একটা ব্যাকুল আতঙ্কের চিহ্ন পরিষ্কার হয়ে ফুটে উঠেছে। কপালে এই শীতের রাতেও বিন্দু বিন্দু ঘাম জমেছে, ঘন ঘন নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস পড়ছে।

জানালার ধারে, কুমারসাহেব আবার বলতে লাগলেন, কাকা ছায়ার মত দাঁড়িয়ে ছিলেন মাথাটা একদিকে একটু হেলিয়ে, একটা হাত ঝুলছে। তখনকার তাঁর সেই চোখের দৃষ্টিতে যেন একটা দানবীয় জিঘাংসা ফুটে বের হচ্ছিল।

ডঃ চট্টরাজ আমাদের মুখের দিকে তাকালেন।

কুমারসাহেব নিঝুম হয়ে মাথা নীচু করে বসে আছেন।

সহসা যেন এক সময় কুমারসাহেব কেঁপে উঠলেন।

কিরীটী ধীর স্বরে প্রশ্ন করলে, তারপর?

আমার অস্পুট চিৎকার বোধ হয় পাশের ঘরে মিঃ মিত্র ও মিঃ শর্মার কানে গিয়েছিল, তাঁরা এক প্রকার ছুটেই বাথরুমে এসে প্রবেশ করলেন এবং প্রশ্ন করলেন, ব্যাপার কি কুমারবাহাদুর?

তাড়াতাড়ি তাঁরা সুইচ টিপে বাথরুমের আলোটা জ্বেলে দিলেন ; আশ্চর্য, ঘরে কেউ নেই! একদম খালি, অথচ....

বাথরুমে অন্য কোন দরজা ছিল কী? কিরীটী প্রশ্ন করল।

না। আমি যে দরজা দিয়ে প্রবেশ করেছিলাম সেটা ছাড়া বাথরুমে আর দ্বিতীয় দরজা নেই। যে জানালায় কাকাকে দেখেছিলাম, তারও সার্সি দুটো ঘরের ভিতর থেকে আটকানো ছিল।

ডাঃ চট্টরাজ বললেন, আপনার অবচেতন মনে আপনার কাকা সম্পর্কে যে অতীত দিনের আতঙ্ক সেটাই আপনার মনকে আচ্ছন্ন করে ছিল কুমারসাহেব এবং সেই চিন্তা থেকেই আপনার এ বিভীষিকার সৃষ্টি। এটা আপনার স্বগত কৃত্রিম নিদ্রাচ্ছন্নতা বা ইংরাজীতে যাকে বলে 'self hypnosis'—আপনার স্নানঘরের মধ্যস্থিত আলো ও আয়নার সংমিশ্রিত প্রভাবেই ওটা সৃষ্টি হয়েছিল।

ডাক্তারের কথা শেষ হতে না হতেই কুমারসাহেব বলে উঠলেন, ডাক্তার, আপনাকে আমি আগেই বলেছি, আমি যা দেখেছি বা শুনেছি সেটা আমার ভ্রান্ত ধারণা বা মতিভ্রম, যাকে আপনারা ইংরাজীতে hallucination বলেন, সে রকম কোন কিছুই নয়, আমি কাকাকে স্পষ্ট দেখেছি। সত্যিই তাঁকে দেখেছি কিন্তু তারপর কিন্তু আর সেখানে উপস্থিত ছিলেন না ; অদৃশ্য হয়ে যান। আমার সেক্রেটারী ও মিঃ শর্মা চারিদিকে আশেপাশে তন্ন তন্ন করে খুঁজে দেখলেন, কিন্তু কিছুই দেখতে পেলেন না। অবিশ্যি তাঁদের আমি তখন বলেছিলাম, ব্যাপারটা আগাগোড়াই হয়তো আমার চোখের ভুলও হতে পারে। কেননা এ ব্যাপারে তাঁদের আমি, বিশেষ করে আজকের উৎসবের দিনে, চিন্তিত করতে চাইনি। কিন্তু আমি ভগবানের নামে শপথ করে বলতে পারি মিঃ রায়, আমার ভুল হয়নি। আমি তাঁকে দেখেছি, সুস্পষ্ট ভাবেই প্রত্যক্ষ দেখেছি।

কিরীটী বললে, ভাল কথা, আচ্ছা ডাঃ চট্টরাজ, আপনাদের ডাক্তারী শাস্ত্রের মনোবিজ্ঞানে এ ধরনের ব্যাপারকে কি বলে?

ডাঃ চট্টরাজ প্রবলভাবে মাথা দোলাতে দোলাতে বললেন, কুমারসাহেব হয় আমাদের আষাঢ়ে গল্প শোনাচ্ছেন, না হয় তামাসা করছেন নিছক আনন্দ দেবার জন্য। কিন্তু সে যাই হোক, এ ধরনের তামাসা.....না, উনি একেবারে অসম্ভব কথা বলছেন।

ঘরের আলোয় কুমারসাহেবের মুখের দিকে তাকিয়ে মনে হচ্ছিল, যেন তিনি অত্যন্ত ক্লান্ত ও ভীত হয়ে পড়েছেন।

ধীরে ধীরে এক সময় কুমারসাহেব বললেন, দেখুন ডাঃ চট্টরাজ, বিশেষ করে এ ব্যাপারে আপনাদের চাইতেও আমি বেশী বুঝি। একদিন আমি আমার কাকাকে কতখানি শ্রদ্ধা করতাম ও ভালবাসতাম সে কথা কারও অজানা নেই ; কাকার এই দুর্ঘটনার জন্য হয়তো জগতে আমার চাইতে আর কেউ বেশী দুঃখ পায়নি ; শিশু বয়সে মা-বাবাকে হারাই,

তারপর বারো বছর পর্যন্ত ঐ কাকার কাছেই আমি একাধারে মা ও বাবার স্নেহ-ভালবাসা পেয়ে এসেছি। কাকা যে আমার কতখানি ছিলেন তা বুঝিয়ে আপনাদের বলতে পারব না। কিন্তু এখন তাঁকেই আমি পৃথিবীতে সব চাইতে বেশী ভয় ও ঘৃণা করি। আমার সুখ শান্তি সব গেছে। রাতের পর রাত আমি নিদ্রাহীন চক্ষে নিদারুণ ভয়ে বিছানার ওপরেই বসে কাটিয়েছি।

এমন সময় সুশ্রী দোহারা পাতলা চেহারার ডিপ ব্লু রঙের সুট-পরা একজন ভদ্রলোক আমাদের সামনে এসে দাঁড়ালেন। মুহূর্তে যেন কুমারসাহেব আপনাকে সামলে নিলেন এবং ভদ্রলোকটির দিকে তাকিয়ে সহাস্য মুখে বললেন, আসুন মিঃ শর্মা, এঁদের সঙ্গে বোধ হয় আপনার পরিচয় নেই, ইনি মিঃ কালিদাস শর্মা,—সিটি কলেজের প্রফেসার। আর ইনি মিঃ কিরীটী রায়— বিখ্যাত রহস্যভেদী, ইনি মিলিওনিয়ার মিঃ সুব্রত রায়—ওঁর বিশেষ বন্ধু... আর ইনি ডাঃ চট্টরাজ, বিখ্যাত নিউরলজিস্ট (মনাবিজ্ঞান বিশারদ)।

আমরা প্রত্যেককে নমস্কার ও প্রতিনমস্কার করলাম।

এতক্ষণ বরাবরই আমি বিশেষ ভাবে লক্ষ্য করছিলাম, ওদিককার যে দরজা দিয়ে অল্প আগে মিঃ মিত্র গিয়ে ঢুকেছেন কুমারসাহেবের প্রাইভেট রুমে, সেইদিকেই কিরীটী যেন সর্বক্ষণ তাকিয়েছিল এবং সেদিক থেকে দৃষ্টি না সরিয়েই একসময় মৃদুকণ্ঠে বলল, আচ্ছা কুমারসাহেব, আপনি স্যার দিগেন্দ্রকে ঠিক চিনলেন কি করে? এক বছরে কি তাঁর দেহের কোন পরিবর্তনই হয়নি?

কি জানি তা বলতে পারি না ঠিক। কুমারসাহেব বললেন, ক্ষণিক আলোয় তাঁকে দেখেছি, তবে...

আঃ, থামুন কুমারসাহেব! মিঃ শর্মা বাধা দিলেন, ঐ সব আজগুবী ব্যাপার নিয়ে এখনও আপনি মাথা ঘামাচ্ছেন? আশ্চর্য, আপনার মত একজন শিক্ষিত আধুনিকের পক্ষে...উঠুন, মিঃ মিত্র কফির অর্ডার দিয়ে অনেকক্ষণ হল আপনার প্রাইভেট রুমে গিয়ে হয়তো অপেক্ষা করছেন...একটু আগেই তিনি আপনার খোঁজে এদিকেই আসছিলেন। কি একখানা আপনার বিশেষ জরুরী চিঠি এসেছে, আপনাকে সেখানা এখুনি নাকি দেখানো দরকার। একজন বেয়ারাকে আমার সামনেই বলে গেলেন আপনাকে সেখানে পাঠিয়ে দেবার জন্য। বেয়ারা কি আপনাকে কোন খবর দেয়নি?

কই, না! কুমারসাহেব ত্রস্তে উঠে দাঁড়ালেন, আশ্চর্য, আমি নিজেই যে তাঁকে অনেকক্ষণ আগে আমার প্রাইভেট রুমে ঢুকতে দেখলাম। ভাবলাম হয়তো কোন বিশেষ জরুরী কাজে ওঘরে গেছেন তিনি!...ক্ষমা করবেন, আমি এখুনি আসছি। বলতে বলতে কুমারসাহেব চেয়ার ছেড়ে উঠে পড়লেন।

অ্যাসট্রেতে কুমারসাহেবের অর্ধদগ্ধ যে সিগারেটটি পড়েছিল, দেখলাম কিরীটী সেটা নিঃশব্দে হাত দিয়ে তুলে পকেটের মধ্যে রেখে দিল। কিরীটীর ব্যাপারটা ভাবছি, এমন সময় ঘরের মধ্যে একটা তীক্ষ্ণ চিৎকার শোনা গেল, খুন! খুন!

চমকে আমরা সকলে একসঙ্গে সামনের দিকে চোখ তুলে তাকালাম। কুমারসাহেব তখনও ঘরের অর্ধেকটা গেছেন কিনা সন্দেহ, অদূরে দাঁড়িয়ে মিঃ শর্মা, একজন সাদা উর্দিপরা বেয়ারা, হাতে কফির ট্রে—সে-ই কুমারসাহেবের সামনে দাঁড়িয়ে চিৎকার করছে।

ঘরের সকলে যেন সহসা সামনে ভূত দেখে চমকে থ হয়ে দাঁড়িয়ে গেছে।

সকলের চোখেই উৎসুক ভয়ব্যাকুল দৃষ্টি।

কিরীটী ধীরে ধীরে ঘরের মাঝখানে নিঃশব্দ পদসঞ্চারে এগিয়ে গেল। তার চোখের দৃষ্টি তীক্ষ্ণ ও অনুসন্ধানী হয়ে উঠেছে। ধীরে ধীরে সে বেয়ারা ও কুমারসাহেবের সামনে গিয়ে দাঁড়াল।

শুনন, আপনারা এখন গোলমাল করবেন না। এটা উৎসব-বাড়ি। আসুন কুমারসাহেব, আমার সঙ্গে আপনার প্রাইভেট ঘরে চলুন। এই বেয়ারা, তুমভি আও। এস সুব্রত, তুমিও এস। আর ডাঃ চট্টরাজ, আপনি ততক্ষণ লালবাজারে একটা আর বেহালা থানাতে একটা করে ফোন করে দিন।

আমরা তিনজনে দরজা ঠেলে ঘরে গিয়ে ঢুকলাম। বেশ প্রশস্ত চতুষ্কোণ একটা ঘর। ঘরে ঢুকে আড়াআড়ি ভাবে চাইলেই দেখা যায়, ঘরের চারপাশে গদি-মোড়া সব চেয়ার পাতা। সিলিংয়ের বাতিটা নেভানো। অদূরে একটা টেবিলের ওপরে রক্ষিত লাল রংয়ের টেবিলল্যাম্পের আলোয় ঘরখানি আলোকিত। টেবিলটার ঠিক পাশেই একটা বড় সোফা। ঘরের দেওয়ালে ফিকে গোলাপী রং দেওয়া, এবং দেওয়ালের গায়ে এঁদের পুরুষানুক্রমে প্রাপ্ত সব অতীত যুগের ঢাল তলোয়ার ঝুলছে। ঘরের লাল আলো সেগুলোর ওপর প্রতিফলিত হয়ে যেন কেমন এক বিভীষিকায় প্রেতায়িত হয়ে উঠেছে।

ঘরের মেঝেয় দামী পুরু লাল রংয়ের কার্পেট বিছানো। হঠাৎ টেবিলের ওপরে যে ল্যাম্পটি বসানো ছিল তার আলোয় সামনে নজর পড়তেই বিস্ময়ে আতঙ্কে যেন একেবারে স্তম্ভিত হয়ে গেলাম।

একজন কালো সুট পরা লোক উপুড় হয়ে কার্পেটের ওপর টেবিলের ঠিক সামনে পড়ে আছেন। তাঁর হাতের আঙুলগুলো যেন ছড়িয়ে দিতে চাচ্ছিলেন, মনে হয় যেন হাতের পাতায় দেহের ভর দিয়ে ওঠবার চেষ্টা করেছিলেন। হাঁটু মোড়া অবস্থায় তিনি পড়ে আছেন। কিন্তু ভদ্রলোকের দেহের সঙ্গে মাথাটি নেই। রক্তাক্ত গর্দানটা শুধু ভয়ঙ্কর বিভীষিকায় উঁচু হয়ে আছে। মাথাটা ঘরের ঠিক মাঝখানে কার্পেটের ওপরে দাঁড়িয়ে আছে কাটা গলার ওপরেই। কে যেন মাথাটাকে দেহ থেকে কেটে বসিয়ে রেখে গেছে মেঝের কার্পেটের ওপর। চোখের মণি দুটো সাদা, মুখটা হাঁ করা। সহসা পাশের খোলা জানালা দিয়ে এক ঝলকা ঠাণ্ডা বাতাস ঘরে ঢুকল। আমরা কেঁপে উঠলাম।

॥ চার ॥

কিরীটী কুমারসাহেবের রক্তশূন্য ফ্যাকাশে মুখের দিকে চেয়ে বললে, এ সময় আপনি নিজে এত নার্ভাস হয়ে পড়লে তো চলবে না কুমারসাহেব, বুকে সাহস আনুন।

আর সাহস! কুমারসাহেব ক্লান্ত অবসন্ন স্বরে বললেন, আমার হাত-পা পেটের মধ্যে ঢুকে যাচ্ছে, মিঃ রায়। একি সাংঘাতিক ব্যাপার বলুন তো! উৎসব বাড়ি—

কিরীটী আমার মুখের দিকে তাকিয়ে বললে, সুব্রত তুমি বাইরে গিয়ে ডাঃ চট্টরাজকে সঙ্গে নিয়ে এ বাড়ি থেকে বাইরে যাবার সমস্ত দরজা এখুনি বন্ধ করে দাও। ওপরের কিংবা নীচের হলঘরের কেউ যেন এ ব্যাপারের একটুকুও না টের পায়। তারা গান-বাজনা স্ফূর্তি করছে তাই করুক।

আমি তখনি ঘর থেকে বের হয়ে গেলাম।

সমস্ত বন্দোবস্ত করে ফিরে আসছি, হলঘরে কুমারসাহেবের ম্যানেজার পঞ্চাননবাবুর সঙ্গে দেখা।

তিনিও আমার সঙ্গে সঙ্গে ঘরে এলেন। ম্যানেজারবাবু ঘরে ঢুকে প্রথমেই বেয়ারাটাকে ভাঙা কাচের টুকরোগুলো নিয়ে যেতে বললেন। এ ঘর থেকে ভয় পেয়ে ছুটে বাইরে যাবার সময় চাকরটার হাত থেকে পড়ে ভেঙে ছড়িয়েছিল। চাকরটা আদেশ পালন করে চলে গেল। কয়েক মিনিটের মধ্যেই থানা থেকে পুলিসের লোক এসে উপস্থিত হল। কিরীটী সংবাদ পেয়ে বাইরে গিয়ে তাঁদের যথোপযুক্ত নির্দেশ দিয়ে আবার ঘরে ফিরে এল। তারপর আবার চুপচাপ সকলে ঘরের মধ্যে দাঁড়িয়ে।

কিরীটী এতক্ষণ পরে একটু একটু করে মৃতদেহটার কাছে গিয়ে দাঁড়াল। কাটা মুণ্ডুটার দিকে চেয়ে বুকটার মধ্যে যেন কেমন অস্বস্তি বোধ করছিলাম। দেহের গর্দানের ঠিক কাছেই, মৃতদেহের বাঁ-হাতে একটা তীক্ষ্ণ তরবারি ধরা আছে। তলোয়ারটা দেখতে অনেকটা দেওয়ালে টাঙানো তরবারিগুলোর মতই। মনে হয় যেন দেওয়াল থেকেই একটা নেওয়া হয়েছে, কেননা দেওয়ালের গায়ে এক-একটি ঢালের দুদিকে আড়াআড়ি ভাবে দুটি করে তলোয়ার টাঙানো আছে। দেখলাম কেবল ঠিক টেবিলের সামনে উপিরভাগের দেওয়ালে ঢালের সঙ্গে মাত্র একটি তলোয়ার দেখা যাচ্ছে। মৃতদেহের হাতে ধরা তরবারিটাতে রক্ত মাখা।

উঃ, ভদ্রলোককে কসাইয়ের মত জবাই করা হয়েছে! কিরীটী মৃদুকণ্ঠে বললে, একেবারে পাশবিক হত্যা! দেখ দেখ সু, তরবারিটায় বোধ হয় খুব শীঘ্রই শান দেওয়া হয়েছিল। বলতে বলতে কিরীটী ঘরের একটিমাত্র জানালার দিকে এগিয়ে জানালাটিকে অনেকক্ষণ ধরে পরীক্ষা করে বাইরের দিকে ঝুঁকে দেখেশুনে বললে, প্রায় চল্লিশ ফিট নীচে ট্রাম রাস্তা দেখা যাচ্ছে। এখান থেকে কারও লাফিয়ে নীচে যাওয়া বা প্রবেশ করা সম্পূর্ণ অসম্ভব। কিরীটী কিছুক্ষণ ঘরের মধ্যে হাত দুটো মুষ্টিবদ্ধ করে পায়চারি করতে লাগল, তারপর সহসা এক সময় কার্পেটের রক্ত এড়িয়ে মৃতদেহের কাছে হাঁটু গেড়ে বসে ভাল করে ঝুঁকে কি যেন পরীক্ষা করতে লাগল। এমন সময় ওপাশের দরজাটা খুলে গেল। একটা লোকের মাথা দেখা গেল।

ম্যানেজারবাবু যেন কী বলতে যাচ্ছিলেন, কিরীটী বাধা দিল, **ও আমার লোক**—হরিচরণ। কী খবর হরিচরণ? ঐ পথ দিয়ে কেউ বেরিয়েছে?

আজ্ঞে না।

বেশ। নজর রাখ।

মাথাটা অদৃশ্য হয়ে গেল।

ঐ দরজা দিয়ে এ-ঘর থেকে হলঘরে যাওয়া যায়, না ম্যানেজারবাবু?

আজ্ঞে হ্যাঁ। ম্যানেজারবাবু মৃদুস্বরে জবাব দিলেন। জানালায় একটা লাল রংয়ের সিল্কের পর্দা টাঙানো ছিল, হাওয়ায় সেটা পতপত করে শব্দ করছিল।

আসুন ডাক্তার, মাথাটা একটু পরীক্ষা করা যাক। বলতে বলতে কিরীটী চুলের গোছা ধরে কাটা মুণ্ডুটা তুলে ধরল। তারপরে দুজনে অনেকক্ষণ ঘুরিয়ে ফিরিয়ে সেটা পরীক্ষা করল। এটা এখানেই থাক। বলে আবার মুণ্ডুটা যথাস্থানে নামিয়ে রাখল।

কুমারসাহেব একপাশে ভূতের মত নির্বাক নিঝুম হয়ে দাঁড়িয়ে ছিলেন ; কিরীটী তাঁর দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করল, দেখুন তো কুমারসাহেব, ঐ তরবারিখানা এই ঘরেরই একখানা কিনা?

কুমারসাহেব মৃদু কণ্ঠে জবাব দিলেন, আজ্ঞে হ্যাঁ।

মজার ব্যাপার, কিরীটী বলতে লাগল, এইরকম ধারালো চকচকে তলোয়ারগুলো দিয়ে ঘর সাজিয়ে রেখেছেন—এইভাবে খুনের সাহায্য করতেই নাকি কুমারসাহেব?

জবাবটা দিলেন ম্যানেজারবাবু, আজ্ঞে, উনি একজন উঁচুদরের আর্টিস্ট। পিতামহ ও প্রপিতামহের গৌরবোজ্জ্বল স্মৃতিটা উনি এমনি ভাবে সাজিয়ে বাঁচিয়ে রেখেছেন।

চমৎকার যুক্তি, একেবারে অকাট্য! মৃদুস্বরে কিরীটী শুধু বললে, কিন্তু সে যাক গে, এই হতভাগ্য মৃত ব্যক্তিকে চেনেন আপনি?

আজ্ঞে হ্যাঁ। ইনি আমাদের কুমারসাহেবের নবনিযুক্ত সেক্রেটারি মিঃ শুভঙ্কর মিত্র। ম্যানেজারবাবু জবাব দিলেন।

আজ রাত্রে আপনি এঁকে এই ঘরে ঢুকতে দেখেছিলেন?

আজ্ঞে না, সন্ধ্যার পরে ওঁর সঙ্গে আমার শেষ দেখা হয়েছিল, তারপর আর হয়নি।

কোথায় দেখা হয়েছিল?

আজ্ঞে, আমি তখন নীচে সিঁড়ির ওদিক হলঘরে যাচ্ছিলাম, দেখলাম উনি সিঁড়ির কাছাকাছি অভ্যাগতদের অভ্যর্থনার জন্য অপেক্ষা করছেন।

ওঁর সঙ্গে আর কে কে ছিল?

প্রফেসার কালিদাস শর্মা আর দীনতারণবাবু। দীনতারণবাবু তার একটু পরেই চলে যান।

বেশ, এবারে আপনি দয়া করে বাইরে গিয়ে প্রফেসার কালিদাস শর্মাকে একটু ডেকে আনুন। তিনি কিছু জানেন না, কোন কথা তাঁকে বলবেন না, শুধু বলবেন কুমারসাহেব একটিবার তাঁকে ডাকছেন।

ম্যানেজার ঘর থেকে নিঃশব্দে বের হয়ে গেল।

তারপর ডক্তার, আপনার এ ব্যাপারটাকে কী মনে হয়? কিরীটী প্রশ্ন করল।

ডাঃ চট্টরাজ বললেন, দেখ রায়, এ ধরনের হত্যা করাটা এমন কিছু আশ্চর্য ব্যাপার নয়। এক্ষেত্রে স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে, হত্যাকারীর খুন করবার ইচ্ছা ছিল এবং ধারালো অস্ত্র হাতের কাছে পেয়ে সেই ইচ্ছাই এই ভয়ঙ্কর হত্যায় পরিণত হয়েছে। কে বলতে পারে, হয়তো খুনীর মনে রক্ত দেখবার পিপাসা জেগেছিল! তারপরই এই খুন।

দয়া করে একটু ভেবে দেখুন ডাক্তার, যতদূর সব দেখেশুনে মনে হয়, এক্ষেত্রে খুনটা হঠাৎ একটা ইচ্ছার বশবর্তী হয়ে হয়নি। খুব সাবধানের সঙ্গে এবং আগে থেকে ভেবেচিন্তেই এই খুন করা হয়েছে। চেয়ে দেখুন, মৃতদেহের positionটা দেখেও কি আপনার মনে কোন কিছুই আসছে না?

মৃতদেহ দেখে এইটুকু কেবল বোঝা যায়, খুনের পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্তও হত্যাকারী ও নিহত ব্যক্তির মধ্যে পরস্পরের কোন রকম হাতাহাতি বা ঝটাপটি হয়নি!

নিশ্চয়ই না, মৃতদেহের position থেকে স্পষ্টই মনে হয় পিছন থেকে আচমকা কেউ ওঁকে ধারালো অস্ত্র দিয়ে আঘাত করেছে, যে সময় হয়তো বেচারী কোন কারণে টেবিলটার ওপর ঝুঁকে পড়ে কিছু করতে যাচ্ছিল। তাছাড়া এক্ষেত্রে আর একটা জিনিস বিশেষ করে

লক্ষ্য করবার আছে। টেবিলের ঠিক ওপরে দেওয়ালে ঝুলানো যে ঢাল-তলোয়ার আছে, মেঝে থেকে ওর উচ্চতা প্রায় আট-ন ফিট হবে এবং একথা যদি ধরে নেওয়াই হয় মৃতদেহের হাতে ধরা ঐ ধারালো তলোয়ারটা সামনের ঐ দেওয়ালে টাঙানো ঢালের অন্য পাশ থেকে নামিয়ে নেওয়া হয়েছে, তাহলে নিশ্চয়ই টেবিলের ওপরে উঠে দাঁড়াতে হয়েছিল দেওয়ালে টাঙানো তলোয়ারটা হত্যাকারীকে নামাতে, কেননা অতখানি লম্বা কোন মানুষ হতে পারে না। শুধু তলোয়ারটা নামাতেই নয়, সেই তলোয়ার দিয়ে মিঃ মিত্রকে খুন করতে হলে মিঃ মিত্রকে নিশ্চয়ই সুবোধ শিশুটির মত গলাটা বাড়িয়ে দিতে হয়েছিল। আর তা যদি না হয়ে থাকে, অর্থাৎ মিঃ মিত্রের অজান্তেই যদি তাঁকে খুন করা হয়ে থাকে, তবে বলতে হয় মিঃ মিত্র অন্ধ ও কালা, চোখেও তিনি কোন কিছু দেখতে পাননি, কানেও কোন শব্দ শুনতে পাননি। কিন্তু কুমারসাহেবের মত একজন ধনী গণ্যমান্য লোকের প্রাইভেট সেক্রেটারী যে কালা ছিলেন এ কথাই বা বলা যায় কী করে? বলতে বলতে কিরীটী সহসা কুমারসাহেবের দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করলে, কী কুমারসাহেব, আপনিই বলুন না, আপনার সেক্রেটারী কি সত্যিসত্যিই অন্ধ আর কালা ছিলেন নাকি?

না। মৃদুস্বরে কুমারসাহেব জবাব দিলেন।

যাই হোক, বেচারীর যে গলা কেটে হত্যা করা হয়েছে, এ একেবারে অবধারিত। ডাঃ চট্টরাজ বললেন।

আরো দেখুন, কিরীটী ডাঃ চট্টরাজকে আহ্বান করলেন, এই টেবিলের পাশের সোফাটার দিকে ভাল করে চেয়ে দেখুন। সোফার ওপরে এই বড় বড় বালিশগুলো দেখেছেন? এগুলো তুলে ধরছি দেখুন—এগুলোর গায়ে এখনো একটা লম্বালম্বি সরু চাপের দাগ রয়েছে। একটু ভাল করে পরীক্ষা করলেই বুঝতে কষ্ট হবে না যে এর তলাতেই তলোয়ারটা লুকানো ছিল। খুনী আগে থেকেই সব ঠিকঠাক করে গুছিয়ে রেখেছিল এবং মনে হয় মিঃ মিত্র এ ঘরে ঢুকবার আগেই খুনী এখানে এসে অপেক্ষা করছিল। মনে হয় সে জানত মিঃ মিত্র নিশ্চয়ই এ-ঘরে আসবেন। আর এমন লোক খুন করেছে যে মিঃ মিত্রের বেশ পরিচিত। তাহলে স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে আপনার সন্দেহ অমূলক, স্যার দিগেন্দ্র মিঃ মিত্রের একেবারেই অপরিচিত, তা ছাড়া যে খুনী, তার এ-বাড়ীতে এবং কুমারসাহেবের এই প্রাইভেট রুমে বিশেষ রকম যাতায়াত আছে এবং সে এ ঘরে এলে কেউ তাকে সন্দেহ করবে না—এক কথায় খুনী কোন অপরিচিত তৃতীয় ব্যক্তি নয়। জানাশোনার বা পরিচিতের মধ্যেই কেউ, যার পক্ষে অনায়াসেই, মিঃ মিত্র যখন কোন কারণে দেয়ালের এদিকে মুখ ফিরিয়ে ছিলেন, সেই অবসরে বালিশের তলা থেকে লুকানো তলোয়ারটা টেনে বার করে মিঃ মিত্রের গলাটা এক কোপে দেহ থেকে আলাদা করে ফেলতে এতটুকুও বেগ পেতে হয়নি।

কিন্তু বন্ধু, তুমি একটা কথা ভুলে যাচ্ছ, ডাক্তার বললেন, মৃতদেহের position দেখে মনে হয় না কি যে মিঃ মিত্র যেন কোপটা ঘাড়ে নেবার জন্যে ঝুঁকে প্রস্তুত হয়েই ছিলেন?

হ্যাঁ, সেই তো হচ্ছে কথা, কিরীটী বলতে লাগল, এবং ঐ পয়েন্ট থেকেই ধরতে হবে খুনীকে। খুনী এখনও এই বাড়িতেই আছে। সে এখনো পর্যন্ত এ-বাড়ী ছেড়ে চলে যায় নি, যদি অন্ততঃ আমার সহকারীরা সজাগ থেকে থাকে।

হলঘরে যাবার ঐ দরজাটা খুলে যদি কেউ এ-ঘর থেকে পালিয়ে গিয়ে থাকে ইতিমধ্যেই? আমি প্রশ্ন করলাম।

অসম্ভব। হরিচরণ সাড়ে নটা থেকেই হলঘরে আছে, যদি কেউ গিয়ে থাকতই তার দৃষ্টিকে কোনমতেই ফাঁকি দিতে পারত না। জান কটার সময় আন্দাজ মিঃ মিত্র এই ঘরে এসে ঢুকেছিলেন?

এবারে জবাব দিলাম আমিই, হ্যাঁ, আমার মনে আছে, রাত্রি তখন ঠিক সাড়ে নটা হবে, কেননা তখন আমি আমার হাতঘড়িটায় সময় দেখেছিলাম। কিরীটী এবার নিজের হাতঘড়ির দিকে তাকাল, ঠিক রাত্রি দশটা এখন। ঠিক যে সময় খুন হয়েছিল, অপরাধী সেই সময়টা যে অন্য জায়গায় উপস্থিত ছিল, এ কথাটা প্রমাণ করবার জন্য যদি সব কিছু আগে থেকেই বন্দোবস্ত করে থেকে থাকে, তা হলেও সে এই ফাঁকি দিতে পারত না। কিরীটী একটা সিগার বের করে তাতে অগ্নিসংযোগ করল। একগাল ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে নিম্নস্বরে বলতে লাগল, আশ্চর্য, আমি কিছুই বুঝে উঠতে পারছি না। যতটুকু বুঝতে পারছি, কোন স্থিরমস্তিক বুদ্ধিমান ব্যক্তিই এই কাজ করেছে, কিন্তু মাথাটা দেহ থেকে পৃথক হয়ে মেঝের ঠিক মধ্যিখানেই বা এল কি করে? আর ঐভাবেই বা ঠিক ঘাড়ের ওপর বসে ছিল কি করে?

বাইরের হলঘর থেকে একটা মৃদু গানের সুরের রেশ তখনও ভেসে আসছিল। কিরীটী কুমারসাহেবের দিকে তাকিয়ে বলল, আপনি ও-ঘরে যান কুমারসাহেব, অতিথিরা বেশীক্ষণ আপনাকে না দেখলে একটা গোলমালের সৃষ্টি হতে পারে।

আর গোলমাল! দীর্ঘশ্বাস ফেলে কুমারসাহেব বললেন, আমার মানসম্ভ্রম, ইজ্জত সব গেল মিঃ রায় ; উঃ, কী দুর্দৈব!....ভগবান, এ কি করলে প্রভু!

এমন অধীর হলে তো চলবে না কুমারসাহেব। ডাঃ চট্টরাজ বললেন।

উঃ, কাল সকালে আমি মুখ দেখাব কী করে? কী লজ্জা!...চাপা স্বরে বলতে বলতে কুমারসাহেব ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন।

॥ পাঁচ ॥

কুমারসাহেবের গমনপথের দিকে তাকিয়ে মৃদুকণ্ঠে কিরীটী বললে, আহা বেচারী, বড্ড নার্ভাস হয়ে পড়েছেন!

সত্যি, মাথাটা কী ভাবে মেঝের মাঝখানে এল বল তো রায়? ডাক্তার বলতে লাগলেন, গড়িয়ে এসে তো আর ওভাবে দাঁড়িয়ে থাকতে পারে না!

অনেক সময় অবিশ্যি এর চাইতে বিস্ময়কর ঘটনা ঘটে। কিরীটী জবাব দিল, কিন্তু একটা জিনিস লক্ষ্য করে দেখুন ডাক্তার, মাথাটা যদি গড়িয়েই এই জায়গায় আসত, তাহলে দেহ থেকে মাথাটা যেখানে দাঁড়িয়ে আছে সেই পর্যন্ত একটা রক্তের ধারা থাকত। তা নেই। তাতেই এক্ষেত্রে স্পষ্ট মনে হয়, খুনী নিজেই দেহ থেকে মাথাটা কেটে ফেলবার পর মাথাটা ঐখানে বসিয়ে রেখে গেছে। আমার মনে হয় কি জানেন ডাক্তার?

একটা দানবীয় উল্লাসে এবং নিজের শক্তির ওপর একটা স্থির বিশ্বাসে খুনী মাথাটা এখানে রেখে গেছে—এই কথা বলত চাও তো? জবাব দিলেন ডাক্তার।

সহসা নীচু হয়ে কিরীটী মৃত মিঃ মিত্রের পকেটে হাত ঢুকিয়ে দিয়ে পকেটগুলো পরীক্ষা করতে করতে একটা পকেট থেকে কতকগুলো কাগজপত্র টেনে বের করল এবং সেগুলো টেবিলের ওপরে রাখবার সময় তার মুখে মৃদু একটুকরো হাসি জেগে উঠল। চেয়ে দেখলাম

কাগজপত্রের মধ্যে আছে অনেকগুলো খবরের কাগজের কাটিং, ফটোগ্রাফ, গোটা দুই হলুদ রংয়ের ভাঁজকরা পুরু অনেকটা তুলোট কাগজের মত কাগজ, একটা টর্চ, একটা পেনসিল ও ব্যাঙ্ক নোট এবং কিছু খুচরো টাকা পয়সা। ফটোগুলো দেখতে দেখতে কিরীটী সহাস্যমুখে জবাব দিল, ফটোগুলো দেখছি ভদ্রলোকের নিজেরই। নানা কায়দায় নানা পোজে তোলা ফটো। কিন্তু এত ফটোই বা পকেটে কেন? আর আজকের রাত্রের এই উৎসবের পোশাকের পকেটেই বা এগুলো রাখার তাৎপর্য কী?

এতে তো আশ্চর্য হবার কিছুই নেই রায়! ডাক্তার বললেন, যারা নিজেদের সম্পর্কে অত্যন্ত সচেতন বা এক কথায় সোজা ভাবে বলতে পার দাম্ভিক, তাদের পক্ষে নিজেদের ড্রাম পিটবার—নিজেকে প্রচার করবার এও একটা কাঠি বৈকি ।

না বন্ধু না, ব্যাপারটা অত সামান্য নয়। এর মধ্যে অন্য কোন ব্যাপার আছে। লক্ষ্য করেছেন, এর মধ্যে কিছু হারিয়েছে কিনা? কিরীটী ডাক্তারের দিকে চেয়ে প্রশ্ন করল।

তার মানে? তোমার কোন্ দেশী প্রশ্ন কিরীটী? আমি কি আগে থেকে জানতাম নাকি মিঃ মিত্রের পকেটে কি আছে না আছে। আশ্চর্য! রাগতভাবে ডাক্তার জবাব দিলেন।

হ্যাঁ দেখুন, আমরা জানি ভদ্রলোক এখন পর্যন্ত অবিবাহিত এবং এঁর নিজের ঘর-বাড়িও আছে। সেখানে নিশ্চয়ই চাকরবাকরও আছে—এখানে তো আর উনি দিবা-রাত্রই উপস্থিত থাকেন না! এ কথাও হয়তো বললে নেহাৎ ভুল হবে না যে, ঘরের যাবতীয় চাবিই চাকরবাকরের হাতে দিয়ে তিনি আসেন না। অন্ততঃ দু-চারটে প্রাইভেট ঘরের চাবিও ওঁর পকেটে থাকা উচিত, যা হয়তো চাকরবাকরের হাতে বিশ্বাস করে রেখে আসা চলে না। কিন্তু এক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে, মিঃ মিত্রের পকেটে সে ধরনের কোন চাবিই পাওয়া যাচ্ছে না। এঁর পকেট থেকে কিছু হারিয়েছে কিনা বলতে আমি ঐ চাবির কথাই বলতে চাইছিলাম ডাক্তার!

তারপর সহসা কিরীটী আমার দিকে ফিরে তাকিয়ে মৃদুস্বরে বললে, সুব্রত, অনুসন্ধানের ব্যাপারটা একটু চোখ মেলে সম্পন্ন করলেই অনেক কিছু গোলমাল চোখে পড়ে। একটা অনুসন্ধানের কাজে হাত দিলে সর্বদা চিন্তা করবে, কি থাকা উচিত ছিল, অথচ তা নেই বা পাওয়া যাচ্ছে না! এক্ষেত্রে আমার চাবির কথাটাই মনে হচ্ছে, সেটাই যেন চুরি গেছে। চাবি চুরি যাওয়াটা খুবই আশ্চর্যজনক। কিন্তু তার চাইতেও আশ্চর্যজনক অথচ সহজ একটা জিনিস হারিয়েছে বা পাওয়া যাচ্ছে না, এখুনি তোমাদের সেটা দেখাব। অথচ তোমরা দুজনেই অর্থাৎ ডাঃ চট্টরাজ ও তুমি অসাবধানতাবশতঃ লক্ষ্য করোনি, যা প্রত্যেক মানুষেরই পক্ষে, যাদের সামান্য একটু বুদ্ধি আছে এবং যারা সেটা খাটাবার চেষ্টা করে, এ ঘরে ঢোকামাত্রই লক্ষ্য করা উচিত ছিল এমন একটা জিনিস পাওয়া যাচ্ছে না!

হত্যাকারীর সম্পর্কে কোন সূত্র কি? আমি প্রশ্ন করলাম।

হ্যাঁ, হত্যাকারী নিজে।

এমন সময় ক্যাঁচ করে দরজা খোলার একটা মৃদু শব্দে আমরা সকলে চমকে চোখ তুলে তাকালাম। এ ঘরের সঙ্গে হলঘরের যোগাযোগ করে যে দরজাটি, তার ফাঁক দিয়ে সাধারণ পোশাক পরা একজন লোকের মুখ ও দেহের অর্ধেকটা প্রবেশ করিয়ে দিয়েছে এবং তাকে একপ্রকার এক পাশে ঠেলেই একটি যুবক ঘরে এসে প্রবেশ করল।

চোখের উদ্বিগ্ন দৃষ্টি দেখলেই মনে হয় যুবক ভয়ানক ভীত হয়ে পড়েছে। যুবক ঘরে

ঢুকেই থপ করে একটা গদিআঁটা চেয়ারে বসে পড়ল, এসব ব্যাপার কী? বাড়ি যাওয়ার জন্য বেরুতে যাচ্ছি, গেটম্যান বললে, যেতে দেওয়া হবে না, পুলিসের অর্ডার! কুমারসাহেবের দেখা পেলাম না। তাঁর সেক্রেটারী মিঃ মিত্রই বা কোথায়?

সাধারণ পোশাক পরা যে লোকটি আমাদের সঙ্গেই গাড়িতে এসেছিল, সে যুবকের পিছু পিছু এই ঘরে ঢুকল।

ইনি কে জান কালী? কিরীটী লোকটিকে প্রশ্ন করল।

না মিঃ রায়, তবে এঁকে মিঃ মিত্রের সঙ্গে ঘুরে বেড়াতে দেখেছিলাম। তখনই শুনেছিলাম এঁর নাম নাকি বিকাশ মল্লিক। এমন সময় আবার দরজার বাইরে একটা গোলমাল শোনা গেল। পরক্ষণেই প্রফেসার কালিদাস শর্মা ঘরে প্রবেশ করলেন।

সহসা একটা অস্ফুট ভয়চকিত শব্দ প্রফেসারের কণ্ঠ থেকে বের হয়ে এল, উঃ কী ভয়ানক! এ কি? সমস্ত মুখ তাঁর ভয়ে রক্তশূন্য ফ্যাকাশে হয়ে গেছে।

হঠাৎ একটা ভারী বস্তুর পতনশব্দে সকলে সচকিত হয়ে উঠে দেখি—বিকাশ মল্লিক অজ্ঞান হয়ে পড়ে গেছে।

এই অপদার্থটাকে বাইরে রেখে এস। প্রফেসার শর্মা কালীকে আদেশ দিলেন।

কিরীটী আমাকে ইঙ্গিত করতেই আমি ও ডাক্তার দুজনে জ্ঞানহীন বিকাশ মল্লিকের অসাড় দেহটা ধরাধরি করে কোনমতে পাশের ঘরে নিয়ে এলাম।

এ ঘরের মধ্যেও মৃত্যুর মতই স্তব্ধতা বিরাজ করছে।

একটা সামান্য ছুঁচ পড়লেও বোধ হয় শব্দ শোনা যায়।

কিছুক্ষণ চোখেমুখে জল দিয়ে হাওয়া করতে করতে একসময় ধীরে ধীরে বিকাশ মল্লিক উঠে সোফার ওপরে হেলান দিয়ে বসল এবং ক্লান্তিভরে একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস নিল।

ডাক্তার বললেন, এখন একটু সুস্থ বোধ করছেন কি?

হ্যাঁ। মৃদু ক্লান্তস্বরে বিকাশবাবু জবাব দিলেন।

মিঃ শুভঙ্কর মিত্র বুঝি আপনার অনেক দিনের পরিচিত? আমি জিজ্ঞাসা করলাম।

না, খুব বেশী দিনের নয়, মাত্র কয়েক সপ্তাহ হবে। বিকাশ বলতে লাগল, ভাল লোকের সঙ্গে আলাপ-পরিচয় অল্পদিনেই জমে ওঠে। মিঃ মিত্র একজন নামকরা স্পোর্টসম্যান ও শিকারী ছিলেন। প্রায়ই আমাদের দেশের বাড়ি ডায়মণ্ডহারবারে কি একটা কাজে যেতেন ; সেখানেই প্রথম আলাপ হয়। তাছাড়া অনেকদিন থেকেই হিন্দীটাকে ভাল করে শিখবার আমার ইচ্ছা। শুভঙ্করবাবু চমৎকার হিন্দী বলতে ও লিখতে জানতেন। আমি ওঁর কাছেই একটু একটু করে হিন্দী শিখছিলাম। তারপর উনিই আমাকে একদিন এখানে এনে কুমারসাহেবের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেন এবং কুমারসাহেবের দয়াতেই একটা অফিসে আজ দিন দশ হল একটা কাজ যোগাড় করেছি। তিনিই আজকের এই উৎসবে আমাকে নিমন্ত্রণ করে আনেন।

কিন্তু একটা সংবাদ বোধ হয় এখনও আপনি পাননি বিকাশবাবু: আমি বললাম।

কি? বিকাশ প্রশ্ন করলেন।

আপনার বন্ধু অর্থাৎ মিঃ শুভঙ্কর মিত্র খুন হয়েছেন।

সহসা যেন কথাটা শুনে বিকাশ মল্লিক আঁতকে উঠলেন, অ্যাঁ....তবে কি—তবে কি যে মৃতদেহ দেখে এলাম একটু আগে...

হ্যাঁ, তাঁরই মৃতদেহ।

এমন সময় কিরীটী ও প্রফেসার শর্মা এসে ঘরে প্রবেশ করলেন।

আপনি তাহলে এখন যেতে পারেন বিকাশবাবু, আমার লোকের কাছে আপনার ঠিকানাটা শুধু দয়া করে রেখে যাবেন।

বিকাশ মল্লিক কিরীটীর কথা শুনে একপ্রকার ছুটতে ছুটতেই ঘর থেকে নিষ্ক্রান্ত হয়ে গেল।

সে ঘরে তখন আর কোন লোকজনই ছিল না, সেকথা আগেই বলেছি।

মাথার ওপর উজ্জ্বল বৈদ্যুতিক আলোয় ঘরখানি উদ্ভাসিত। একটু আগেও যে-ঘরটা কলহাস্যে মুখরিত ছিল, এখন সেটা শূণ্য খাঁ-খাঁ করছে।

কিরীটী প্রফেসার শর্মাকে একটা চেয়ারে উপবেশন করতে বলে নিজেও একটা চেয়ার টেনে নিয়ে বসল।

মিঃ শুভঙ্কর মিত্রের আপনিই সব চাইত বড় বন্ধু ছিলেন শুনেছি। সুতরাং এক্ষেত্রে আপনার কাছে যতটা সাহায্য পাব, আর কারও কাছ থেকেই তা পাব না। অবিশ্যি এত রাত্রে আপনাকে বেশী বিরক্ত করব না। সামান্য দু-চারটে কথা—বুঝতেই পারছেন, বিশেষ প্রয়োজনেই...

না না, সে কি, জিজ্ঞাসা করবেন বৈকি। বিশেষ করে এখানে যখন উপস্থিত আছি।

আচ্ছা, আজ কটার সময় ঠিক আপনি এখানে এসে পৌঁছান মিঃ শর্মা?

সঠিক আমার মনে পড়ছে না, তবে রাত্রি আটটা থেকে সোয়া-আটটার মধ্যে।

বেশ, তারপর থেকে অর্থাৎ আপনার এখানে পৌঁছবার পর থেকে এখানে আপনার চোখে যা যা দেখেছেন বা ঘটেছে সব খুলে সংক্ষেপে আমায় বলুন।

সে আর এমন বিশেষ কঠিন কি! আমার নিজের যে এখানে আসবার খুব ইচ্ছা ছিল তা নয়, একপ্রকার দীনতারণের ইচ্ছাতেই এখানে আজ রাত্রে আমায় আসতে হয় ; অথচ সে এসেই চলে গেল, তাছাড়া—হঠাৎ কথার মাঝে যেন একটু থেমে প্রফেসার শর্মা আমার কিরীটীর মুখের দিকে তাকিয়ে বলতে লাগলেন, তাছাড়া আমার ধারণা ছিল, দীনতারণের এখানে কারও সঙ্গে সাক্ষাৎ করবার আগে থেকেই কথা ছিল।

কারও মানে কোন ভদ্রলোকের সঙ্গে তো? কিরীটী বললে।

প্রফেসার শর্মা যেন একটু চমকে উঠলেন। পরক্ষণেই কিরীটীর চোখর ওপর চোখ রেখে স্থির দৃষ্টিতে কিছুক্ষণ চেয়ে রইলেন।

না, আমি তা ঠিক জানি না। প্রফেসার শর্মা আবার বলতে লাগলেন, তাছাড়া এখানে পৌঁছেই আমি নীচের হলঘরে ঢুকি, সেইখানেই মিঃ মিত্রের সঙ্গে আমার দেখা হয়। আমরা দুজনে কথা বলতে বলতে একটা টেবিলের সামনে দুটো চেয়ার টেনে নিয়ে বসে দু গ্লাস 'জিনজার' খেতে লাগলাম। হঠাৎ এক সময় 'জিনজার' খেতে খেতে শুভঙ্কর হাসতে হাসতে গ্লাসের লাল রঙের তরল পদার্থের দিকে চেয়ে আমায় বললে, দেখছিল কালিদাস, কী টুকটুকে লাল! সত্যি ভাই, আজ রাত্রে এই লাল রংটা যেন আমার মনে একটা নেশা ধরিয়ে দিচ্ছে! Oh red, it is simply charming ! It is nice !

হঠাৎ কিরীটী মুখটা ঘুরিয়ে আমাকে বললে, সুব্রত, বেল বাজিয়ে একটা বেয়ারাকে ডাক তো।

বেল বাজবার সঙ্গে সঙ্গেই, যে বেয়ারাটি প্রথম মৃতদেহ আবিষ্কার করে, সে এসে দাঁড়াল।

কিরীটী তার মুখের দিকে চেয়ে বললে, আরে, তুমিই তো প্রথম মৃতদেহ দেখ, না? তুমি কফি নিয়ে যাবার ঘণ্টা শোন কখন?

আজ্ঞে, রাত্রি ঠিক সাড়ে-নটার সময়। কেননা আমি ঘড়ির দিকে নজর রেখেছিলাম।

তুমি তখন কোথায় ছিলে?

রান্নাঘরে হুজুর। রান্নাঘরের লাগোয়াই খবার ঘর, এবং রান্নাঘর ও খাবার ঘর কুমারসাহেবের প্রাইভেট রুমের ঠিক পিছনেই।

কুমারসাহেবের প্রাইভেট রুমের মধ্যে যে তোমাদের ডাকবার অন্য বেল আছে, সেই বেল বাজার দড়িটা কোথায়?

প্রাইভেট রুম থেকে হলঘরে আসবার দরজার গায়েই হুজুর।

বেল শোনা মাত্রই তুমি কফি নিয়ে চলে এলে, না?

না। বাবুর্চি কফিটা তৈরী করতে একটু সময় নেয়। মিনিট দশেক বোধ করি দেরি হয়েছিল কফি নিয়ে আসতে।

কোন্ দরজা দিয়ে তুমি কুমারসাহেবের প্রাইভেট রুমে ঢোক?

ওঘরে যাবার হলের মধ্য দিয়ে যে দরজা আছে সেই দরজা দিয়ে। দরজার ঠিক সামনেই একজন ভদ্রলোক দাঁড়িয়েছিলেন, বোধ হয় আপনারই লোক হবেন তিনি। আমি দরজায় শব্দ করলাম, কিন্তু কোন সাড়া শব্দ ভেতর থেকে পেলাম না। এবার জোরে দরজায় ধাক্কা দিলাম, কিন্তু তাতেও কোন সাড়াশব্দ পেলাম না। তখন আমি সামনে দাঁড়ানো সেই ভদ্রলোকটিকে জিজ্ঞাসা করি, ঘরে কেউ আছেন কি? তাতে তিন জবাব দেন, তার মানে? কারও ঐ ঘরে থাকবার কথা ছিল নাকি? আমি তাতে জবাব দিই, আজ্ঞে, সেক্রেটারী সাহেবের তো ঐ ঘরে থাকবার কথা। তাতে আমায় বললেন, তবে যাও। আমি তখন দরজা টেনে ভিতরে প্রবেশ করি। বেয়ারার গলার স্বর ক্রমেই উত্তেজিত হয়ে উঠছিল, সে কথা বলতে বলত ঘন ঘন আমাদের সকলের দিকে ফিরে ফিরে তাকাচ্ছিল।

তারপর কিরীটী জিজ্ঞাসা করল।

আজ্ঞে, তারপর আমি কফি নিয়ে ঘরে গিয়ে ঢুকে প্রথমে কিছু দেখতে পাইনি।

ঘরের মধ্যে এগিয়ে গিয়ে হঠাৎ পায়ে বাধা পেয়ে হোঁচট খেয়ে পড়ে যাই। পড়েই আমি চিৎকার করে উঠি ও তাড়াতাড়ি উঠে আপনাদের ঘরের দিকে যাই। আমি আল্লার নামে শপথ করছি, হুজুর এর চাইতে বেশী কিছুই আমি জানি না। আমি খুন করিনি। বলতে বলতে লোকটা হাউ হাউ করে কাঁদতে কাঁদতে কিরীটীর পায়ের কাছে আছাড় খেয়ে পড়ল।

তোমাদের কোন ভয় নেই হে, তুমি উঠে বস। আমি জানি তুমি খুন করোনি। কিরীটীর কথায় কতকটা আশ্বস্ত হয়েই যেন লোকটা চোখ মুছতে মুছতে উঠে বসল।

॥ ছয় ॥

কিরীটী সম্মুখে উপবিষ্ট প্রফেসার শর্মার দিকে তাকিয়ে বলল, হ্যাঁ প্রফেসার আপনি যা বলছিলেন এবার বলুন।

প্রফেসার শর্মা বললেন, জিনজার খাবার পর সেক্রেটারী শুভঙ্করকে নিয়ে আমি খাবার ঘরে যাই। সেখানে আমাকে একটু অপেক্ষা করতে বলে শুভঙ্কর নীচে চলে যায়।

অনুমান তখন রাত্রি কটা?

প্রফেসার শর্মা মৃদু একটু হাসলেন, ক্ষমা করবেন মিঃ রায়, আগে তো বুঝিনি আজকের রাত্রের প্রতিটি ঘণ্টা, প্রতিটি মিনিটের হিসেবনিকেস কারো কাছে দিতে হবে তাহলে না হয় ঘড়িধরে সব কাজগুলো করে রাখতাম। তবে যতদূর মনে হয় রাত্রি তখন নটা হবে বা নটা বাজবার মিনিট চার-পাঁচ আগেও হতে পারে। তরপর হঠাৎ ব্যঙ্গ-মিশ্রিত কণ্ঠে বললেন, কিন্তু ব্যাপারটা কি বলুন তো মিঃ রায়, গরীবকে ফাঁসাবার মতলবে জেরা করছেন না তো?

কিরীটী ও-কথার কোন জবাব না দিয়ে গম্ভীর স্বরে প্রশ্ন করলে, আপনি তাহলে তারপর খাবার ঘরেই রয়ে গেলেন?

হ্যাঁ খাবার ঘরে পরিষ্কার টেবিল চেয়ার পাতা ছিল, কেননা আজ খাবার আয়োজন হয়েছিল নীচে। হঠাৎ আমার নজরে পড়ে, টেবিলের ওপর একখানি হিন্দী ভাষায় অনূদিত ছোটদের রূপকথা "সাত সমুদ্র তেরো নদীর পারে" পড়ে আছে। আমি হিন্দী ভাষা বেশ ভালই জানি এবং হিন্দীতে অনূদিত ছোটদের একখানি রূপকথা দেখে লোভ সামলাতে পারলাম না ; তাছাড়া রূপকথা পড়তে চিরদিনই বড় ভালবাসি। বইখানি হাতে পেয়ে অন্যমনস্ক ভাবে একটা চেয়ারের ওপরে বসে পড়লাম। বেশী লোকের গোলমাল আমি কোন দিনই পছন্দ করি না, ভাবলাম বাঁচা গেল। হাতের কাছে বইটা পেয়ে তাতেই মনঃসংযোগ করলাম। বইটা সত্যিই ভাল। রূপকথা পড়তে আপনার কেমন লাগে মিঃ রায়?

ব্রাভো! চমৎকার! কিরীটী চাপা উল্লাসভরা কণ্ঠে বলে উঠল, এ যে দেখছি একটা মজার রহস্য উপন্যাস হয়ে দাঁড়াচ্ছে! চারদিকে উৎসবের কলোচ্ছ্বাস, একজন ছায়ার মত এসে স্নানের ঘরে মাটি কোপানোর খুরপি ফেলে গেলেন ; আর একজন খাবার ঘরে এসে "সাত সমুদ্র তেরা নদীর পারে" রূপকথা কুড়িয়ে পেলেন এবং তখনি সেই রূপকথা পড়ায় মত্ত হয়ে উঠলেন। এমন সময় এক সাংঘাতিক খুনী রক্ত দেখবার নেশায় পাশের ঘরে হায়েনার মত হিংস্র হয়ে উঠছে! সব কিছুর মধ্যেই একটা মানে থাকা দরকার। যদি এই পর পর ঘটনাগুলোর আদপে কোন মানেই না থাকে, তাহলে এই পৃথিবীতে কোন কিছুরই মানে হয় না!

পরমুহূর্তেই যেন হঠাৎ কিরীটী আবার গম্ভীর হয়ে প্রফেসার শর্মাকে পুনঃপ্রশ্ন করল, খুব ভাল, ঘড়ির সময় নিয়ে আপনি একটু আগে আমাদের ঠাট্টা করছিলেন, আবার কিছু সময়-সম্পর্কীয় অতি আবশ্যকীয় দু-চারটে কথা এসে যাচ্ছে! ক্ষমা করবেন প্রফেসার, আমি সিঁড়ির ও খাবার ঘরের ঘড়ি মিলিয়ে দেখেছি। আমার ঘড়ি আর ওই দুটো ঘড়ি একই সময় দিচ্ছে— আপনার ঘড়িতে এখন কটা প্রফেসার?

প্রফেসার শর্মা পকেট থেকে একটা মূল্যবান রৌপ্য-নির্মিত ঘড়ি বের করে হাতের ওপরে নিয়ে দেখে বললেন, ঠিক দশটা বেজে বারো মিনিট হয়েছে।

আমারও ঠিক তাই, কিরীটী আপন হাতঘড়ি দেখে বললে, তোমার ঘড়িতে কত সুব্রত?

দশটা বেজে চব্বিশ মিনিট। আমার ঘড়ি দেখে বললাম।

বেশ! প্রফেসার, আপনার যদি আপত্তি না থাকে তবে দয়া করে যদি বলেন, রাত্রি ঠিক সাড়ে নটার সময় আপনি কোথায় ছিলেন? কিরীটী প্রশ্ন করল প্রফেসারের মুখের দিকে

চেয়ে, অর্থাৎ যখন মিঃ মিত্র কুমারসাহেবর প্রাইভেট ঘরে গিয়ে ঢোকেন?

নিশ্চয়ই। বলে সহসা প্রফেসার হাঃ হাঃ করে উচ্চৈঃস্বরে হেসে উঠলেন। তারপর কোনমতে হাসি চাপতে চাপতে বললেন, সাড়ে নটার সময় হলঘরে দাঁড়িয়ে আমি আপনারই পাহরারত ভদ্রলোকটির সঙ্গে কথা বলছিলাম। তারসঙ্গে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে প্রায় আট-দশ মিনিট কথাবার্তা বলেছি। তারপর তার সামনেই এই ঘরে এসে ঢুকি এবং কুমারসাহেব এইখানে দাঁড়িয়ে আপনাদের সকলের সঙ্গে আমার পরিচয় করিয়ে দেন, আশা করি আপনার মহামান্য তীক্ষ্ণবুদ্ধি বন্ধুবর এত তাড়াতাড়ি সে কথা ভুলে যাননি!

কিরীটীর মুখের দিকে চেয়ে স্পষ্টই বুঝতে পারছিলাম অসহ্য বিরক্তিতে সে এবার নিশ্চয়ই কোন কিছু বলে বসবে, কিন্তু হঠাৎ যেন সে নিজেকে সামলে নিয়ে সামনেই ঝোলনো ভৃত্যদের ডাকবার ঘণ্টার দড়িটায় ধীরে ধীরে একটা টান দিয়ে ছেড়ে দিল।

আমরা সকলে নির্বাক বিস্ময়ে কিরীটীর মুখের দিকে উদ্‌গ্রীব হয়ে চেয়ে রইলাম।

হরিচরণ ঘরে এসে ঢুকল।

প্রফেসারের দিকে আড়চোখে তাকিয়ে কি ইঙ্গিত করতেই ঘাড় হেলিয়ে বললে, হ্যাঁ, স্যার, ঐ ভদ্রলোক আমার কাছেই ছিলেন। এক সময় আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, মশাই, ঠিক এখন সময় কত বলতে পারেন? আমার মনে হচ্ছে আমার ঘড়িটা বোধ হয় একটু slow যাচ্ছে। আমি বললাম, আমার ঘড়ি ঠিকই আছে—সাড়ে নটা বেজেছে। আমরা দুজনে এগিয়ে গিয়ে সিঁড়ির ঘড়িটাও একবার দেখে নিজেদের ঘড়ির সঙ্গে মিলিয়ে নিলাম। কুমারসাহেবের প্রাইভেট রুমের ঠিক সামনাসামনি ওঠবার সিঁড়ি, আমরা দুজনেই সিঁড়ির মাথা পর্যন্ত এগিয়ে গিয়েছিলাম। ভদ্রলোক আমার ঘড়িটা সিঁড়ির সঙ্গে একই টাইম দিচ্ছে দেখে নিজের ঘড়িটি মিলিয়ে নিতে নিতে আমার সঙ্গে কথা বলছিলেন।

কিরীটী বাধা দিল, তাহলে তুমি তখন ঠিক সিঁড়ির মাথায় ছিলে, যখন মিঃ মিত্র কুমারসাহেবের প্রাইভেট রুমে প্রবেশ করেন।

হ্যাঁ, সেই সময় প্রায় পাঁচ মিনিট উনি আমার সঙ্গেই ছিলেন। তরপর তিনি এই ঘরে এসে প্রবেশ করেন।

ঐ সময় তুমি নিশ্চয়ই হলঘর থেকে প্রাইভেট রুমে যাবার দরজাটার প্রতি বেশ ভাল নজর রেখেছিলে হরিচরণ, কী বল?

খুব কঠিন দৃষ্টিতে নজর না রাখলেও, মোটামুটি ভাল করেই নজর রেখেছিলাম স্যার এবং বেয়ারা যখন ঘরে ঢোকে আমি তখনও তার পিছনেই দাঁড়িয়ে এবং আমি ওর সঙ্গে সঙ্গেই ঘরের মধ্যে ঢুকে মৃতদেহ দেখতে পাই । আপনি না আসা পর্যন্ত আমি একবারের জন্যও ওখান থেকে নড়িনি।

হঠাৎ প্রফেসার শর্মা বললেন, আচ্ছা, এবারে আমি আসতে পারি কী মিঃ রায়? রাত্রি অনেক হল। এই আমার নামের কার্ড রইল, যখন ইচ্ছা ফোনে একটু খবর দিলেই আমার দেখা পাবেন। বলতে বলতে একটা সুদৃশ্য কার্ড কিরীটীর হাতের দিকে প্রফেসার এগিয়ে ধরলেন। কিন্তু কিরীটী তাঁর কথায় কোন জবাবই দিল না, চুপচাপ বসেই রইল, যেন কথাগুলো কানেই যায়নি। তারপর নীরবে হাত বাড়িয়ে প্রফেসার হাত থেকে কার্ডটা নিয়ে ভ্রূ কুঁচকে কী যেন ক্ষণেক ভাবল, তারপর মৃদু অথচ দৃঢ়কণ্ঠে বললে, প্রফেসার শর্মা, আশা করি ও-ঘরের তলোয়ারটার কথা এর মধ্যেই একেবারে ভুলে, যাননি!

সহসা প্রফেসারের চোখের দৃষ্টিটা তীক্ষ্ণ ও উগ্র হয়ে উঠল। তিনি পলকহীন ভাবে কিরীটীর দিকে চাইলেন, কিরীটীও তার নির্ভীক দৃষ্টিতে প্রফেসারের দিকে চেয়ে রইল।

চারজোড়া তীক্ষ্ণ চোখ পরস্পর পরস্পরের দিকে কিছুক্ষণ অপলকে চেয়ে রইল। দুজনেই ভয়ঙ্কর রকম যেন সজাগ হয়ে উঠেছে।

তারপর সহসা আবার প্রফেসার প্রবলভাবে হেসে উঠলেন এবং চিবিয়ে চিবিয়ে অদ্ভুত ভাবে বলে উঠলেন, চমৎকার! তাহলে মান্যবর ডিটেকটিভ বন্ধু আমার আমাকেই খুনী বলে সাব্যস্ত করলেন শেষটায়! ওয়ানডারফুল! অভাবনীয় চিন্তাশক্তি!

না। জলদগম্ভীর স্বরে কিরীটী বলে উঠল, অন্ততঃ বর্তমানে আপনাকে খুনী বলে সন্দেহ করিনি। কোন মানুষ আগে থেকে চিন্তা করে খুন করতে পারে, কিন্তু আগে থেকে চিন্তা করে শয়তান হতে পারে না! আমি শুধু কয়েকটা আবশ্যকীয় প্রশ্নই জিজ্ঞাসা করেছি মাত্র। ও-কথা যাক প্রফেসার, বলুন, মিঃ মিত্র কি হিন্দী ভাষা বলতে-কইতে পারতেন?

সত্যি কথা বলতে কি, প্রফেসার বলতে লাগলেন, মোটেই না। হিন্দী ভাষায় তার জ্ঞান, 'করেঙ্গা' 'খায়েঙ্গা' পর্যন্তই। শুভঙ্কর ছিল আমার ছোটবেলার বন্ধু, তার নাড়ীনক্ষত্র আমি জানি। বড়লোক বাপের একমাত্র ছেলে ছিল ও। লোক জানত ও বিলাতফেরত, উচ্চ-শিক্ষিত ; আসলে ওর পড়াশুনা তেমন ছিল না। ম্যাট্রিক পর্যন্ত বিদ্যার দৌড়। চেহারাটা ছিল সুন্দর আর common sense ছিল প্রচুর, যার ফলে কিছু না জেনেও অনেক কিছুই জানবার ভান করতে পারত। কিন্তু খেলাধূলায় ওর মত ওস্তাদ বড় একটা দেখা যেত না। টেনিস খেলতে, সাঁতার কাটতে, ঘোড়ায় চড়তে, তরবারি বা ছোরা খেলতে, বন্দুক ছুঁড়তে, বড় বড় জানোয়ার শিকার করতে ও ছিল একেবারে যাকে বলে অদ্বিতীয়। আচ্ছা, এবারে Good Night জানাচ্ছি my friend! আশা করি ক্ষণিকের চেনা গরীব বন্ধুর কথাটা ভুলে যাবেন না।

নিশ্চয়ই না। বিশেষ করে না ভুলতে যখন আপনিই এত করে অনুরোধ জানিয়ে যাচ্ছেন! কিরীটী গম্ভীর স্বরে জবাব দিল।

ধীর মন্থরপদে জুতোর শব্দ তুলে প্রফেসার কালিদাস শর্মা ঘর থেকে নিষ্ক্রান্ত হয়ে গেলেন।

কিরীটী এক সময় বললে, দেখ হরিচরণ, তুমি একবার এখানে যাঁরা যাঁরা উপস্থিত আছেন প্রত্যেকের সঙ্গে কথা বলে জানবার চেষ্টা কর, তাঁদের মধ্যে কে কে আজ রাত্রে এখানে প্রফেসার কালিদাস শর্মাকে দেখেছেন! আর খাবার ঘরে গিয়ে একবার দেখ সেখানে "সাত সমুদ্র তেরো নদীর পারে" নামে বইখানা পাও নাকি! আর চেষ্টা কর জানতে কে ঐ বইখানা এনেছিল সঙ্গে করে? হ্যাঁ, আর যাবার সময় কুমারসাহেবের ম্যানেজারটিকে একবার এখানে পাঠিয়ে দিও তো?

হরিচরণ ঘর থেকে বের হয়ে যেতেই কিরীটী আমাদের দিকে তাকিয়ে বললে, আমি যতদূর জানি, এই কালিদাস শর্মারই বছর তিন-চার আগে কী একটা ব্যাপার নিয়ে দুর্নাম রটে, ফলে কলেজের চাকরি যায়, তারপর থেকেই লোকটা সম্পূর্ণ বেকার ; কিন্তু বর্তমানে বেকার অবস্থায় এত বাবুয়ানা ওর আসে কোথা থেকে? খুব সম্ভব কুমারসাহেবকে ও নেশার বস্তু যোগায়!

আমারও যেন তাই মন হয়, ডাঃ চট্টরাজ চাপা উত্তেজিত কণ্ঠে বলে উঠলেন, বোধ

হয় সেইজন্যই কুমারসাহেব যখন আজ রাত্রে আমাদের সঙ্গে গল্প করতে করতে উঠে গিয়ে দ্বিতীয়বার ফিরে এলেন, তখন তাঁকে একরকম যেন অসুস্থের মত দেখাচ্ছিল। মাথাটা নিচের দিকে নামিয়ে শ্লথ মন্থর গতিতে হাঁটছিলেন। তখনই আমার মনে হয়েছিল, ভদ্রলোক বোধ হয় কোন একটা নেশাটেশায় অভ্যস্ত।

আপনি ঠিকিই বলেছেন ডাক্তার, কিরীটী বলে উঠল, খুব সম্ভবত দ্বিতীয়বার তিনি যখন আমাদের কাছে আসেন, তখন কোন একটা কিছু নেশা করে এসেছিলেন। আপনি বোধ হয় লক্ষ্য করেননি।

আমি বাধা দিলাম, উনি না লক্ষ্য করলেও, আমার দৃষ্টিকে তুমি এড়াতে পারনি বন্ধু। কুমারসাহেব যখন আমাদের দেওয়া সিগার না খেয়ে নিজের সিগারেট খেয়ে উঠে যান, তখন তাঁর অ্যাসট্রের মধ্যে সেই নিক্ষিপ্ত নিঃশেষিত সিগারেটের টুকরোটা তুমি তুলে নিয়ে পকেটস্থ করেছ!

এতদিনে সত্যসত্যই সুব্রতর চোখ একটু সজাগ হতে আরম্ভ করেছে। কিরীটী হাসতে হাসতে বলতে লাগল, চেয়ে দেখুন ডাক্তার, কিরীটী পকেটে হাত চালিয়ে সিগারেটের টুকরো বের করে আমাদের চোখের সামনে মেলে ধরল, একটু ভাল করে লক্ষ্য করলেই বুঝতে পারবেন, এ সিগারেট কেনা নয়, হাতে পাকিয়ে তৈরি করা, তাছাড়া সিগারেটের মসলা যেমন হয় এর মধ্যকার মসলা ঠিক তেমন নয় ; একটু মোটা এবং কোনমতে কাগজ দিয়ে জড়িয়ে সিগারেট বানানো হয়েছে। শুঁকে দেখুন.....। বলতে বলতে কিরীটী সিগারেটটা খুলে ফেললে।

তাছাড়া দেখুন, মসলাটা কেমন ফিকে ব্রাউন রংয়ের 'মরিহুয়ানা' ('morihuanna) কিংবা 'হ্যাস্‌হিস্‌' ('hashish') ভাং সিদ্দি বা গাঁজা জাতীয় জিনিস। তবে আসলে কোন্ জিনিসটা দিয়ে যে এই সিগারেটের মসলা তৈরী হয়েছে তা রাসায়ানিক পরীক্ষাগার থেকে পরীক্ষিত না হয়ে আসা পর্যন্ত সঠিক বলা চলছে না। তোমরা হয়তো জান না, ইজিপ্টের লোকেরা 'হ্যাস্‌হিসের সবুজ বা কাঁচা পাতা খায়। তাতে নাকি নেশা হয়। মেক্সিকোতে যে 'হ্যাসহিস্‌' পাওয়া যায়, তার পাতা আরো তীব্র নেশা আনে। খুব সম্ভব প্রফেসার শর্মা এই ধরনের সিগারেট তৈরী করে কুমারসাহেবকে নেশায় পরিতুষ্ট করে থাকেন। প্রফেসার শর্মা উদ্ভিদ বিজ্ঞানের অধ্যাপক ছিলেন বলে ওঁর সিগারেটের ওপরে সর্বপ্রথম আমার সন্দেহ জাগে, যে মুহূর্তে উনি আমার দেওয়া সিগারেটের অফার ফিরিয়ে দিলেন, অথচ ঠিক সেই সময়ই নিজের কেস হতে সিগারেট বের করে ধূমপান শুরু করলেন। কোন সভায় বা দু-দশজন যেখানে মিলিত হয়েছে, সেখানে কেউ সিগারেট কাউকে অফার করলে তাকে refuse করে পরমুহূর্তেই নিজের সিগারেট ব্যবহার করা এটিকেট-বিরুদ্ধ। একমাত্র সেই কারণেই আমি কুমারসাহেবের নিঃশেষিত ফ্যাগ end টা অ্যাসট্রে হতে তুলে নিয়েছিলাম। তরপর একটু থেমে আবার বললে, হ্যাঁ ভাল কথা ডাক্তার, আপনাদের ডাক্তারী শাস্ত্রে ভাং সিদ্ধি প্রভৃতির নেশা করলে কি কি লক্ষণ দেখা যায় বলে?

চোখের মণিতে অবস্থিত আলো প্রবেশের ছিদ্রপথ pupil সঙ্কুচিত (contracted) হয়ে যায়। জোরে জোরে শ্বাস-প্রশ্বাস নিতে শুরু করে, সামান্য একটু চলাফেরা করলেই exhaustion হয়ে গা ঠাণ্ড' হয়ে যায়। কল্পনায় সব নানা রকম অদ্ভুত অদ্ভুত দৃশ্য চোখের ওপর ভাসতে থাকে ; যাকে আমরা ডাক্তারী শাস্ত্রে hallucination বলি! এখন বোধ

হয় বুঝতে পারছ রায়, কুমারসাহেব যে অদ্ভুত গল্প আমাদের শোনাচ্ছিলেন তা ঐ নেশারই প্রভাবে।

অদ্ভুত আর তাকে বলা চলে না ডাক্তার, আজকের রাতের ঘটনার কথা ভাবতে গেলে কিছুই আর আশ্চর্য বা অদ্ভুত লাগে না। আমি এখনও স্থিরনিশ্চিত নই কুমারসাহেবের গল্পটা নেশা থেকেই উদ্ভুত না কল্পনা মাত্র। আপনি যে জিনিসটার প্রভাবের কথা বলছেন সেটাও ঐ গাঁজা বা ভাং জাতীয় গাছের পাতা থেকে হয়, এবং ঐ ধরনের নেশার বস্তু একটা সিগারেটের মধ্যে যতটুকু থাকে তাতে করে অমন নেশা হতে পারে বলে আমার কিন্তু মনে হয় না। সামান্য একটু উত্তেজকের কাজ করতে পারে মাত্র। আমার মনে হয় এ ধরনের নেশায় কুমার সাহেব অনেকদিন থেকেই বেশ অভ্যস্ত। না হলে তিনি এ ধরনের নেশা করে নিশ্চয়ই অসুস্থ হয়ে পড়তেন এবং সেটাই স্বাভাবিক। তাছাড়া এই জাতীয় নেশায় অভ্যস্ত যেসব নেশাখোর, তাদের এই সামান্য একটু নেশার দ্রব্য সেবন করলে আর যাই হোক অন্ততঃ কল্পনায় স্বপ্ন যে দেখতে শুরু করবে না এটাও ঠিক। অর্থাৎ আমি বলতে চাই, আপনাদের ডাক্তারী শাস্ত্রে ঐ hallucination দেখা তাদের পক্ষে সম্ভব হয়তো না হওয়াটাই বেশী সম্ভব। আরো একটা কথা এই সঙ্গে আমাদের ভুললে চলবে না যে, এ জাতীয় জিনিসের লোককে মেরে ফেলবারও একটা ক্ষমতা আছে, তবে একটু দীর্ঘ সময় লাগে। যেমন ধরুন দীর্ঘ পাঁচ বছর ধরে নিয়মিত ভাবে ঐ ধরনের নেশা করে আসলে, অনবরত এগুলো slow poisoning-য়ের কাজ করতে পারে অনায়াসেই। এমনও হতে পারে যে, ঐভাবে নেশার মধ্য দিয়ে slow poisoning করে কেউ ঐ উপায়ে অনেক দিন ধরেই ওঁকে সবার অলক্ষ্যে এ জগৎ থেকে নিঃশব্দে সরিয়ে ফেলবার চেষ্টা করছিল।

এমন সময় ম্যানেজারবাবু এসে ঘরে ঢুকলেন। —এমন করে আর কুমারসাহবের সর্বনাশ করবেন না স্যার, আপনার লোকেদের আদেশ দিন যাতে করে তাঁরা এবার এখানে উপস্থিত সম্মানিত অতিথি-অভ্যাগতদের অন্ততঃ চলে যেতে বাধা না দেন। একেই তো তাঁরা সব নানা অদ্ভুত প্রশ্ন করে করে আমাদের প্রায় পাগল কর তোলবার যোগাড় করেছেন। এমন কি এর মধ্যে কেমন করে না জানি প্রকাশও হয়ে গেছে যে কুমারসাহেবের সেক্রেটারীকে কে হত্যা করেছে। আমি যদিও তাঁদের বুঝিয়ে বলেছি, তিনি আত্মহত্যা করেছেন, কেউ তাঁকে হত্যা বা খুন করেনি, কিন্তু এ ধরণের কথা একবার রটলে কি কেউ আর কারও কথা বিশ্বাস করে বা করতে চায়?

কিরীটী হাসতে হাসতে বললে বসুন। আপনার মনিবের সেক্রেটারী আত্মহত্যা করেছেন শুনলে নিশ্চয়ই আপনার প্রভুর আত্মমর্যাদা বেড়ে যাবে, কি বলেন ম্যানেজারবাবু? কিন্তু সে কথা থাক, ব্যস্ত হবেন না, এখন বলুন তো দেখি, আজ রাত্রে এই উৎসবে এমন কি কেউ এখানে এসেছেন যাঁকে আপনি চেনেন না বা ইতিপূর্বে কোন দিন দেখেননি?

না, কই এমন কাউকে দেখছি বলে তো আমার আজ মনে পড়ছে না! ম্যানেজারবাবু বলে উঠলেন, তাছাড়া এ উৎসবে আমন্ত্রিতদের প্রত্যেকেই নিমন্ত্রণ-লিপি দেওয়া হয়েছিল এবং নিমন্ত্রণ-লিপি ছাড়া আর কাউকেই প্রবেশ করতে দেওয়া হয়নি। সেক্রেটারীবাবুর এ বিষয়ে কড়া নজর ছিল।

সহসা আবার কিরীটী প্রশ্ন করল, আচ্ছা ম্যানাজারবাবু, বলতে পারেন, আপনাদের

কুমারসাহেবের সেক্রেটারী মিঃ মিত্র কতদিন থেকে আফিং খাওয়াটা অভ্যাস করেছিলেন? দেখুন অস্বীকার করবেন না বা অস্বীকার করবার চেষ্টা করবেন না। আপনি নিশ্চয়ই তাঁর অনেক কথাই জানেন, কেননা বেশীর ভাগ সময়ই দুজনে আপনারা সহকর্মী হিসাবে এখানে কাজ করছিলেন। বলুন না মশাই, চুপ করে আছেন কেন? খেতেন নাকি তিনি?

আ-জ্ঞে!

বলুন! কঠিন আদেশের সুর কিরীটীর কণ্ঠে ঝঙ্কৃত হয়ে উঠল। কিছুক্ষণ ম্যানেজারবাবু মাথা নীচু করে কি যেন ভাবলেন, তারপর একসময় মৃদুস্বরে বললেন, আজ্ঞে মাসখানেক হবে, তিনি আফিং একটু একটু করে গরম কফির সঙ্গে খেতেন। বলতেন, অন্য কোন বদ নেসার থেকে আফিং খাওয়াটা নাকি ভাল। তাছাড়া তাঁর পেটের গোলমাল আছে বলে ডাক্তার নাকি পরামর্শ দিয়েছিল প্রত্যহ একটু একটু করে আফিং খেতে। আফিং ধরবার পর উপকারও নাকি পাচ্ছিলেন।

ভাল কথা! খুব ভাল কথা! কিন্তু আপনাদের কুমারসাহেবও কি ঐ সঙ্গে কোন নেশায় অভ্যস্ত হয়ে পড়েছিলেন নাকি?

আজ্ঞে, তিনি বোধ হয় ঐ একই সময় থেকে আফিং খাওয়ার সঙ্গে অভ্যস্ত হয়েছেন. কিন্তু আমার মনে হয় কুমারসহেব আফিংয়ে অনেক দিন থেকে অভ্যস্ত।

বেশ। আচ্ছা আজ রাত্রে কুমারসাহেবকে আপনারা ভাং বা সিদ্ধি জাতীয় কোন জিনিস দিয়ে সিগারেট তৈরী করে দিয়েছিলেন?

আজ্ঞে—

বলুন, জবাব দিন!

আজ্ঞে হ্যাঁ। কেননা আমি ভেবেছিলাম সিদ্ধি খেলে তিনি একটু চাঙ্গা হয়ে উঠবেন। জানি না কেন যেন আজ চার-পাঁচদিন একটা চিঠি পেয়ে অবধি তিনি অত্যন্ত অস্থির হয়ে পড়েছিলেন। সর্বদাই মনমরা, যেন কি কেবলই ভাবছেন তাই ভাবলাম, আজকের এই উৎসবের দিন, সাধারণ সিদ্ধির সরবত-টরবত দিলে হয়তো তিনি আপত্তি করতে পারেন, তাই সিগারেট তৈরী করে রেখেছিলাম। এ রকম মাঝে আরো দুবার সিগারেট করে খাইয়েছিও তাকে। সন্ধ্যার অল্প পরেই আমি তখন কুমারসাহেবের লাইব্রেরী ঘর বসে কয়েকটা হিসাবপত্র মিলিয়ে নিচ্ছি, কুমারসাহেব যেন খুব উত্তেজিত হয়েছেন এমন অবস্থায় এসে লাইব্রেরী ঘরে ঢুকলেন, বললেন, এক কাপ গরম কফি খাওয়াতে পারেন ম্যানেজারবাবু? আর আপনার সেই সিগারট কয়েকটা দিতে পারেন? তারপর তিনি আমাকে একটু আগে বাথরুমে কী দেখেছেন তাই বলতে লাগলেন। আমি নিজে তাঁকে কফি নিয়ে এসে দিলাম ও পকেট থেকে তৈরী করা গোটাপাঁচেক সিগারেটও দিলাম।

আজকেই আপনি তাহলে প্রথম তাঁকে ঐ ধরনের সিগারেট দিয়েছিলেন বোধ হয়?

আজ্ঞে না। দিন পাঁচেক আগে একবার গোটাপাঁচেক তৈরী করে দিয়েছিলাম।

তবেই দেখুন ডাক্তার, ভাং বা সিদ্ধির প্রভাবে কুমারসাহেব কল্পনার বিভীষিকা দেখেননি, সিগারেট পান করবার আগেই দেখেছেন। তারপর ম্যানেজারের দিকে ফিরে তাকিয়ে বললে, বেশ। আচ্ছা ম্যানেজারবাবু কুমারসাহেবের সঙ্গে যখন আপনার দেখা হয় তখন ঠিক কত রাত্রি হবে বলতে পারেন? মানে রাত্রি তখন কটা বাজে?

আজ্ঞে রাত্রি নটা হবে।

আচ্ছা, তারপর আপনি কী করলেন?

তারপর আরও কিছুক্ষণ আমি ঐখানেই ছিলাম, কেননা কুমারসাহেব সিগারেট নিয়েই ঘর থেকে বের হয়ে গেলেন দ্রুতপদে। তারপর হিসাবপত্র দেখা হয়ে গেলে প্রায় রাত্রি সাড়ে নটার সময় আমি নীচে নেমে যাই।

এর পর ম্যানেজারবাবুকে কিরীটী বিদায় দিল।

ভদ্রলোকও যেন হাঁপ ছেড়ে বাঁচলেন, কেননা তিনি একপ্রকার দৌড়েই ঘর থেকে নিষ্ক্রান্ত হয়ে গেলেন।

ম্যানেজার ঘর থেকে চলে যাবার পর সকলেই কিছুক্ষণ চুপ করে থাকে। কিরীটীও বোধ করি কি ভাবছিল।

॥ সাত ॥

ঘরের নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করে সর্বপ্রথম কিরীটীর দিকে চেয়ে এবারে আমিই প্রশ্ন করলাম, আজকের ব্যাপারের অনেক কিছুই যেন তুমি এখনো চেপে রাখছ বলে মন হচ্ছে কিরীটী? একটা সূত্র অবিশ্যি পাওয়া যাচ্ছে, মিঃ শুভঙ্কর মিত্র নেশা করতেন!

কিরীটী মৃদু হেসে বলে সেটা এমন বিশেষ একটা সূত্র নয়। কিন্তু এই case সম্পর্কে আপতত যতটা জানতে পেরেছ, তাতে করে তোমার মতামতটা কী সুব্রত? যতটুকু জেনেছ বা শুনেছ এর মধ্যে কোন অসামঞ্জস্য বা অবিশ্বাস্য মনে হয় কী?

একটা অসামঞ্জস্য খুব মোটা ভাবেই চোখে পড়েছে।

ডাঃ চট্টরাজ বাধা দিলেন, এক মিনিট সুব্রতবাবু! বলে হঠাৎ কিরীটীর দিকে চেয়ে বললেন, হ্যাঁ, একটা কথা রায়, তোমার ধারণা বোধ হয় স্যার দিগেন্দ্রই কারও ছদ্মবেশে আজ রাত্রের উৎসবে যোগ দিয়েছিলেন?

যদি বলি ডাঃ চট্টরাজ তাই! এমন কোন বিশেষ ব্যক্তির ছদ্মবেশ নিয়ে তিনি এখানে আজ হয়েতো এসেছেন, যার সঙ্গে মিঃ মিত্রের বেশ ঘনিষ্ঠ পরিচয় ছিল। তা ছাড়া কোন নিমন্ত্রণ-বাড়ির একটা কার্ড যোগাড় করে এখানে আসাটা এমন বিশেষ কিছুই একটা কঠিন ব্যাপার বলে কি মন হয় ডাঃ চট্টরাজ?

না। কিন্তু তাহলে তুমি স্থিরনিশ্চিত যে, স্যার দিগেন্দ্রই কারও ছদ্মবেশে এসে আজ রাত্রে হতভাগ্য শুভঙ্কর মিত্রকে খুন করেছেন? কিন্তু—

মৃদু হেসে সহজ স্বাভাবিক স্বরে কিরীটী জবাব দিল, নিশ্চয়ই। এতে আমার দ্বিমত নেই।

কিন্তু বন্ধু, এক্ষেত্রে মিঃ মিত্রের মত একজন তৃতীয় ব্যক্তিকে স্যার দিগেন্দ্রের খুন করবার কী এমন সার্থকতা থাকতে পারে সেটাই যেন ঠিক বুঝে উঠতে পারছি না। অবিশ্যি কুমারসাহেবকে হত্যা করলেও না হয় বোঝা যেত ; কেননা তাঁর মুখে শুনেছি স্যার দিগেন্দ্র প্রায় তিন-চারখানা চিঠিতে একাধিকবার কুমারসাহেবকে শাসিয়েছেন তাঁর প্রাণ নেবেন বলে। এবং যে কারণেই হোক কুমারসাহেবের ওপরে তাঁর একটা আক্রোশও আছে।

কিরীটী এবার বলে, জানেন কিনা আপনারা জানি না—গতকাল রাত্রে কুমারসাহেব শেষ চিঠি পেয়েছেন স্যার দিগেন্দ্রর কাছ থেকে এবং সেই সঙ্গে আমাদের সেক্রেটারী সাহেবও একখান চিঠি পেয়েছিলেন। চিঠিতে লেখা ছিল, বলতে বলতে একখানা চিঠি পকেট থেকে

টেনে বের করে কিরীটী চিঠিটা পড়তে শুরু করে ঃ আমাদের সাত পুরুষের সঞ্চিত অর্থ নিয়ে তুমি যে এই দানধ্যানের ছেলেখেলায় মেতে উঠেছ, এর সকল ঋণ কালই তোমার আপন বুকের রক্ত দিয়ে কড়ায়গণ্ডায় পরিশোধ করত হবে। বুকের রক্ত ঢেলে অর্জিত এ অর্থ অপব্যবহার করে যে পাপ করেছ, তা বুকের রক্তেই শেষ হয়ে যাক। আঃ, তাজা টুকটুকে লাল রক্ত ফিন্‌কি দিয়ে ঠাণ্ডা মাটির বুকের ওপর ঢেউ খেলে যাচ্ছে! কী আনন্দ! লাল—লাল রক্ত I love it! I like it.

ইতি—

তোমার একান্ত শুভার্থী

কাকা দিগেন্দ্রনারায়ণ

তারপর এই হচ্ছে সেক্রেটারীবাবুকে যে চিঠি লেখা হয় সেখানা, পড়ি শুনন ঃ পরের অর্থে পোদ্দারী করতে খুব আনন্দ, না? অন্যের বুকের রক্ত ঢেলে উপার্জন করা অর্থে হাসপাতাল গড়ে তুলতে চলেছ! Idea টা চমৎকার বন্ধু! বোকা ভাইপোটির মাথায় হাত বোলাবার চমৎকার উপায় একটি বের করেছ তো! প্রস্তুত থেকো, কাল তোমারও তামাম শোধের দিন ধার্য করেছি। —রক্তলোভী 'দিগেন্দ্রনারায়ণ'।

চিঠি দুখানা পড়া শেষ করে, আবার সে দুটো ভাঁজ করে পকেটে রাখতে রাখতে কিরীটী বলে, এখন বোধ হয় সুব্রত বুঝতে পারছ, এখানে আসবার সময় কেন লোকজন সঙ্গে নিয়ে প্রস্তুত হয়ে এসেছিলাম! এই চিঠি দুখানা আজ দুপুরেই কুমারসাহেব আমাকে পৌঁছে দিয়ে এসেছিলেন।

বটে! এই ব্যাপার! ডাক্তার বলতে লাগলেন, ব্যাপারটা তো তাহলে এই দাঁড়াচ্ছে যে মিঃ শুভঙ্কর মিত্রের একটা অ্যাপয়েন্টমেন্ট ছিল রাত্রি সাড়ে নটায়। তারপর তিনি কফি চেয়ে পাঠান, এবং ঠিক রাত্রি সাড়ে নটায় তিনি কুমারসাহেবের প্রাইভেট রুমে পূর্ববর্ণিত অ্যাপয়েন্টমেন্ট রক্ষা করতে গিয়ে উপস্থিত হন। কেমন তো?

হ্যাঁ, এবং তারই অল্পক্ষণ পরে ঘণ্টা বেজে ওঠে, সে কথাটা ভুলবেন না যেন। কিরীটী বলে ওঠে ওঁর কথার মধ্যে বাধা দিয়ে।

না, ঘণ্টা বেজেছিল তা ভুলিনি। খুনী ঘণ্টা বাজবার আগে থেকেই সে ঘরে উপস্থিত ছিল এবং তলোয়ারটা খুন করবার জন্য তৈরী করেই বড় সোফাটার নীচ লুকিয়ে রেখেছিল। Everything was kept ready —পূর্বপরিকল্পিত।

হ্যাঁ, কিন্তু এখন বলুন তো ডাক্তার, কোন দরজা দিয়ে খুনী তাহলে ঘরে গিয়ে ঢুকল?

কেন, দুটা দরজার যে কোনটা দিয়েই তো ঢুকতে পারে.... ভুলে যাচ্ছ কেন এ কথাটা যে আমি বলেছি যে, খুনী ঢের আগে থেকেই সে ঘরে উপস্থিত ছিল।

বেশ। কিন্তু এবার বলুন তো ডাক্তার, তাহলে ঘরের কোন দরজা দিয়ে খুনী খুন করে বেরিয়ে গেল? কারণ যখন দেখতে পাচ্ছি খুনের ঠিক পরই আমরা কেউ তাকে সে ঘরে গিয়ে খুঁজে পেলাম না!

কিরীটীর প্রশ্নে সহসা ডাক্তার চুপ করে গেলেন। মনে হল যেন তিনি অত্যন্ত বিব্রত হয়ে পড়েছেন। তাঁর এই বিব্রত ভাব দেখে আমি বললাম, ডাঃ চট্টরাজ, আমি এই কথাটাই আপনাকে তখন বলতে চাইছিলাম কিন্তু।

দাঁড়ান! দাঁড়ান! ডাক্তার অসহিষ্ণু কণ্ঠে বলে উঠলেন, খুনী হলঘরের সঙ্গে ওই ঘরে

যাতায়াত করবার জন্য যে দরজা আছে, সে দরজা দিয়ে বের হয়নি ; কারণ যেখানে আপনার নিযুক্ত লোক প্রহরায় ছিল এবং সেখানে থেকেই সে সর্বদা হলঘরের নজর রেখেছিল, কেমন এই তো আপনার যুক্তি?

খুনী এই ঘর অর্থাৎ এই ড্রয়িংরুমের দরজা দিয়েও বাইরে যায়নি। কারণ যেহেতু এ দরজার ওপর আমি নজর রেখেছিলাম, ঠিক যে মুহূর্তে আমি শুভঙ্কর মিত্রকে ঘরে ঢুকতে দেখি তারপর থেকেই সর্বক্ষণ, কেমন তো? আচ্ছা, তাহলে ডাক্তার এমন কি হতে পারে না যে, এই ব্যাপারটার মধ্যেই অর্থাৎ দরজার ওপর আমাদের নজর থাকা সত্ত্বেও একটা রীতিমত গোলমাল বা রহস্য লুকিয়ে আছে যা আপাতত আমাদের কারও দৃষ্টিতে আসছে না! কিন্তু আমি সত্যই আশ্চর্য হচ্ছি—এমন সহজ গোলমালটা আপনাদের বা সুব্রতর চোখে পড়ছে না কেন? কেন আপনার ধরতে বা বুঝতে এত কষ্ট হচ্ছে?

আমরা কিরীটী কথায় কোন জবাবই দিলাম না।

হাসতে হাসতে কিরীটী বলতে লাগল, তবে শুনুন। আপনারা জানেন ঐ ঘরে যাতায়াত করবার দু-ঘর দিয়ে দুটি দরজা আছে। একটি হলঘর দিয়ে, অন্যটি এই ঘর অর্থাৎ এই ড্রয়িং রুম দিয়ে, কেমন তো? এখন একটা দরজায় পাহার দিচ্ছিল হরিচরণ, অন্যটায় আমি নিজে। নিজেকে আমি যতটা বিশ্বাস করি, আমার সহকারী হরিচরণকে বা তার কথাও ঠিক ততখানিই আমি বিশ্বাস করি। ঐ দুটো দরজার কোনটি দিয়েই কেউ বের হয়ে গেলে, আমার বা হরিচরণের চোখকে ফাঁকি দেবার তার সাধ্য ছিল না। তাছাড়া ঐ প্রাইভেট ঘরের একটিমাত্র জানলাও আমি পরীক্ষা করে দেখেছি খুব ভাল করেই। নীচেই তার ট্রাম রাস্তা, এখনও হয়েতো সে পথে লোকজন যাতায়াত করছে, তখন তো করছিলই। জানালার নীচে যে ধূলার পরত জমে আছে, তাও আমি পরীক্ষা করে দেখেছি। কোন সামান্য এতটুকু দাগ বা চিহ্ন পর্যন্ত সেখানে দেখতে পাইনি। আর বিশেষ করে জানালা থেকে ঘরের ব্যবধান প্রায় চল্লিশ ফিট হবে বলে মনে হয়। মানুষ তো দূরের কথা কোন বানরের পক্ষেও এই পথ দিয়ে যাতায়াত করা একেবারেই দুঃসাধ্য। অসম্ভব বললেও অত্যুক্তি হয় না। এবং ঘরেও কেউ লুকিয়ে ছিল না, সে তো আমারা নিজ চক্ষেই পরীক্ষা করে দেখেছি। অথচ সব চাইতে মজার ব্যাপার হচ্ছে খুনী অন্যের অলক্ষ্যে ঘরে প্রবেশ করে, তরপর খুন করে আবার অন্যের অলক্ষ্যেই বেমালুম গা-ঢাক দিয়ে ঘর থেকে চলে গেল ; ঠিক যেমন আজ সন্ধ্যায় কুমারসাহেবকে আবছা ছায়ার মত ভয় দেখিয়েই স্যার দিগেন্দ্র হাওয়ার সঙ্গে মিলিয়ে গেলেন—অনেকটা সেই রকম। এর পরেও কি ডাক্তার আপনি বলবেন বা আপনার স্থিরবিশ্বাস যে এই ব্যাপারটাও একটা কল্পনাপ্রসূত ছায়াছবি মাত্র, অর্থাৎ আপনাদের ডাক্তারী ভাষায় haliucination !

উঃ অসহ্য, ক্ষোভে দুঃখে ডাক্তার বলে উঠলেন, অসহ্য! কিন্তু আমিও নিশ্চয় করে বলছি রায়, খুনী নিশ্চয়ই ঘরের মধ্যে লুকিয়েছিল। এবং আপনার অগাধ বিশ্বাসের পাত্র হরিচরণ হয় আসল ব্যাপার দেখতে পায়নি বা মিথ্যা বলছে, আর তা যদি না হয় বা আপনি তা মেনে নিতে না চান, তবে I must say, ঐ ঘরে নিশ্চয়ই কোন গুপ্তদ্বার আছে যে পথ দিয়ে সে ঘরের মধ্যে ঢুকে খুন করে চলে গেছে।

না উত্তেজিত হবেন না ডাক্তার। ধীর গম্ভীর অচঞ্চল স্বরে কিরীটী বললে, খুনী লুকোয়নি আদপেই। আমি যা দেখছি তাও যেমন মিথ্যা নয়, হরিচরণের কথাও মিথ্যা নয় ; এবং

ঐ ঘরে কোন গুপ্তদ্বার থাকাও একেবারেই সম্ভবপর নয়। আমার কথায় বিশ্বাস না হয় নিজে গিয়ে ভাল করে দেখে আসতে পারেন আর একবার। ঘরের এক দিকে রাস্তা, আর একদিকে হলঘর, ওপরে তিনতলার ঘর, তার ওপরে খোলা ছাদ। এদিকে এই ড্রয়িংরুম, অন্যদিকে খাবার ও রান্নাঘর। তবে এর মধ্যে ভেবে দেখুন কোন গুপ্তপথ থাকা সম্ভব কিনা। এক কথায় ঘরের মধ্যে কোন গুপ্তপথ নেই। এবং সে জানলাপথেও পালায়নি, হলঘরের দরজা বা এই ড্রয়িংরুমের কোনটা দিয়েই বের হয়ে যায়নি। এবং এখনও ঘরের মধ্যে খুনী লুকিয়ে নেই। আসল কথা কি জানেন?

কিরীটীর মুখের দিকে সোৎসুকভাবে চেয়ে একই সঙ্গে আমরা দুজনেই উদ্‌গ্রীব কণ্ঠে প্রশ্ন করলাম, কী?

তবে শুনুন, আমরা যখন এখানে আসি তার ঢের আগেই খুনী তারকাজ শেষ করে গা-ঢাকা দিয়ে চলে গেছে। তাই আমরা কেউ তাকে দেখতে পাইনি ও-ঘর থেকে বেরিয়ে আসতে। এবং দেহ ও মণ্ডুর position টা দেখে এটাও বুঝতে পারা কঠিন নয় যে, ব্যাপারটা আদৌ আত্মহত্যা নয়। সহজ ও প্রাঞ্জল খুন—a murder ! ...হ্যাঁ খুন!

পরে অবশ্য বুঝেছিলাম কিরীটীর কথাটা কতখানি সত্য! ....এবং কত কঠিন সত্য!

কিন্তু এ কি নিদারুণ বিস্ময়! চোখের ওপর যেন ভাসতে থাকে একটা অশরীরী ছায়া, যে ছায়া এ বাড়ির প্রতিটি লোকের কাছে সুপরিচিত। যাকে তিলমাত্র কেউ সন্দেহ করে না। যে যেন একটা মুখোশ এঁটে এই হৃদয়হীন কাজটা করে গেল। দয়া নেই, মায়া নেই। নেই এতটুকু বিবেক বিবেচনা। নির্মম খুন। পাশবিক লালসা। কে, কে? অথচ এই সমস্ত পরিচিতের মধ্যেই সেও একজন। কিরীটী বলেছে সকলেরই পরিচিত সে। তবে সে কে? আমি? কিরীট? ডাঃ চট্টরাজ? কুমারসাহেব নিজে? ম্যানেজারবাবু? বিকাস মল্লিক? দিনতারণ চৌধুরী? না প্রফেসার শর্মা? কে? কে? কে?

এমন সময় হরিচরণ ঘরে এসে প্রবেশ করল। কয়েকটা খোলা কাগজ ও একটা বই তার হাতের মধ্যে ধরা আছে। হরিচরণ বললে, এই নিন স্যার, এখানে আজ যাঁরা উপস্থিত আছেন তাঁদের সকলেরই জবানবন্দি এই কাগজে টুকে এনেছি, এমন কি চাকরবাকরদেরও। আর এই নিন বই। বাবুজীকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম, কিন্তু সেও বলতে পারল না কে এই বইটা সেখানে ফেলে রেখে গেছে। কিন্তু একথা সে বললে হলফ করে যে বিকালে এই বই সে ঘরে দেখেনি। আমন্ত্রিত ভদ্রলোকদের এবারে আপনি ছেড়ে দিতে পারেন স্যার। আমার মনে হয় তাঁদের কাছ থেকে আর বিশেষ কোন খবর পাওয়া যাবে না।

হুঁ। আশ্চর্য! কিরীটী গম্ভীরভাবে বলতে লাগল, কিন্তু এই ছোট-একটা 'রূপকথা' কে এখানে নিয়ে এল? ভাল কথা হরিচরণ, এই বইটা যাঁরা এখানে নিমন্ত্রিত হয়ে এসেছেন তাঁদের কারও কিনা জিজ্ঞাসা করে একবার দেখেছিল কী?

হ্যাঁ, তাও করেছিলাম স্যার। কেউই বললেন না যে, এটা তাঁর বই বা বইটা কেউ সঙ্গে করে এখানে নিয়ে এসেছেন!

অন্যমনস্ক ভাবে কিরীটী বইয়ের পাতাগুলো ওল্টাতে লাগল। কলকাতার ৫নং কলেজ স্কোয়ারের, আশুতোষ লাইব্রেরী কর্তৃক ছাপা বইয়ের প্রথম পাতায় যেন কার নাম হিন্দীতে লেখা ছিল ; কিন্তু তারপর রবার দিয়ে ঘষে ঘষে আবার সেটা যেন বেশ যত্ন সহকারেই মুছে ফেলা হয়েছে।

সহসা ডাক্তারের দিকে ঝুঁকে পরে কিরীটী বললে, ডাক্তার, আপনি তো হিন্দী জানেন? দেখুন তো কি নাম লেখা ছিল বইটাতে? ইতিমধ্যে হরিচরণের জবানবন্দি নেওয়া কাগজগুলো একটু আমি উল্টেপাল্টে দেখে নিই।

কিরীটী হরিচরণের হাত থেকে কাগজগুলো নিয়ে মনোযোগের সঙ্গে পড়তে লাগল এবং মাঝে মাঝে নোট-বুকটা বের করে কী সব তাতে নোট করে নিতে লাগল। ডাক্তারের দিকে চেয়ে দেখলাম, ডাক্তার গম্ভীর হয়ে চশমার ভিতর দিয়ে বইয়ের প্রথম পাতায় মুছে দেওয়া অস্পষ্ট নামের লেখাটাকে উদ্ধার করবার বৃথা চেষ্টা করছেন। ক্রমে যেন মনে হচ্ছিল একটা বিস্ময়ের ভাব তাঁর চোখে-মুখে ফুটে উঠছে একটু একটু করে। তারপর সেই পাতাটা উল্টে কী যেন মনোযোগের সঙ্গে পাতার দিকে দেখতে লাগলেন।

কিরীটীর কাগজটা দেখা হয়ে গিয়েছিল, হরিচরণের দিকে চেয়ে বললে, হরিচরণ, আজ এখানে যাঁরা উপস্থিত আছেন, তাঁদের প্রত্যেকের ওপরেই একজন করে লোক যেন আমার দ্বিতীয় আদেশ না পাওয়া পর্যন্ত নজর রাখে। আর এখুনি একজন লোকের বন্দোবস্ত কর, টালার শুভঙ্কর মিত্রের বাড়িতে পাহারা দেবার জন্য। চব্বিশ ঘণ্টা পাহারা থাকবে। কোনক্রমেই কোন লোককে সে বাড়িতে যেন ঢুকত বা বাড়ি থেকে বের হতে দেওয়া না হয়। কেউ যদি ঢুকতে চায় বা বের হতে চায় বাধা দেবে। বাধা না শুনলে গ্রেপ্তার করবে।

হরিচরণ মাথা হেলিয়ে বলল, তাই হবে স্যার.

এইবার কিরীটী তার এতক্ষণ লেখা নোটটা আমাদের চোখের সামনে মেলে ধরল, তাতে এইরূপ লেখা আছে ঃ

৮-১০ মিঃ রাত্রি—মিঃ শুভঙ্কর মিত্র, কুমারসাহেব, প্রফেসার কালিদাস শর্মা, দীনতারণ চৌধুরী—এঁরা সকলে কুমারসাহেবের সয়নঘরে কী একটা পরামর্শ করছিলেন। বয় কফি দিয়ে আসতে গিয়ে দেখেছিল ওঁদের সকলকেই ও ঘরে।

৮-২০ মি- রাত্রি—দীনতারণ চৌধুরী এখান থেকে চলে যান ; ম্যানাজারবাবু ও দারোয়ান তাঁকে দেখেছে।

৮-২৫ মিঃ—৮-৫৫ মিঃ—মিঃ শুভঙ্কর মিত্র ও প্রফেসার কালিদাস শর্মা দুজনে খাবার ঘরে বসে গোপনে কী সব কথাবার্তা বলছিলেন, বাবুর্চি তাঁদের দেখেছিল। কারণ সে সময় বেয়ারা না থাকায় বাবুর্চিই নিজে তাঁদের গরম কফি দিতে গিয়েছিল!

৮-৫০ কি ৫২ মিঃ—কুমারসাহেবের সঙ্গে সিঁড়িতে ম্যানেজারবাবুর দেখা হয়। ম্যানেজারবাবুই একথা বলেছেন আমাদের।

৮-৫০ মিঃ—৯-২৫ মিঃ—ম্যানেজারবাবু একাই ওপরের সিঁড়ির কাছে দাঁড়িয়েছিলেন, ম্যানেজারবাবুর স্বীকারোক্তি থেকে জানতে পারা যায়!

৮-৫৫ মিঃ—৯-৫৫ মিঃ মিত্র খাবার ঘরে থেকে বের হয়ে আসেন। সাক্ষী—বাবুর্চি ও প্রফেসার শর্মা।

৮-৫৫ মিঃ—৯-৩০ মিঃ—প্রফেসার শর্মা খাবার ঘরে উপস্থিত ছিলেন ; সাক্ষী—প্রফেসার শর্মা নিজে। তাছাড়া একজন বয়ও সে কথা বলেছে।

৯-১৫ মিঃ সময়ে নাকি এক কাপ কফি বয় নিজে গিয়ে প্রফেসার শর্মাকে দিয়ে আসে।

৯-১৮ মিঃ রাত্রি—কুমারসাহেব নিজে আমাদের সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন। সাক্ষী—আমরা

BanglaBook.org

সকলে।

৯-৩০ মিঃ রাত্রি—মিঃ মিত্র কুমারসাহেবের প্রাইভেট রুমে ঢোকেন আমাদের সকলেরই চোখের সামনে দিয়ে।

৯-৩০ মিঃ রাত্রি—প্রফেসার শর্মা হরিচরণের সঙ্গে কথা বলছিলেন। এবং প্রফেসার শর্মা যখন হরিচরণকে সময় সম্পর্কে প্রশ্ন করেন, হরিচরণ জবাব দেয় এবং তারই কিছু আগে সে ঐখানে আমার আগেকার নির্দেশমত পাহারা দিতে উপস্থিত হয়। সাক্ষী—হরিচরণ ও ম্যানেজারবাবু, কেননা উনি ঐ সময় সিঁড়ির ওপরেই দাঁড়িয়েছিলেন!

৯-৩০—৯-৩৬ মিঃ রাত্রি—প্রফেসার শর্মার সঙ্গে প্রাইভেট রুমের দরজার সামনে হরিচরণের দেখা ও কথাবার্তা হয়।

৯-৩৭ মিঃ রাত্রি—প্রফেসার শর্মা ড্রয়িংরুমে আমাদের সঙ্গে এসে আলাপ করেন। খুনের ব্যাপারটা বেয়ারার চিৎকার শুনে এ ঘরের সবাই আমরা জানতে পারি।

মতামত বা টীকা ১নং —এমন কোন লোকই পাওয়া যাচ্ছে না যিনি অন্ততঃ স্মরণ করে বলতে পারেন যে, ঐ উপরিউক্ত ভদ্রলোকের মধ্যে কাউকেও ৮-২০ মিঃ থেকে ৯-৩০ মিনিটের মধ্যে অর্থাৎ এই এক ঘণ্টারও বেশী সময়ের মধ্যে ওপরের হলঘরে দেখেছেন কিনা। আশ্চর্য!

২নং—এ বাড়িতে উপস্থিত যাঁরা আছেন তাঁদের কেউ বলেত পারছেন না যে, তাঁরা কেউ মিঃ শুভঙ্কর মিত্রকে রাত্রি ৮-৫৫ মিঃ (যখন তিনি খাবার ঘর থেকে প্রফেসার শর্মার কাছে বিদায় নিয়ে বেরিয়ে আসেন তখন) কিংবা ৯-৩০ মিনিটের মধ্যে প্রাইভেট রুমে ঢুকতে দেখেছেন কিনা! এটাও আশ্চর্য!

৩নং —এটা হয়তো খুবই সম্ভব যে, এ বাড়ির পিছন দিকে অর্থাৎ ট্রাম-রাস্তার দিকে এ বাড়িতে প্রবেশের কোন গুপ্তপথ আছে, এবং সেই প্রবেশপথের কথা আমার নিযুক্ত লোক খুনের আগে পর্যন্ত অবগত না হওয়ার জন্য পাহারা দিতে পারেনি সেখানে।

কিরীটী হাসতে হাসতে নোট-খাতাটা ডাঃ চট্টরাজের দিকে এগিয়ে দিয়ে মৃদুস্বরে বললে, এবারে বের করুন ডাক্তার, হত্যাকারী কে? যা কিছু জানবার বা বোঝাবার সব এর মধ্যেই আছে।

এমন সময় একজন পুলিস এসে জানাল, পুলিস সার্জেন্ট এসেছেন। আমরা সকলে হলঘরের দিকে অগ্রসর হলাম।

॥ আট ॥

হলঘরে ঢুকেই আমরা থমকে দাঁড়ালাম।

সমগ্র হলঘরটি তখন আমন্ত্রিত অভ্যাগতের কলগুঞ্জনে মুখরিত। কিরীটী একজন পুলিস অফিসারকে ডেকে তখনি আদেশ দিল, এদের সকলকে এবার ছেড়ে দিন।

আদেশ উচ্চারিত হবার সঙ্গে সঙ্গে সমগ্র জনতা যেন বাঁধভাঙা জলস্রোতের মত উন্মুক্ত দ্বারপথের দিকে হুড়মুড় করে অগ্রসর হল। পনেরো মিনিটের মধ্যেই জনস্রোত মিলিয়ে গেল।

সিঁড়ির মুখে প্রকাণ্ড ওয়াল্‌ক্লকটা ঢং ঢং করে রাত্রি বারোটা ঘোষণা করল।

এখন হলঘরের মধ্যে দাঁড়িয়ে আমি, কিরীটী, ডাক্তার চট্টরাজ, থানার পুলিস অফিসাররা,

সহসা ডাক্তারের দিকে ঝুঁকে পরে কিরীটী বললে, ডাক্তার, আপনি তো হিন্দী জানেন? দেখুন তো কি নাম লেখা ছিল বইটাতে? ইতিমধ্যে হরিচরণের জবানবন্দি নেওয়া কাগজগুলো একটু আমি উল্টেপাল্টে দেখে নিই।

কিরীটী হরিচরণের হাত থেকে কাগজগুলো নিয়ে মনোযোগের সঙ্গে পড়তে লাগল এবং মাঝে মাঝে নোট-বুকটা বের করে কী সব তাতে নোট করে নিতে লাগল। ডাক্তারের দিকে চেয়ে দেখলাম, ডাক্তার গম্ভীর হয়ে চশমার ভিতর দিয়ে বইয়ের প্রথম পাতায় মুছে দেওয়া অস্পষ্ট নামের লেখাটাকে উদ্ধার করবার বৃথা চেষ্টা করছেন। ক্রমে যেন মনে হচ্ছিল একটা বিস্ময়ের ভাব তাঁর চোখে-মুখে ফুটে উঠছে একটু একটু করে। তারপর সেই পাতাটা উল্টে কী যেন মনোযোগের সঙ্গে পাতার দিকে দেখতে লাগলেন।

কিরীটীর কাগজটা দেখা হয়ে গিয়েছিল, হরিচরণের দিকে চেয়ে বললে, হরিচরণ, আজ এখানে যাঁরা উপস্থিত আছেন, তাঁদের প্রত্যেকের ওপরেই একজন করে লোক যেন আমার দ্বিতীয় আদেশ না পাওয়া পর্যন্ত নজর রাখে। আর এখুনি একজন লোকের বন্দোবস্ত কর, টালার শুভঙ্কর মিত্রের বাড়িতে পাহারা দেবার জন্য। চব্বিশ ঘণ্টা পাহারা থাকবে। কোনক্রমেই কোন লোককে সে বাড়িতে যেন ঢুকতে বা বাড়ি থেকে বের হতে দেওয়া না হয়। কেউ যদি ঢুকতে চায় বা বের হতে চায় বাধা দেবে। বাধা না শুনলে গ্রেপ্তার করবে।

হরিচরণ মাথা হেলিয়ে বলল, তাই হবে স্যার.

এইবার কিরীটী তার এতক্ষণ লেখা নোটটা আমাদের চোখের সামনে মেলে ধরল, তাতে এইরূপ লেখা আছে ঃ

৮-১০ মিঃ রাত্রি—মিঃ শুভঙ্কর মিত্র, কুমারসাহেব, প্রফেসার কালিদাস শর্মা, দীনতারণ চৌধুরী—এঁরা সকলে কুমারসাহেবের সয়নঘরে কী একটা পরামর্শ করছিলেন। বয় কফি দিয়ে আসতে গিয়ে দেখেছিল ওঁদের সকলকেই ও ঘরে।

৮-২০ মি- রাত্রি—দীনতারণ চৌধুরী এখান থেকে চলে যান ; ম্যানাজারবাবু ও দারোয়ান তাঁকে দেখেছে।

৮-২৫ মিঃ—৮-৫৫ মিঃ—মিঃ শুভঙ্কর মিত্র ও প্রফেসার কালিদাস শর্মা দুজনে খাবার ঘরে বসে গোপনে কী সব কথাবার্তা বলছিলেন, বাবুর্চি তাঁদের দেখেছিল। কারণ সে সময় বেয়ারা না থাকায় বাবুর্চিই নিজে তাঁদের গরম কফি দিতে গিয়েছিল!

৮-৫০ কি ৫২ মিঃ—কুমারসাহেবের সঙ্গে সিঁড়িতে ম্যানেজারবাবুর দেখা হয়। ম্যানেজারবাবুই একথা বলেছেন আমাদের।

৮-৫০ মিঃ—৯-২৫ মিঃ—ম্যানেজারবাবু একাই ওপরের সিঁড়ির কাছে দাঁড়িয়েছিলেন, ম্যানেজারবাবুর স্বীকারোক্তি থেকে জানতে পারা যায়!

৮-৫৫ মিঃ—৯-৫৫ মিঃ মিত্র খাবার ঘরে থেকে বের হয়ে আসেন। সাক্ষী—বাবুর্চি ও প্রফেসার শর্মা।

৮-৫৫ মিঃ—৯-৩০ মিঃ—প্রফেসার শর্মা খাবার ঘরে উপস্থিত ছিলেন ; সাক্ষী—প্রফেসার শর্মা নিজে। তাছাড়া একজন বয়ও সে কথা বলেছে।

৯-১৫ মিঃ সময়ে নাকি এক কাপ কফি বয় নিজে গিয়ে প্রফেসার শর্মাকে দিয়ে আসে।

৯-১৮ মিঃ রাত্রি—কুমারসাহেব নিজে আমাদের সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন। সাক্ষী—আমরা

BanglaBook.org

সকলে।

৯-৩০ মিঃ রাত্রি—মিঃ মিত্র কুমারসাহেবের প্রাইভেট রুমে ঢোকেন আমাদের সকলেরই চোখের সামনে দিয়ে।

৯-৩০ মিঃ রাত্রি—প্রফেসার শর্মা হরিচরণের সঙ্গে কথা বলছিলেন। এবং প্রফেসার শর্মা যখন হরিচরণকে সময় সম্পর্কে প্রশ্ন করেন, হরিচরণ জবাব দেয় এবং তারই কিছু আগে সে ঐখানে আমার আগেকার নির্দেশমত পাহারা দিতে উপস্থিত হয়। সাক্ষী—হরিচরণ ও ম্যানেজারবাবু, কেননা উনি ঐ সময় সিঁড়ির ওপরেই দাঁড়িয়েছিলেন!

৯-৩০—৯-৩৬ মিঃ রাত্রি—প্রফেসার শর্মার সঙ্গে প্রাইভেট রুমের দরজার সামনে হরিচরণের দেখা ও কথাবার্তা হয়।

৯-৩৭ মিঃ রাত্রি—প্রফেসার শর্মা ড্রয়িংরুমে আমাদের সঙ্গে এসে আলাপ করেন। খুনের ব্যাপারটা বেয়ারার চিৎকার শুনে এ ঘরের সবাই আমরা জানতে পারি।

মতামত বা টীকা ১নং —এমন কোন লোকই পাওয়া যাচ্ছে না যিনি অন্ততঃ স্মরণ করে বলতে পারেন যে, ঐ উপরিউক্ত ভদ্রলোকের মধ্যে কাউকেও ৮-২০ মিঃ থেকে ৯-৩০ মিনিটের মধ্যে অর্থাৎ এই এক ঘণ্টারও বেশী সময়ের মধ্যে ওপরের হলঘরে দেখেছেন কিনা। আশ্চর্য!

২নং—এ বাড়িতে উপস্থিত যাঁরা আছেন তাঁদের কেউ বলেত পারছেন না যে, তাঁরা কেউ মিঃ শুভঙ্কর মিত্রকে রাত্রি ৮-৫৫ মিঃ (যখন তিনি খাবার ঘর থেকে প্রফেসার শর্মার কাছে বিদায় নিয়ে বেরিয়ে আসেন তখন) কিংবা ৯-৩০ মিনিটের মধ্যে প্রাইভেট রুমে ঢুকতে দেখেছেন কিনা! এটাও আশ্চর্য!

৩নং —এটা হয়তো খুবই সম্ভব যে, এ বাড়ির পিছন দিকে অর্থাৎ ট্রাম-রাস্তার দিকে এ বাড়িতে প্রবেশের কোন গুপ্তপথ আছে, এবং সেই প্রবেশপথের কথা আমার নিযুক্ত লোক খুনের আগে পর্যন্ত অবগত না হওয়ার জন্য পাহারা দিতে পারেনি সেখানে।

কিরীটী হাসতে হাসতে নোট-খাতাটা ডাঃ চট্টরাজের দিকে এগিয়ে দিয়ে মৃদুস্বরে বললে, এবারে বের করুন ডাক্তার, হত্যাকারী কে? যা কিছু জানবার বা বোঝাবার সব এর মধ্যেই আছে।

এমন সময় একজন পুলিস এসে জানাল, পুলিস সার্জেন্ট এসেছেন। আমরা সকলে হলঘরের দিকে অগ্রসর হলাম।

॥ আট ॥

হলঘরে ঢুকেই আমরা থমকে দাঁড়ালাম।

সমগ্র হলঘরটি তখন আমন্ত্রিত অভ্যাগতের কলগুঞ্জনে মুখরিত। কিরীটী একজন পুলিস অফিসারকে ডেকে তখনি আদেশ দিল, এদের সকলকে এবার ছেড়ে দিন।

আদেশ উচ্চারিত হবার সঙ্গে সঙ্গে সমগ্র জনতা যেন বাঁধভাঙা জলস্রোতের মত উন্মুক্ত দ্বারপথের দিকে হুড়মুড় করে অগ্রসর হল। পনেরো মিনিটের মধ্যেই জনস্রোত মিলিয়ে গেল।

সিঁড়ির মুখে প্রকাণ্ড ওয়ালক্লকটা ঢং ঢং করে রাত্রি বারোটা ঘোষণা করল।

এখন হলঘরের মধ্যে দাঁড়িয়ে আমি, কিরীটী, ডাক্তার চট্টরাজ, থানার পুলিস অফিসাররা,

কুমারসাহেব, পুলিস সার্জেন্ট, খানসামা ও বেয়ারা-বাবুর্চির দল।

পুলিস সার্জেন্টই প্রথম ঘরের স্তব্ধতা ভঙ্গ করলেন, বললেন, চলুন মিঃ রায়, মৃতদেহটা আগে দেখে আসি।

সকলে আবার এসে কুমারসাহেবের প্রাইভেট রুমে প্রবেশ করলাম। জমাট বাঁধা রক্তস্রোতের মধ্যে একই ভাবে বীভৎস মুণ্ডুহীন মৃতদেহটা তখনও পড়ে আছে। এবং পাশেই মুণ্ডুটা।

পুলিস সার্জেন্ট মোটামুটি সব শুনে ও মৃতদেহ পরীক্ষা করে সঙ্গে একজন কর্মচারীকে মৃতদেহ ময়নাতদন্তের জন্য পাঠাবার আদেশ দিলেন।

পুলিস সার্জেন্ট বললেন, এবার মিঃ রায়, আমাকে ব্যাপারটা একটু বলুন তো?

কিরীটী তখন পুলিস সার্জেন্টকে মোটামুটি সব ব্যাপারটাই সংক্ষেপে আবার বললে তাঁর জ্ঞাতার্থে।

তারপর আমার দিকে ফিরে বললে, সুব্রত, তুমি তেতলায় গিয়ে ঠিক এই ঘরের ওপরের ঘরটা একবার ভাল করে দেখে এস তো দেখি। আর হরিচরণ, তুমি এর নীচের ঘরটা পরীক্ষা করে এস। হ্যাঁ, দেখ সুব্রত, তুমি এই ঘরের ঠিক ওপরের তলার ঘরে গিয়ে ঘরের মেঝেতে কোন কিছু দিয়ে ঠুকে শব্দ করবে, তা হলেই এই ঘরে দাঁড়িয়ে সে শব্দ আমরা শুনতে পাব। আর তুমি নিজেও ঘরের মেঝেতে কান পেতে শুনতে চেষ্টা করবে আমাদের কথাবার্তা শুনতে পাও কিনা। ঘরের দেওয়ালে ঘা দিয়ে দেখবে কোথাও ফাঁপা-টাপা কিছু টের পাও কিনা। হরিচরণ, তুমিও ঐ একই ভাবে নীচের ঘরটা পরীক্ষা করে দেখবে! আমি ততক্ষণ এই ঘরটা আবার একবার ভাল করে পরীক্ষ করে দেখে সন্দেহ ভেঙে দিই সবার। যিনি যাই বলুন, আমার নিশ্চিত ধারণা, ওঘরের মধ্যে কোথাও কোন গুপ্তদ্বার নেই। শুধুই নিষ্ফল চেষ্টা এ, তবু আর একবার দেখব। প্রত্যেকটি ঘটনা যদি ভাল করে বিচার করা যায় তবে স্পষ্টই বোঝা যায় যে, কোন বিকৃতমস্তিষ্ক ব্যক্তির দ্বারা এভাবে খুন করা সম্ভবপর নয়।

ধীরে ধীরে দোতলার সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠলাম।

কুমারসাহেবের আত্মীয়স্বজন বলতে কেউ নেই এ সংসারে। তিনতলার ঘরগুলো তাই খালিই পড়ে থাকে। মাঝে মাঝে কোন দূর-সম্পর্কীয় আত্মীয় এলে তেতলায় থাকেন। তা সেও ক্বচিৎ কখনো।

তিনতলার হলঘরে ঢোকবার মাথায়ই সিঁড়ি। সিঁড়ির দরজাটা ভেজানো! দরজার হাতল ঘুরিয়ে ঠেলতেই নিঃশব্দে দরজার কপাট দুটো ফাঁক হয়ে গিয়ে খানিকটা জমাট বাঁধা অন্ধকার চোখকে যেন অন্ধ করে দিল মুহূর্তের জন্য।

হাতের টর্চ জ্বালিয়ে চারদিকে একবার চেয়ে দেখলাম। এ হলঘরখানিও অবিকল নীচের হলঘরেরই অনুরূপ।

নিঃশব্দে একাকী সেই অন্ধকার নির্জন হলঘরের মধ্যে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলাম। চারদিক হতে জমাট বাঁধা অন্ধকার যেন অদৃশ্য হাতে আমাকে এসে বেষ্টন করে ধরছে, অনুভব করছি অন্ধকারের হিমশীতল স্পর্শ। আশ-পাশে কোথাও এতটুকু গোলমাল বা শব্দ পর্যন্ত নেই। যেন যুগযুগান্তরের তন্দ্রাচ্ছন্নতা এইখানে এসে জমাট বেঁধে আছে অতলান্ত অন্ধকারের মধ্যে।

নিজের শ্বাস-প্রশ্বাসের শব্দটুকু পর্যন্ত শোনা যায়।

এরপর কতকটা আন্দাজে ভর করে, যে ঘরটা ঠিক প্রাইভেট রুমের ওপরে হবে বলে মনে হল, সেই ঘরের দরজাটার হাতল ঘুরিয়ে খুলে ফেললাম। নিঃশব্দে দরজা খুলে গেল।

ঘরে ঢুকেই ওপরের দিকে তাকাতে স্কাই-লাইটের কাচের স্ক্রীনের ফাঁক দিয়ে তারায় ভরা শীতের আকাশের একটুকরো চোখে পড়ল। যেন একটুকরো স্বপ্ন। দূরদূরান্তের মায়ায় ঘেরা। নাগালের বাইরে।

সহসা একটা মৃদু নিশ্বাসের চাপা শব্দ আমার সজাগ কানে এসে যেন আঘাত দিল। দেহের সমগ্র লোমকূপ পর্যন্ত যেন অভাবনীয় একটা পরিস্থিতির জন্য হঠাৎ সজাগ হয়ে উঠল।

হাতে ধরা টর্চটার বোতাম আবার টিপলাম। সঙ্গে সঙ্গে অন্ধকারের বুকে সেই টর্চের আলোয় যে অভাবনীয় দৃশ্য সহসা আমার চোখে পড়ল তার জন্য ক্ষণপূর্বেও এতটুকু আমি প্রস্তুত ছিলাম না। সত্যিই চমকে উঠেছিলাম।

দেখলাম ঘরের এক কোণে একটা সোফায় মুখ নীচু করে নিঃশব্দে একটি অল্পবয়সী যুবক বসে আছে।

আমার মত সেও বোধ হয় আমার অপ্রত্যাশিত আবির্ভাবে চমকে উঠেছিল সঙ্গে সঙ্গে।

কে? কে আপনি? কী চান এ ঘরে? বলতে বলতে ভীতত্রস্তভাবে যুবকটি উঠে দাঁড়াল।

ক্ষমা করবেন, আমি আপনাকে বিরক্ত করতে এ ঘরে আসিনি। তা ছাড়া আমি ভাবতেও পারিনি এই নির্জন অন্ধকার ঘরে এমনি করে ভূতের মত চুপটি করে কেউ বসে থাকতে পারে। সত্যিই আমি একান্ত লজ্জিত। দুঃখিত মিঃ...। আমি কেবল এ ঘরের মেঝেটা একবার পরীক্ষা করে দেখবার জন্য শুধু এসেছিলাম। মানে...

কিন্তু কে আপনি? হঠাৎ এ ঘরের মেঝেটাই বা আপনি দেখতে এসেছেন কেন?

বর্তমানে আমি একজন পুলিসের সহকারী। আমি ততক্ষণে নিজেকে সামলে নিয়েছিলাম।

পুলিস! পুলিসের সহকারী! কিন্তু এখানে কেন? সে কি মরে গেছে নাকি।

যুবকের অসংলগ্ন কথায় মুহূর্তে সমগ্র ইন্দ্রিয় আমার যেন সজাগ হয়ে উঠল। কোনমতে নিজেকে সংযত করে বললাম, কার কথা বলছেন? কে মরেছে?

কে আবার, কুমারসাহেবের সেক্রেটারী মিঃ শুভঙ্কর মিত্র! একটু যেন দ্বিধাগ্রস্ত ভাবে কতকটা থেমে থেমে যুবক কথাগুলো বললে।

হ্যাঁ, মারা গেছেন তিনি সত্যি! কিন্তু আপনি যখন এতটা জানেনই, আপনাকে কয়েকটি কথা জিজ্ঞাসা না করে সুস্থির হতে পারছি না যে!

আমি কথাটা বলতে বলতে আলোটা আবার নিভিয়ে দিলাম। ঘর পূর্বের মত অন্ধকারে জমাট বেঁধে উঠল। অন্ধকারে সোফার ওপর নড়েচড়ে বসবার খসখস আওয়াজ কানে এল।

কী জিজ্ঞাসা করবেন শুনি? কণ্ঠস্বরে পরিষ্কার অসহিষ্ণুতার আভাস যেন ঝরে পড়ল, কে আপনাদের খুন হয়েছে বা মারা গেছে সেই সম্পর্কেই আপনি আমাকে আবোলতাবোল কতকগুলো অবান্তর প্রশ্ন করবেন তো? কিন্তু কেন বলুন তো? আমাকে একা একা এই

অন্ধকার ঘরে বসে থাকতে দেখে নিশ্চয়ই আপনার মনে ঐ জঘন্য ইচ্ছা জেগেছে, না?

রাগ করবেন না। যদিও আপনি রাগলেও, আমার কথার জবাব আপনাকে দিতেই হবে।

দিতেই হবে কথার জবাব? কেন শুনি? জোর নাকি?

আপনাকে তো আগেই আমি বলেছি, আমি একজন পুলিসের লোক। কাজেই...।

যুবক যেন কি ভাবলে, তারপর মৃদুকণ্ঠে বললে, বেশ, জবাব দেব। করুন, কি জিজ্ঞাসা করবার আছে আপনার! চটপট জিজ্ঞাসা করে ফেলুন। তারপর আবার একটু থেমে হঠাৎ বললে, আসুন না, চলুন ঐ জানলার কাছে গিয়ে দাঁড়ানো যাক ; বলতে বলতে যুবক উঠে দাঁড়ায়। একটা মৃদু অথচ মিষ্টি গন্ধ সহসা আমার ঘ্রাণেন্দ্রিয়কে যেন আলোড়িত করে তুলল। যুবক নিজেই এগিয়ে গিয়ে পথের ধারের জানলার কপাটটা খুলে দিল ধাক্কা দিয়ে।

মধ্যরাত্রির বর্ষণক্লান্ত শীতের আকাশ। অস্পষ্ট আলোছায়ার মধ্যে পার্শ্বের দণ্ডায়মান যুবকের দিকে ফিরে তাকালাম। আধুনিক বেশভূষায় সজ্জিত! অত্যন্ত ফিটফাট ; বয়স বোধ করি বাইশ-তেইশের মধ্যে হবে।

যুবকটিই প্রথমে কথা বললে, অন্ধকার রাত্রে নির্জন ঘরে একা একা চুপ করে বসে থাকতে আমার বড় ভাল লাগে। কিন্তু আপনাকে তো ঠিক পুলিসের লোকের মত লাগছে না। পুলিস আবার এরকম ভদ্র ও সভ্য দেখতে হয় নাকি? সত্যি চমৎকার চেহারা আপনার, যেন ঠিক গ্রীক দেবতা অ্যাপোলোর প্রতিমূর্তি। বাঙালীদের মধ্যে এত সুন্দর চেহারা বড় একটা আমি দেখিনি। সত্যি বলুন তো কে আপনি কি আপনার সত্য পরিচয়?

বলেছি তো আমি পুলিসের লোক। কিন্তু এখন আমার চেহারার বর্ণনা স্থগিত রেখে আপনার কথাগুলো বলবেন কি? আপনি এখানে কেন বসেছিলেন এমনি করে ভূতের মত একা একা? নিশ্চয়ই কারও জন্যে বসে অপেক্ষা করছিলেন, না?

বলছি। কিন্তু সত্যি বলছেন মিঃ মিত্র মারা গেছেন?

হ্যাঁ হ্যাঁ, বললাম তো মারা গেছেন। মিথ্যে কথা আজ পর্যন্ত জীবনে একটাও বলিনি। মিথ্যাকে আমি আন্তরিক ঘৃণা করি। এখন বলুন আপনার কথা।

আমিও জানি এবং টের পেয়েছি সে মারা গেছে। মৃদুস্বরে যুবকটি বললে।

কিন্তু তিনি যে মারা গেছেন, আপনি সেকথা জানলেন কি করে?

আমি যে অনুভব করছি সে মারা গেছে। হ্যাঁ, সমগ্র চেতনা দিয়ে অনুভব করছি সে মারা গেছে। আর তা না হলে—সে মারা না গেলে আমি পাগল হয়ে যাব। উঃ, কী ভালটাই তাকে একদিন আমি বেসেছি, নিজের ভাইয়ের মত অগাধ শ্রদ্ধা করেছি। যাক, সে মরেছে। অত বড় একজন 'স্পোর্টসম্যান' সে কিনা তার সব সম্মান প্রভুত্ব ছেড়ে দিয়ে শেষটায় কুমারসাহেবের মত একজন লোকের কাছে যেচে চাকরি নিল। কুমারসাহেব আমাকে দু'চক্ষেও দেখতে পারেন না, অথচ তার কী একটা জরুরী কাজ নাকি আমার সঙ্গে আছে, তাই চুপে চুপে রাত্রি নটায় আমাকে এখানে আসতে বলেছিল। তাকে আমার বড় ভাল লাগত একদিন। অত চমৎকার আবৃত্তি করতে জীবনে আর কাউকে শুনিনি। বাংলা কবিতা কী চমৎকারই না আবৃত্তি করত, কিন্তু সেই সব আবৃত্তির মধ্যে সহসা যখন এক এক সময় এক একটা হিন্দি কবিতা থেকে আবার আবৃত্তি শুরু করত, শুধু তখনই আমার বিশ্রী লাগত। যাক সে কথা, আজ যখন সকালে আমাদের বাড়িতে সে এখানে আসবার জন্য আমাকে বলতে যায়, তার মুখের ওপরে যেন অদ্ভুত একটা পরিবর্তন দেখেছিলাম—

যেন মনে হচ্ছিল তার মুখের দিকে চেয়ে, সে বুঝি পাগল হয়ে উঠেছে। তার কথামত ঠিক রাত্রি নটা বাজবার কিছু আগেই এখানে এসে আমি তার অপেক্ষায় বসে আছি। এমন সময় যেন মনে হল, আমারই ঠিক নীচের ঘরে কিসের একটা গোলমাল—

তারপর? রুদ্ধশ্বাসে প্রশ্ন করলাম।

তারপর—তারপর আমার ঠিক মনে নেই। এক সময় আস্তে আস্তে এই ঘরের দরজাটা খুলে গেল। স্পষ্ট বুঝলাম, নিঃশব্দ পদসঞ্চারে কে যেন অন্ধকারেই এই ঘরে এসে ঢুকেছে। একটা অজানিত ভয়ে সমস্ত শরীর আমার রোমাঞ্চিত হয়ে উঠল। পদশব্দেই বুঝেছিলাম, আমি যার অপেক্ষায় এখানে বসে আছি এ সেই শুভঙ্করদা নয়। অথচ ঘন অন্ধকারে বন্য পশুর মত আগন্তুক তখন ধীরে ধীরে আমার দিকে এগিয়ে আসছে। আমি স্পষ্ট বুঝতে পারছি। বরাবর আমার কাছে এসে দাঁড়িয়ে অন্ধকারেই খপ করে সে আমার ডান হাতটা হাত বাড়িয়ে চেপে ধরল ; তারপর চাপাস্বরে উত্তেজিত ভাবে বললে, বন্ধু বৃথা এত রাত্রে এখানে এখনও বসে আছ। তোমার শুভঙ্করদার সঙ্গে আজ আর দেখা হবে না, কেননা তোমার সঙ্গে দেখা করবার চাইতেও তার ঢের বড় কাজ "কালো ভ্রমরে"র সঙ্গে আছে। তারপরই যেমন সে এসেছিল তেমনিই চলে গেল।

কী, কী বললেন? তীব্র উৎকণ্ঠায় যেন আমার কণ্ঠস্বর ভেঙে পড়ল।

হ্যাঁ, বললে কালো ভ্রমরের সঙ্গে কাজ আছে। চেনেন নাকি?

কালো ভ্রমর! কালো ভ্রমর! এ কি ভয়ানক আশ্চর্য! নিজের হাতে যার মৃতদেহ নদীর জলে ভাসিয়ে দিয়ে এলাম, সত্যই কি সে তাহলে সেদিন মরেনি? আমার মনের মধ্যে যেন ঝড় বইতে শুরু করল। পাঁচ-ছয় বছর আগেকার কতকগুলো ঘটনা ছায়াছবির মতই মানসপটে বার বার ভেসে উঠে মিলিয়ে যেতে লাগল পর পর।

তারপরই সে চলে গেল? আবার প্রশ্ন করলাম যুবকটিকে।

হ্যাঁ, আর দ্বিতীয় কথাটি সে বলেনি। এদিকে সে চলে যাবার পর মনে হল, যে হাতটা সে আমার চেপে ধরেছিল, সেটা যেন কেমন ভিজে-ভিজে লাগছে। ব্যাপার কী দেখবার জন্য পকেট থেকে টর্চ বের করে জ্বালালাম। কিন্তু টর্চের আলোয় হাতের দিকে দৃষ্টি পড়তেই আতঙ্কে মুহূর্তে যেন সর্ব-শরীর আমার ঝিম ঝিম করে উঠল। তাজা লাল রক্তে আমার হাতের কবজী ও জামার আস্তিনটা রাঙা টুকটুকে হয়ে গেছে। উঃ, মাথার মধ্যে এখনো আমার কেমন করছে!

বলতে বলতে সহসা আমার সামনে তার হাত দুটো প্রসারিত করে বললে, এই দেখুন, এখনও সেই রক্তমাখা হাতের স্পর্শটুকু আমার জামার আস্তিনে সুস্পষ্ট ভাবেই বর্তমান।

আমি টর্চের আলো ফেলে দেখলাম, যুবকের দুধ-গরদের পাঞ্জাবির আস্তিনে রক্তের দাগ দারুণ বিভীষিকায় এখনো সুস্পষ্ট।

আচ্ছা, আপনি সেই লোকটিকে চিনতে পেরেছিলেন?

না, তাকে আমি জীবনে আর কোন দিনও দেখিনি। তাছাড়া ঘর অন্ধকার ছিল।

গলার স্বর আপনার কি পরিচিত বলে মনে হয়েছিল সেই লোকটার?

না, অমন অস্বাভাবিক স্বর আমি জীবনেও শুনিনি। চাপা অথচ গমগম করছে, মনে হচ্ছিল যেন বহুদূর থেকে সমুদ্রের ক্রুদ্ধ অস্পষ্ট গর্জনের মত।

কাউকে সন্দেহও করেন না?

না, না, না। আপনাকে তো আমি বলেছি, তাকে আমি চিনি না!

এতক্ষণে আমি আমার গলার স্বর কোমল থেকে কঠিন করলাম, দৃঢ়ভাবে বললাম শুনুন, আপনার কোন ভয় নেই। আপনি যা জানেন সব কিছু কথা গোপন না করে আমাকে খুলে বলুন। আপনাকে কথা দিচ্ছি, কেউ আপনাকে আঘাত করতে পারবে না। আপনার সমস্ত বিপদে আমরা বুক পেতে দাঁড়াব। আপনার কোন ভয় নেই।

দয়া করুন। অনুগ্রহ করে আমায় যেতে দিন। রাত্রি প্রায় শেষ হয়ে এল। এরপর মামার বাসায় গেলে যদি ঘুণাক্ষরেও তিনি জানতে পারেন যে আমি এতক্ষণ বাইরে ছিলাম, তবে জুতো মারতে মারতে আমাকে তাঁর বাসা থেকে দূর করে দেবেন চিরদিনের মত। আর তাছাড়া বর্তমানে কথা বলবার মত আমার দেহ ও মনের অবস্থা এতটুকুও নয়। এখন আমায় যেতে দিন। আমি প্রতিজ্ঞা করছি, আপনি যখনই ডাকবেন তখুনি আমি আপনার কাছে গিয়ে হাজির হব। আমার নাম অরুণ কর।...নং গ্রে স্ট্রীটে আমি থাকি। আমায় ছেড়ে দিন। আমি এখুনি পিছনের দরজা দিয়ে বের হয়ে বাগান দিয়ে চলে যাব, কেউ দেখতে পাবে না, বাগানে আমার সাইকেল রয়েছে!

হ্যাঁ, আমি আপনাকে যেতে দিলেও পুলিস আপনাকে জেরা করতে ছাড়বে না, তারা আপনার জবানবন্দি নেবে তবে ছাড়বে।

দুর্ভাগ্যক্রমে যখন এ ব্যাপারে জড়িয়ে পড়েছিই, জবানবন্দি আমার পুলিসকে দিতে হবে বৈকি, আর না দিলেই বা শুনছে কে? কিন্তু আজকে রাতের মত আমায় যেতে দিন।

বেশ, তাহলে আপনি এখন যেতে পারেন।

যুবক আমার নির্দেশ পাওয়া মাত্র নিঃশব্দে ঘর থেকে নিষ্ক্রান্ত হয়ে গেল।

কতক্ষণ সেই অন্ধকার হলঘরে নিঃশব্দে দাঁড়িয়েছিলাম মনে নেই, সহসা কার মৃদু স্পর্শে চমকে ফিরে চাইলাম, কে?

ভয় নেই, আমি কিরীটী। নীচে চল, রাত অনেক হয়েছে। দুজনে সিঁড়ি দিয়ে নামতে লাগলাম।

কিরীটী বললে, এই বুঝি তোমার কর্তব্যজ্ঞান সব্রত! যে কাজের জন্য তোমাকে পাঠালাম, তা একেবারে দেখতেও বেমালুম ভুলে গেলে? যাক গে, গুপ্তদ্বার যে নেই ও-ঘরে সে বিষয়ে আমরা স্থিরনিশ্চিত হয়েছি। সেই ঘরটায় আপাততঃ তালা দিয়ে রাখা হয়েছে! কিন্তু যুবকটি কে?

কিরীটীর কথা শেষ হবার পূর্বেই বলালাম, যুবকটিকে আমার এভাবে ছেড়ে দেওয়া উচিত হয়নি, এই কথাই তো এখন তুমি বলবে কিরীটী?

কিরীটী হাসতে হাসতে বললে, হ্যাঁ, নিশ্চয়ই। কিন্তু যাক, তুমি তার ঠিকানা তো রেখে দিয়েছ, সেই যথেষ্ট ; যদিও ঠিকানা তার জানবার তেমন দরকার ছিল না।

বিস্মিত কণ্ঠে প্রশ্ন করলাম, তার মানে?

ছেলেটির এক সময় প্রচুর বিষয়-সম্পত্তি ও নগদ টাকাকড়ি ছিল ; এবং মাথায় হাত বুলিয়ে দু-চারজনে যা নিয়েছে তা গিয়ে এখনও হয়তো যা ব্যাঙ্কে আছে অনেকেরই তা নেই। কিন্ত ছেলেটির এর মধ্যেই দশজনের কৃপায় জাহান্নমে গেছে। আমার চিন্তাশক্তির যদি গলদ না থাকে, তবে নিশ্চয়ই ছেলেটি আমাদের নবলব্ধ বন্ধুবর কালিদাস শর্মার বর্তমান "মনিব্যাগ"। অর্থাৎ ওরই ঘাড় ভেঙে বর্তমানে বেকার প্রফেসার বন্ধুটির আমাদের খাওয়া

থাকা ও বিলাস-ব্যসনের সমস্ত খরচ চলেছে।

অ্যাঁ! বল কি?

তাই।

*　　*　　*

সে রাতের মত মার্বেল প্যালেস থেকে বিদায় নিয়ে আমরা সকলে গাড়িতে এসে উঠে বসলাম।

রাত্রি শেষ হতে বড় বেশী দেরি নেই। একটা ঠাণ্ডা হাওয়া ঝিরঝির করে বইছে। বর্ষণক্লান্ত মেঘমুক্ত আকাশটা যেন তারার মৃদু আলোয় ঝকঝক করছে।

॥ নয় ॥

নিঃশব্দ গতিতে জনহীন রাস্তা ধরে আমাদের গাড়ি হু-হু করে ছুটে চলল। গাড়িতে বসে আনমনে ভাবছিলাম। আজ রাত্রের সমগ্র ব্যাপারগুলো একটার পর একটা এখনো যেন চোখের ওপর ভেসে বেড়াচ্ছে ছায়াছবির মত। এবং আমার সমস্ত চিন্তাকে আবর্তিত করে একটা দৃশ্য মানসপটে কেবলই ভেসে উঠতে লাগল—লাল রক্তস্রোতের যেন ঢেউ খেলে যাচ্ছে, আর সেই রক্তের ঢেউয়ের মধ্যে কালো অক্ষরে একটা নাম মাথা তুলে জেগে উঠছে, আবার পরক্ষণেই মিলিয়ে যাচ্ছে!...কালো ভ্রমর! কালো ভ্রমর!

আজ দীর্ঘ আট বছর ধরে একটা বিভীষিকার মতই ঐ নামটা যেন আমাদের পিছনে পিছনে তাড়া করে নিয়ে বেড়াচ্ছে।

কারও মুখেই কোন কথা নেই।

কিরীটী আনমনে কি ভাবছে তা সে-ই জানে।

আমাকে আমহার্স্ট স্ট্রীটে নামিয়ে দিয়ে 'শুভরাত্রি' জানিয়ে কিরীটী চলে গেল।

নিজেকে কেন জানি বড় ক্লান্ত ও অবসন্ন লাগছিল। কোনমতে গায়ের পোশাকগুলো খুলে সোজা এসে শয়নকক্ষে প্রবেশ করলাম, রাজু বোধ হয় জেগেই ছিল, আমার পদশব্দে সে শয্যায় পাশ ফিরে শুতে শুতে বললে, এত রাত পর্যন্ত কোথায় ছিলি রে সুব্রত?

বিছানার ওপরে গা-টা এলিয়ে দিতে দিতে বললাম, বন্ধু, আমাদের পুরনো বন্ধু শ্রীযুক্ত কালো ভ্রমর আবার যে আবির্ভূত হলেন নাট্যমঞ্চে!

কে? চমকে রাজু শয্যার ওপরে উঠে বসল।—কে আবির্ভূত হয়েছে?

কালো ভ্রমর। কেন, এর মধ্যেই নামটা ভুলে গেলি নাকি?

রাজু আবার শয্যার ওপরে গা এলিয়ে দিল, ঠাট্টা করবার আর সময় পেলি না! এই শেষরাত্রে এসে...যা বাথরুম থেকে মাথায় চোখে মুখে ভাল করে ঠাণ্ডা জল দিয়ে আয়। কোথায় ঘুরিস এত রাত পর্যন্ত? বলতে বলতে রাজু বেশ ভাল করে পালকের লেপটা টেনে পাশ ফিরে বোধ করি চোখ বুজল।

আমিও আর কোন কথা না বলে খোলা জানলার দিকে ফিরে শুলাম। চোখের পাতায় যেন ঘুম আসছে না।

খোলা জানলাপথে শীতের অন্ধকার রাতের একটুকরো আকাশ চোখে পড়ল। শুকতারাটা দপদপ করে জ্বলছে।

ঝিরঝির করে রাত্রিশেষের শীতল হাওয়া ঘরে এসে ঢুকছে।
ঢং ঢং ঢং—দালানের ওয়াল-ক্লকটা রাত্রি তিনটে ঘোষণা করল।
উঃ, রাত্রি তিনটে বাজে!
চোখ বুজে ঘুমোবার চেষ্টা করতে লাগলাম।
কখন একসময় ঘুমিয়ে পড়েছিলাম জানি না, পরদিন—
এই সুব্রত, ওঠ্ ওঠ্! কিরীটীর ডাকে ঘুমটা ভেঙে গেল।
কখন এলে কিরীটী? লজ্জিত স্বরে বললাম।

* * *

আকাশে বাতাসে নাকি সমগ্র পৃথিবী জুড়ে এক মহাযুদ্ধের কালো ইশারা জেগে উঠেছে। ইংলণ্ড, জার্মান ও রাশিয়ার যে যুদ্ধ আজ সমগ্র ইউরোপকে তোলপাড় করছে, শীঘ্রই নাকি সারা পৃথিবীতে সেই যুদ্ধের আগুন ছড়িয়ে পড়বে। রাজু আর সনৎদা তাই ব্যবসায় নেমেছে। এত বড় সুবর্ণ সুযোগ!

বড়বাজারের মোড়ে প্রকাণ্ড লোহার কারবার—রায় অ্যাণ্ড রায় কোম্পানী। দিবারাত্র ওরা দুজন তাই নিয়েই ব্যস্ত।

আমার ওসব ব্যবসা-ট্যাবসা ভালও লাগে না, আনন্দও পাই না ওতে, তাই কিরীটীর সঙ্গে সঙ্গেই ফিরি।

বসবার ঘরে এসে আমি আর কিরীটী দু কাপ চা ঢেলে নিলাম। চা পানের পর কিরীটী আমার দিকে তাকিয়ে বললে, চল সুব্রত, আমার সঙ্গে একটু বেরুতে হবে।

কোথায়?

চলই না দেখবে'খন। আচ্ছা সুব্রত গত রাত্রের ঘটনা সম্পর্কে তোমার নিজস্ব মতামত কী।

গত রাত্রে ঘটনাটা যে আমি তেমন বুঝে উঠতে পেরেছি একথা বললে সম্পূর্ণ মিথ্যা কথাই বলা হবে কিরীটী। তাছাড়া আমার যেন কেমন সন্দেহ হয়, গত রাত্রের ঘটনার মধ্যে এমন কোন একটা ব্যাপার সত্যিই লুকিয়েছিল যা হয়তো আমাদের কারও নজরে পড়েনি এবং অনেক ঘটনাই থাকা সম্ভব যা কারও নজরে পড়ছে না আপাততঃ।

তাহলে নিশ্চয়ই এমন ধরনের কোন একটা ব্যাপার তোমার মনে উঁকি দিয়েছে সুব্রত কালকের ঘটনাকে কেন্দ্র করে—বল না—বলছ না কেন?

কাল রাত্রে মিঃ মিত্রের হত্যা সম্পর্কে যাদের জেরা করা হয়েছিল তাদের মধ্যে দুজন বলেছেন—একজন বিকাশ মল্লিক, আর একজন অরুণ কর, যে মিঃ শুভঙ্কর মিত্র হিন্দী ভাষা জানতেন ; লিখতে, পড়তে বলতে তাঁর আটকাত না। প্রফেসার কালিদাস শর্মাকেও তুমি ঐ কথা জিজ্ঞাসা করেছিলে, কিন্তু তিনি স্পষ্টই বললেন, শুভঙ্করবাবুর হিন্দী-জ্ঞান 'করেঙ্গা' 'খায়েঙ্গা'র বেশী নয়। অর্থাৎ তাঁর মতে মিঃ মিত্রের হিন্দী-জ্ঞান আমাদেরই মত। এঁদের মধ্যে হয় অরুণ ও বিকাশবাবু, নয় প্রফেসার শর্মা মিথ্যে কথা বলেছেন নিশ্চয়ই!

চমৎকার! বাঃ সুব্রত, সত্যই আমি দেখে সুখী হয়েছি যে দিন দিন তোমার দেখবার ও বোঝবার শক্তি প্রখর হয়ে উঠছে। তুমি একদিন সত্যিকারের রহস্যভেদী হতে পারবে বন্ধু—কিন্তু এবার বল তো বন্ধু আমার, সত্যিই যদি তোমার মতে ওদের কেউ একজন মিথ্যা কথাই বলে থাকে—কেন, কী কারণে সে মিথ্যা বললে? উদ্দেশ্য কী ছিল তার?

কী জানি ভাই, তা তো বলতে পারছি না! সত্যি সত্যি একজন ভদ্র ব্যক্তি কি করে যে মিথ্যার আশ্রয় নিতে পারেন তা সহজ বুদ্ধির বাইরে। তবে আমার যা মনে হয়েছে তাই বললাম।

কিন্তু তোমার মনে হয় কি কে এদের মধ্যে মিথ্যা কথা বলতে পারে বন্ধু?

মনে হয় প্রফেসারই যেন মিথ্যা কথা বলেছেন। তারপর ধর, হিন্দী ভাষায় অনুদিত "সাত সমুদ্র তোরো নদীর পারে" বইখানা...

চমৎকার! সত্য সত্যই যে সুব্রত তুমি ভাবতে শিখেছ! বল বল! কিরীটী উৎসাহিত হয়ে ওঠে।

দেখ আমার অনুমান হয়, কুমারসাহেবের বাড়ির খাবার ঘরটায় গতরাত্রে আমন্ত্রিত অভ্যাগতদের মধ্যে বলতে গেলে কেউই একপ্রকার ঢোকেননি। কেননা খাবার বন্দোবস্ত গতরাত্রে নীচের হলঘরেই হয়েছিল এবং সে অবস্থায় দু-একজন কেউ সে ঘরে ঢুকলেও পাশের ঘরে যে বাবুর্চি ছিল তার নজরে পড়ত ; আর হয়েছিলও তাই। শুভঙ্করবাবু যখন খাবার ঘর থেকে বের হয়ে যান, বাবুর্চি দেখেছিল। সেখানে এমন বেশী লোক থাকতে পারে না যারা হিন্দীতে অনূদিত বই পড়তে সক্ষম। তাছাড়া সকলেই একবাক্যে অস্বীকার করেছেন, ও বইটা সম্পর্কে কেউ কিছু জানেন না। অথচ প্রফেসার ও শুভঙ্করবাবু দুই বন্ধু খাবার ঘরে অনেকক্ষণ উপস্থিত ছিলেন। আমার যতদূর মনে হয় শুভঙ্করবাবুই নিজে ঐ বইখানা খাবার ঘরে একটা চেয়ারের ওপর ভুলে ফেলে আসেন এবং অরুণ করের সঙ্গে দেখা করবার সময় ঐ বইখানা নিয়ে যেতেন, অরুণ করকে উত্তেজিত করে মজা দেখবার জন্য ; কেননা অরুণ কর হিন্দী ভাষা মোটেই পছন্দ করে না। সে যাই হোক, আমি এখনো বুঝে উঠতে পারছি না, সত্যি ব্যাপারটা যদি আমার অনুমান মতই হয়ে থাকে, তবে প্রফেসার শর্মা কেন বললেন না যে শুভঙ্কর মিত্রই বইখানা ঐ ঘরে ফেলে গিয়েছিলেন!

তাছাড়া আরও ভেবে দেখ, সত্যিই যদি মিঃ মিত্রই বইখানা সে ঘরে ফেলে গিয়ে থাকেন প্রফেসার শর্মা নিশ্চয় তা জানতেন, কিন্তু তিনি তা স্বীকার করলেন না, কিংবা এমনও হতে পারে প্রফেসার শর্মা নিজেই বইখানা ফেলে গিয়েছিলেন!

কিরীটী কোন জবাব দিল না। চুপ করে রইল। একটু পরে বললে, দেখ সুব্রত, আমরা যতদূর জানি ও শুনেছি শুভঙ্করবাবু একটুও ঘোর-প্যাঁচের লোক ছিলেন না। কিন্তু ঘটনাগুলো পর পর এমন ভাবে দাঁড়াচ্ছে যে, লোকটা অত্যন্ত প্যাঁচোয়া ছিলেন মনে হচ্ছে। আপাততঃ চল, একবার দীনতারণ চৌধুরীর সঙ্গে দেখা করে আসি।

বেশ চল।

দুজনে আমরা উঠে দাঁড়ালাম।

॥ দশ ॥

টালিগঞ্জেই দীনতারণ চৌধুরীর বাড়ি।

ফটকওয়ালা একটা দোতলা বাড়ি। সামনেই গেটে কালো পাথরের ওপর সোনার জলে দীনতারণ চৌধুরীর নাম লেখা।

Mr. D. C. Chowdhury
M. A. Bar-at-law.

ছোটখাটো একটা ফুলের বাগান, তারপরই বৈঠকখানা। দীনতারণবাবু বৈঠকখানা ঘরেই টেবিলের সামনে চেয়ারে বসে একরাশ কাগজপত্র চারপাশে ছড়িয়ে গভীর মনোযোগের সঙ্গে যেন কি সব দেখছিলেন। মাঝারি গোছের দোহারা চেহারা, গায়ের রং উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ, মাথা ভর্তি সুবিস্তীর্ণ টাক চকচক করছে। চোখে সোনার ফ্রেমের চশমা।

আমাদের পদশব্দে চোখ তুলে চাইলেন, কী চাই? কে আপনারা?

সুপ্রভাত। আমরা বোধ হয় মিঃ চৌধুরীর সঙ্গেই কথা বলছি! কিরীটী বললে।

হ্যাঁ, বসুন। আপনারা?

আমার নাম কিরীটী রায় ; আর ইনি আমার বন্ধু ও সহকারী সুব্রত রায়। আমরা গতরাত্রে কুমারসাহেবের সেক্রেটারীর হত্যার ব্যাপারে প্রাইভেট তদন্তভার নিয়েছি।

ও বেশ, নমস্কার। আপনাদের সঙ্গে পরিচিত হয়ে সুখী হলাম। আজ সকালের কাগজেই কুমারসাহেবের সেক্রেটারীর নিষ্ঠুর হত্যা ব্যাপার সম্পর্কে পড়েছি, ভাবছিলাম আর একটু বেলায় কুমারসাহেবের সঙ্গে একবার দেখা করতে যাব। তারপর একটু থেমে আবার বললেন, আমার অনুমান যদি ভুল না হয়ে থাকে, তবে নিশ্চয়ই আপনারা মিঃ শুভঙ্কর মিত্রের হত্যা সংক্রান্ত কোন কিছুর সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করতেই আমার এখানে এসেছেন মিঃ রায়!

হ্যাঁ। আমিই জবাব দিই।

কিরীটী বলে, আপনার সঙ্গে মিঃ মিত্রের অনেকদিন থেকেই আলাপ পরিচয় ছিল তাই না মিঃ চৌধুরী?

আজ্ঞে ঠিক তা নয়, তবে শুভঙ্করের বাপ ছিলেন আমার পরম বন্ধু। বরানগরে একসময় তাঁর মত ধনী দ্বিতীয় আর ছিল না। তাঁর বিষয়-সম্পত্তির লিগাল অ্যাড্‌ভাইসার আমিই ছিলাম। শুভঙ্করের পিতার মৃত্যুর পর থেকে আমি শুভঙ্করেরও 'লিগাল অ্যাড্‌ভাইসার' ছিলাম বটে, কিন্তু ইদানীং তার সঙ্গে দেখাসাক্ষাৎ আমার বড় একটা হত না, কারণ আমাদের সম্পর্ক শেষ হয়েছিল। তবে কানাঘুষায় শুনেছিলাম, কয়েক বছর ধরে সে অত্যন্ত যা-তা ভাবে টাকাকড়ি খরচ করতে শুরু করায় সম্পত্তি নীলামে ওঠে এবং সে প্রায় পথের ফকির হয়ে পড়ে। অবিশ্যি এ সংবাদ সঠিক কিনা তা জানি না।

আচ্ছা, সেদিন সন্ধ্যায় আপনার তাঁর সঙ্গে দেখা হয়েছিল কুমারসাহেবের বাড়িতে?

হয়েছিল, মানে সে আমায় নিমন্ত্রণ করেছিল, আর কী সব জরুরী কথা-বার্তা বলবে বলেছিল।

কথাবার্তা কী হল তাঁর সঙ্গে?

সে বলেছিল ভবিষ্যতে আর যাতে তাকে দুঃখ পেতে না হয় সেই বন্দোবস্তই এবার সে করবে মনস্থ করেছে। সেই সব কারণেই তার হাজার দশেক টাকার দরকার। সে একটা ব্যবসা শুরু করবে। সে ব্যবসায় নাকি এই যুদ্ধের বাজারে খুবই লাভের সম্ভাবনা। সেই টাকাটা আমি তাকে কারও কাছ থেকে ধার করে দিতে পারি কিনা তাই জিজ্ঞাসা করছিল।

কিন্তু আপনিই তো একটু আগে বলছিলেন, বর্তমানে নাকি তাঁর অবস্থা অত্যন্ত খারাপ হয়ে পড়েছিল। কিন্তু আপনি কি জবাব দিলেন?

বলেছিলাম চেষ্টা করে দেখতে পারি, কারণ বরানগরে তাঁর পৈতৃক আমলের যে ঘরবাড়ি এখনও আছে, তা বাঁধা রেখে হাজার দশেক কেন হাজার কুড়ি টাকা পাওয়াও এমন কিছু কঠিন ব্যাপার হত না মিঃ রায়।

মিঃ চৌধুরী, আপনি জানেন মিঃ মিত্রের বাগানের শখ ছিল কিনা?

না তো! হঠাৎ এ প্রশ্ন কেন মিঃ রায়?

জানেন গত সন্ধ্যায় কুমারসাহেবের বাথরুমে একটা মাটি কোপানো খুরপি পাওয়া গেছে।

তবে একটা কথা মিঃ রায়—মাস পাঁচ-ছয় আগে শুভঙ্কর তখন সবে কুমারসাহেবের বাড়িতে চাকরি নিয়েছে, সেই চাকরি উপলক্ষ্যেই সে একদিন রাত্রে তার বাড়িতে বিশিষ্ট বন্ধু-বান্ধবদের নিয়ে এক বিরাট ভোজ দেয়। রাত্রে খাওয়া-দাওয়ার পর সকলেই প্রায় তখন চলে গেছেন। যাইনি শুধু আমি ও শুভঙ্করের শিশু বয়সের বন্ধু প্রফেসার কালিদাস শর্মা। এখানে চাকরি নেবার আগে শুভঙ্কর বছরখানেক প্রায় দেশভ্রমণ করে বেড়ায়। সে রাত্রে আমাদের কাছে শুভঙ্কর তার ভ্রমণ-কাহিনী বলছিল তার শয়নঘরে বসেই এবং কথায় কথায় সাহিত্যও এসে পড়ল। কালিদাস একসময় বললে, আগে থেকেই চিন্তা করে চমৎকার উপায়ে যেসব খুনী খুন করে তাদের খুনের ধারাটা পরীক্ষা করে দেখলে মনে হয় যেন একটা রহস্যপূর্ণ উপন্যাস পড়ছি। বলে সে হাসতে লাগল।

সামনেই বসে শুভঙ্কর বরফ দিয়ে জিনজার খাচ্ছিল। মনে হল সে যেন একবার কেঁপে উঠল কথাটা শুনে। কথায় কথায় ক্রমে ইতিহাস ও রহস্যময় উপন্যাসের কথা উঠল। বক্তা প্রফেসারের বলবার অদ্ভুত একটা ক্ষমতা আছে, সে বলতে লাগল, বিখ্যাত লেখক পোঁয়ের মত কল্পনা-শক্তি আমি কোন বাংলা সাহিত্যিক কেন, ইংরাজ সাহিত্যিকদের মধ্যেও পাইনি। 'অ্যামনটিলাডো'র গল্পটা হয়তো পড়েননি আপনি মিঃ চৌধুরী! যখনই পোঁয়ের সেই গল্পটা আমার মনে পড়ে, কল্পনায় দৃশ্যটা আমার চোখের ওপর ভাসতে থাকে—সেখানে 'মনট্রেসর' 'ফরচুনেটো'কে নিয়ে মাটির নীচে কবরঘরের দেওয়ালের তলায় সমাধি দিতে চলেছে চিরজন্মের মত। শুভঙ্কর সে গল্পটা বোধ একদিন তোমাকে পড়ে শুনিয়েছিলাম, মনে নেই? সেই যেখানে হতভাগ্য 'ফরচুনেটো' তার অবশ্যম্ভাবী ভয়ঙ্কর বিপদের কথা ঘুণাক্ষরেও টের না পেয়ে তার সঙ্গীকে জিজ্ঞাসা করছে, বল না সত্যিসত্যিই কি তুমি ম্যাসনের মাতৃসঙ্ঘের একজন মেম্বার। তার জবাবে মনট্রেসর বললে, হ্যাঁ। এবং তাতে ফরচুনেটো প্রশ্ন করলে, সেই সঙ্ঘের চিহ্ন কি বল তো? জবাবে মনট্রেসর বিদ্যুৎগতিতে তার জামার ভিতর থেকে একটা 'খুরপি' চট্ করে বের করে দেখাল।

বলতে বলতে সে সহসা শুভঙ্করের দিকে তাকিয়ে বললে, কি এর মধ্যেই সে গল্পটা ভুলে গেলে? শুভঙ্করের দিকে তাকিয়ে দেখি, যেন একটা ভয়ঙ্কর উদ্বেগে তার সমস্ত মুখটা কালো হয়ে উঠেছে। সহসা এমন সময় শুভঙ্কর টলতে টলতে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল কিন্তু পরক্ষণেই আবার সে টলে পড়ে গেল। পড়ে যাবার সঙ্গে সঙ্গে ঘরের মধ্যে টেবিলের ওপরে যে ল্যাম্পটা জ্বলছিল সেটা গড়িয়ে পড়ে ভেঙে গেল। একটা বিশ্রী ঝন্ ঝন্ শব্দ হয়ে ঘরটা অন্ধকার হয়ে গেল। আমি তাড়াতাড়ি এগিয়ে গিয়ে শুভঙ্করকে তুলতে গেলাম। কিন্তু ততক্ষণে শুভঙ্কর নিজেই কোনমতে আবার টলতে টলতে উঠে দাঁড়িয়েছে। অন্ধকার ঘরের মধ্যে বাইরের খানিকটা চাঁদের আলো যেন একান্ত অনাহূত ভাবেই এসে প্রবেশ করে ঘরের মধ্যে একটা অস্পষ্ট আলো-ছায়ার সৃষ্টি করেছে। সেই আলোছায়াচ্ছন্ন ঘরে মুখোমুখি দাঁড়িয়ে শুভঙ্কর আর কালিদাস দুজনেই দুজনের দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চেয়ে যেন পরস্পরের অন্তর পর্যন্ত দেখছে।...

মিনিট দু-তিন এরকম কাটবার পর দুজনে আবার স্থির হয়ে যে যার চেয়ার টেনে নিয়ে

বসল।

মিঃ চৌধুরী চুপ করলেন। আরো কিছুক্ষণ কথাবার্তার পর তখনকার মত আমরা মিঃ চৌধুরীর নিকট হতে বিদায় নিয়ে চলে এলাম।

* * *

সন্ধ্যার অল্প পরেই কিরীটী, আমি ও ডাঃ চট্টরাজ বরানগরে শুভঙ্কর মিত্রের বাড়িতে গিয়ে হাজির হলাম।

বাজার ছাড়িয়ে গঙ্গার ধারে প্রকাণ্ড চকমিলান প্রাসাদতুল্য বাড়ি। লোহার গেটটা ভেজানোই ছিল। মৃদু একটা ঠেলা দিতেই খুলে গেল।

সামনেই অনেকখানি জায়গা জুড়ে একটা নানা জাতীয় দেশী বিদেশী মরসুমী ফুলের বাগান।

বাড়ির কোথাও একটা আলোর চিহ্ন পর্যন্ত নেই। অন্ধকারে নিঃশব্দে ভূতের মতই যেন বাড়িটা একটা বিভীষিকার মত স্তূপ বেঁধে আছে। ভয় করে। গায়ের মধ্যে ছমছম করে ওঠে।

দরজার কড়া নাড়তেই দরজাটা খুলে গেল! সামনেই আধাবয়েসী একটি ছোকরা দাঁড়িয়ে।

কিরীটীই জিজ্ঞাসা করল, কি রে, তোর নাম কি?

আজ্ঞে, মাধব, বাবু।

এ বাড়িতে কতদিন চাকরি করছিস?

মাত্র কয়েক সপ্তাহ হল বাবু আমাকে তাঁর কাজে বাহাল করেছিলেন। আমি তাঁর বেয়ারার কাজ করতাম।

বেশ, বাড়ির আর সব চাকরেরা কোথায় মাধব?

আজ্ঞে, অন্য চাকরবাকর তো কেউ আর নেই। কর্তা অনেকদিন আগেই তাদের ছাড়িয়ে দিয়েছেন।

কেন?

তিনি বলেছিলেন মাস-চার-পাঁচেকের জন্য তিনি কুমারসাহেবের সঙ্গে সিঙ্গাপুর যাবেন কী একটা কাজে।

ও, তাহলে তুই তাঁর খাস-চাকর ছিলি বল্?

আজ্ঞে সাধ্যমত তাঁর সুখ-সুবিধার দিকে নজর রাখতে কোনদিনই আমি কসুর করিনি কর্তা। আমারও আপাততঃ চাকরি ছেড়ে দিয়ে চলে যাবার কথা কিছুদিনের মত। তারপর তিনি বলেছিলেন, সিঙ্গাপুর থেকে ফিরে এলে আবার আমাকে সংবাদ দেবেন।

কাল রাত্রে তুই তাহলে এখানেই ছিলি মাধব?

আজ্ঞে। এত বড় একটা বাড়িতে একা একা—শেষে রাত্রি একটার সময় ফোনে খবর পাই—আমাদের বাবু মারা গেছেন। বড় ভাল লোক ছিলেন কর্তা. ..কিন্তু বাবু আশ্চর্য, তারই ঠিক কিছুক্ষণ আগে যেন মনে হল শব্দ পেলাম সদর দরজায় চাবি দিয়ে যেন কে দরজা খুলছে ...বাবু কখনো কখনো অনেক রাত্রে বাসায় ফিরতেন বলে আর একটা চাবি তাঁর কাছে থাকত। রাত্রে তিনি সেই চাবি দিয়ে দরজা খুলে ভিতরে ঢুকতেন। আমি তাড়াতাড়ি নীচে গেলাম, কিন্তু কাউকেই দেখতে পেলাম না। ভাবলাম আমার শুনবারই ভুল হবে হয়তো।

ডাক্তার একবার মাথাটা দোলালেন কথাগুলো শুনে।

pathagar.net

কটা চাবি তোর কর্তার সঙ্গে থাকত মাধব?

আজ্ঞে, তাঁর শোবার ঘরের, লাইব্রেরী ঘরের, বাইরের দরজার, অন্যান্য ঘরের ও সিন্দুকের কয়েকটা চাবি একটা রিংয়ে ভরা সর্বদাই কর্তার কাছে থাকত বাবু। কিন্তু একথা জিজ্ঞাসা করছেন কেন বাবু?

কাল দুপুরে যখন তিনি বাড়ি থেকে যান, তখনও তাঁর কাছে চাবির সেই রিংটা ছিল কিনা তুই জানিস মাধব?

আজ্ঞে জামা-কাপড় পরবার পর আমিই তাঁর অন্য একটা কোটের পকেট থেকে চাবির রিংটা এনে তাঁর হাতে দিই।

কাল কত রাত্রে তোর মনে হয়েছিল তোর বাবু ফিরে এসেছেন? ডাক্তার প্রশ্ন করলেন।

রাত প্রায় দেড়টা হবে বাবু বোধ করি!

আচ্ছা তুই যে বলছিলি বাবুর সিন্দুক আছে, কোন্ ঘরে সেটা?

আজ্ঞে দোতলায় বাবুর শোবার ঘরে।

একবার দেখাতে পারিস সে ঘরটা?

চলুন না।

আমরা সকলে সিঁড়ি বেয়ে ওপরে এলাম। লম্বা একটা টানা বারান্দা, তার উত্তর দিকে এক কোণে শুভঙ্করবাবুর শয়নঘর। কিন্তু ঘরের সামনে এসে আমরা সকলেই বিস্মিত হয়ে গেলাম! দরজার গা-তালায় তখনও একটা চাবি সমেত চাবির রিং ঝুলছে।

মাধব বললে, তাই তো বাবু, ঐ কর্তার চাবির রিং, কিন্তু এটা দরজার গা-তালায় ঝুলছে দেখছি! এখানে কী করে এল ওটা, আশ্চর্য! তবে কি...সত্যিই বাবু ফিরে এসেছিলেন রাত্রে?

তুই সকালে আর ওপরে আসিসনি মাধব, না? কিরীটী জিজ্ঞাসা করল।

আজ্ঞে না।

তোর অনুমান ভুল হয়নি মাধব। এখন বোঝা যাচ্ছে সত্যই কাল রাত্রে কেউ এ বাড়িতে এসেছিল।

কিরীটী চাবি ঘুরিয়ে ধাক্কা দিয়ে শয়নঘরের দরজাটা খুলে ফেললে এবং মৃদুস্বরে বলতে লাগল, সুব্রত, ডাক্তার, এখন বুঝতে পারছেন বোধ হয় কেন কাল রাত্রে মৃত শুভঙ্কর মিত্রের পকেট সার্চ করে আমার সন্দেহ হয়েছিল! একজন অবিবাহিত অল্পবয়স্ক যুবকের কাছে অন্তত তার প্রাইভেট চাবিটা থাকা দরকার, কিন্তু সেটা নেই। এখন বুঝতে পারছেন, সবার অলক্ষ্যে কেমন করে খুনী মৃতব্যক্তির পকেট থেকে চাবি চুরি করে সরে পড়েছিল এবং চাবি নিয়ে সে যখন বরাবর এখানেই এসেছে, নিশ্চয়ই কান উদ্দেশ্য নিয়েই এসেছিল। কিন্তু সেটা কী? সেটা কী?

মিঃ মিত্রের শয়নঘরটি বেশ প্রশস্ত। দামী মেহগনী কাঠের তৈরী একটি খাটে পাতা বিছানা চমৎকার একটি লাল রংয়ের বেডকভার দিয়ে ঢাকা। ঘরের মধ্যে আসবাবপত্রের তেমন বিশেষ কোন বাহুল্য নেই।

ঘরের দেওয়ালে বড় বড় সব অয়েল পেন্টিং টাঙানো। দরজার সামনেই শিকারীর সুট পরা মিঃ মিত্রের কয়েক বছর আগেকার তোলা বোধ হয় একটি ফটো। মিঃ মিত্র যেমন একজন পাকা শিকারী ছিলেন, তাঁর শিকারের শখও ছিল তেমনি ভয়ানক প্রবল। কিরীটী কিছুক্ষণ ফটোটার কাছে দাঁড়িয়ে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে ফটোটা দেখতে লাগল। তারপর একসময়

আবার মাধবের দিকে ফিরে প্রশ্ন করলে, ওই ঘরের দরজার ওদিকে একটা ঘর আছে, না রে মাধব?

আজ্ঞে বাবু। ওই ঘরেই বাবুর লেখাপড়া করবার টেবিল ও সিন্দুকটা আছে। চলুন।

আমরা সেই দরজা দিয়ে পাশের ঘরে গিয়ে প্রবেশ করলাম। অল্প-পরিসর একখানি ঘর। এক পাশে একটা মাঝারি সাইজের সেক্রেটারিয়েট টেবিল ও গোটা দুই গদিমোড়া চেয়ার। অন্যদিকে একটা প্রকাণ্ড বহুদিনের পুরনো লোহার সিন্দুক। চাবির রিংয়ের মধ্যেই সিন্দুকের চাবি ছিল। কিরীটী আলগোছে অতি সন্তর্পণে চাবি দিয়ে সিন্দুকটা খুলে ফেললে ; কিন্তু আশ্চর্য, সিন্দুক একদম খালি, একটি কাগজের টুকরো পর্যন্ত নেই তার মধ্যে।

কিরীটী বললে, তোর বাবুর সিন্দুক যে একেবারে খালি দেখছি মাধব! ব্যাপার কি, এর মধ্যে কি কিছু থাকত না?

আজ্ঞে, সে কি বাবু —সিন্দুকের মধ্যে যে অনেক দরকারী দলিলপত্র ছিল! কালও বাবু যাওয়ার আগে আমার সামনে সিন্দুক খুলে কী একটা কাগজ নিয়ে আবার সিন্দুক আটকে রাখলেন!...বাবু, আর সন্দেহ নেই আমার, নিশ্চয়ই কাল রাত্রে কেউ এসেছিল এ বাড়িতে। তা না হলে—,আর বাকি কথাগুলো সে শেষ করে না।

খুব সম্ভব। দেখ্, এই সিন্দুকের গায়ে হাত দিস না। আচ্ছা মাধব, দেখ্ তো চাবির রিংয়ের মধ্যে তোর মনে পড়ে এমন কোন চাবি খোয়া গেছে কিনা? মানে সব চাবিই ঠিক আছে কিনা?

চাবির রিংটা মাধব হাতে নিয়ে মনে মনে এক-একটা চাবি দেখে কী যেন হিসাব করতে করতেই সহসা সবিস্ময়ে বলে উঠল, বাবু, অস্ত্রঘরের সেই বড় পিতলের চাবিটা তো এর মধ্যে কই দেখছি না।

অস্ত্রঘর! এ বাড়িতে আবার অস্ত্রঘরও আছে নাকি?

আজ্ঞে। মাটির নীচে এ বাড়িতে একটা ঘর আছে বাবু, সেখানে নানা-রকম অস্ত্রশস্ত্র সব দেওয়ালে সাজানো আছে। কত সব পুরোনো দিনের অস্ত্র! কী অদ্ভুত সব দেখতে এক-একটা অস্ত্র! কর্তা আমাদের একদিন সবাইকে ডেকে নিয়ে দেখিয়েছিলেন। বাবুদের পূর্ব-পুরুষের মধ্যে নাকি কে একজন অত্যাচারী জমিদার ছিলেন, তিনিই ঐ ঘরটা দুষ্ট প্রজাদের কয়েদ করে রেখে শাস্তির দেবার জন্য বানিয়েছিলেন বলেছিলেন ; পরে আমাদের বাবু সেটাকে অস্ত্রঘর করেছিলেন। শুধু যে সে ঘরে অস্ত্রই আছে বাবু তা নয়, নানারকম পশু-পক্ষীর হাড়-চামড়া, কত কী! দেখবেন, চলুন না!

চল্।

আমরা সকলে অগ্রসর হলাম।

মাধবই আমাদের অস্ত্রঘর দেখাবার জন্য নীচের তলায় চলল। জমিদারি আমলের বাড়ি। এর গঠন-কৌশলই সম্পূর্ণ আলাদা। বাড়ির একটা রান্নাঘর এবং রান্নাঘরের পাশ দিয়েই একটা দরজা। সেই দরজা খুললেই একটা সিঁড়ি, সেখানে কোন আলোর বন্দোবস্ত নেই। ওপরের ঘুলঘুলির ফাঁক দিয়ে সূর্যের আলো এসে যতটুকু আলোর প্রবেশাধিকার দিয়েছে তাও অতি সামান্য। এবং সেই আলো-আঁধারে আধো-আলোয় বহুকালের তৈরী মাটির নীচের কুঠরীর সন্ধানে আমরা সিঁড়ি বেয়ে চললাম। সুদূর এক অতীতে এই নির্জন কুঠরীতে কত হতভাগ্যের মর্মন্তুদ কান্নার অশ্রুত বিলাপধ্বনি হয়তো আজিও নিশীথ রাতের আঁধার

বায়ুলেশহীন মাটির তলায় এই গুপ্ত কক্ষের দেওয়ালে দেওয়ালে নিরুপায়ে আছাড়ি-পিছাড়ি করে মরে। কত খুন-খারাপি, কত নির্মম অত্যাচার এই নির্জন অন্ধ কুঠরীতে একদিন অবাধে অনুষ্ঠিত হয়েছে। গোটা কুড়ি সিঁড়ি ডিঙিয়ে একটা ছোট বারান্দার মত জায়গায় এসে সকলে আমরা দাঁড়ালাম। সামনেই প্রকাণ্ড একটা লোহার দরজা ; দরজার গায়ে দেখা গেল একটা ভারি জার্মান তালা ঝুলছে। কিরীটী সামনের দেওয়ালে টর্চের আলো ফেলল ; মনে হল বারান্দার একপাশের দেওয়ালে যেন খুব শ্রীঘ্র চুনকাম করা হয়েছে।

অস্ত্রঘর দেখে আবার আমরা সকলে এক সময় ফিরে এলাম ওপরে।

কিরীটী ও ডাক্তার আবার ওপরে চলে গেল। আমি রান্নাঘরের মধ্যে ঢুকে চারিদিকে চেয়ে চেয়ে দেখতে লাগলাম। রান্নাঘরের পিছনদিককার দরজাটা খোলা দেখে সেইদিকে এগিয়ে গেলাম।

সামনেই প্রকাণ্ড একটা আম, কাঁঠাল, জাম, জামরুল ও অন্যান্য ফল ও ফুলের বাগান। বহুকালের অব্যবহারে প্রচুর আগাছা জন্মেছে। ঘন সন্নিবিষ্ট গাছপালার ফাঁকে ফাঁকে খুব সামান্যই সূর্যের আলো বাগানে প্রবেশ লাভ করেছে। এক পাশে একটা প্রকাণ্ড দীঘি—প্রকাণ্ড পাথরের বাঁধানো রাণা। একটা বকুল গাছ তার ডালপালার একটা অংশ রাণার দিকে হেলিয়ে দিয়েছে।

বাঁধানো রাণার দিকে এগিয়ে গেলাম। কিন্তু ও কি! রাণার ওপর ডান হাতের ওপরে চিবুক রেখে গভীর চিন্তামগ্ন কে ও?

চিনতে কষ্ট হল না, গত রাত্রে কুমারসাহেবের বাড়িতে স্বল্প-পরিচিত সেই ভীতকাতর যুবক অরুণ কর।

আরো একটু এগিয়ে গিয়ে ডাকলাম, এ কি, অরুণবাবু যে! নমস্কার।

অরুণবাবু একান্ত নির্লিপ্তভাবে আমার দিকে চোখ তুলে একবার তাকালেন। আমি এগিয়ে গিয়ে তাঁর পাশেই রাণার ওপর বসে পড়লাম। তিনি আমাকে প্রতি-নমস্কারও জানালেন না, যেমন চুপ করে বসেছিলেন তেমনিই রইলেন।

আজ দিনের আলোয় ভাল করে ভদ্রলোককে দেখলাম আবার।

সত্যই অতি সুন্দর আভিজাত্যপূর্ণ চেহারা। আজও পরনে একটা দামী শান্তিপুরী ধুতি ও গরদের পাঞ্জাবি। মাথার চুল এলোমেলো বিস্রস্ত। মুখে সুস্পষ্ট একটা বিষণ্ণ চিন্তার ছায়া যেন ফুটে উঠেছে।

অরুণবাবু! আবার ডাকলাম।

হঠাৎ আমার দিকে ফিরে রীতিমত রুক্ষগলায় ভদ্রলোক বলে ওঠেন, যান যান মশাই, খুব আপনার কথার ঠিক! বললাম আমাকে চুপিচুপি যেতে দিন, সারাটা পথ দুজন লোক আমার পিছু পিছু ছায়ার মত আমার বাড়ি পর্যন্ত ধাওয়া করে গেছে—ভাবেন আমি কিছু টের পাইনি! কেন মশাই, আমি কি খুন করেছি নাকি যে আমার পিছনে গোয়েন্দা লাগিয়েছিলেন?

ও, এই কথা! আমি হাসতে লাগলাম, তা ওরা তো আমার লোক নয় অরুণবাবু। বোধ হয় পুলিসের লোক কেউ আপনাকে অনুসরণ করে দেখছিল, সত্যই আপনি আপনার বাড়ির যে ঠিকানাটা তাদের দিয়েছেন সেটাই আপনার আসল ঠিকানা কিনা। কিন্তু সে কথা যেতে দিন। পুলিসের লোকগুলোই অমনি ধরনের, কিন্তু বলুন তো, এ সময়ে এ-বাড়িতে এমন

জায়গায় আপনি এমনি করে ভূতের মত একা একা চুপচাপ বসে বসে কি এত ভাবছিলেন?

কি আর ভাবব! মনটা খারাপ লাগছিল শুভঙ্করদার মৃত্যুর কথা ভেবে ভেবে। বাসায় মন বসল না, তাই কখন এক সময় হাঁটতে হাঁটতে এখানে চলে এসেছি। ভদ্রলোকের চোখের কোণ দুটো সহসা যেন উপচীয়মান অশ্রুধারায় সজল হয়ে এল, মনে পড়ছিল কতদিন এই নির্জন পুকুরের রাণায় আমরা দুজনে বসে তার জীবনের কত সব রোমাঞ্চকর শিকারের অদ্ভুত গল্প শুনেছি। কত ভালবাসতেন আমাকে শুভঙ্করদা! বলতে বলতে হঠাৎ আবার অরুণ কর চুপ করে রইলেন কিছুক্ষণ, তারপর আবার একসময় আবার বললেন, হ্যাঁ ভাল কথা, জানেন আজ সকালের দিকে আমি একবার কুমারসাহেবের ওখানে গিয়েছিলাম! কথায় কথায় ওঁর সঙ্গে মিঃ মিত্রের কথা উঠতে কুমারসাহেব কী বললেন জানেন?

কী? আমি প্রশ্ন করলাম।

কুমারসাহেব বলছিলেন, শুভঙ্করদার পক্ষে নাকি মরণই মঙ্গল হয়েছে। কি নিষ্ঠুর অথচ কি আশ্চর্য দেখুন! যে লোকটা কুমারসাহেবের জন্য এত করল, তাঁর মৃত্যুতে তাঁর চোখে একটু জল পর্যন্ত নেই। অথচ আর কেউ না জানুক আমি তো জানি, এক মূহূর্ত তাঁর শুভঙ্করদাকে না হলে চলত না, প্রতি কাজে তাঁকে তাঁর প্রয়োজন হত। এরপর অরুণ কর কিছুক্ষণ আবার এক্কেবারে চুপ-চাপ বসে রইলেন ; বোধ হয় অতীত স্মৃতির বেদনায় মনটা ওঁর ভারাক্রান্ত হয়ে উঠছিল খুব বেশীই। আমিও নীরবে ওঁর পাশে চুপচাপ বসে রইলাম। এমন সময় হঠাৎ দাঁড়িয়ে উঠে বললেন, আচ্ছা এখন চললাম—সেই সকালে বের হয়েছি। যাবেন না আজ রাত্রে আমার বাসায়! কেউ নেই, মামা-মামী পরশু মধুপুর গেছেন, একদম খালি বাড়ি ; সেখানেই খাওয়া দাওয়া করবেন। আসবেন কিন্তু, আসবেন তো?

যাব। মৃদু স্বরে জবাব দিলাম।

অরুণবাবু তাড়াতাড়ি উঠে গাছের আড়ালে অদৃশ্য হয়ে গেলেন। আমিও উঠলাম।

॥ এগার ॥

গাড়িতে বসে ফিরবার পথে কিরীটীকে প্রশ্ন করলাম, অনুসন্ধানের মত কিছু পেলে?

না। একটা হাতের লেখার মত কিছু খুঁজছিলাম, কিন্তু পেলাম না। লোকটা দারুণ চালাক, আগে থেকেই সাবধান হয়ে যা কিছু প্রয়োজনীয় সব সরিয়ে ফেলেছে তবু দুটো জিনিস পাওয়া গেছে।

কি? কিরীটীর মুখের দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করলাম।

একটুকরো কাগজ আর এইচ, এইচ, এইচ মার্কা একটা জন ফেবারের 'লেড' পেনসিল। বলে গভীর আনন্দে কিরীটী তার বুকপকেটটার গায়ে হাত বুলিয়ে নিল—যেন বহুমূল্য কোন একটা দ্রব্য সেখানে সে বহু যত্নে লুকিয়ে রেখেছে।

ডাক্তার আগেই চলে গিয়েছিলেন। কথা ছিল তিনি পুলিস সার্জেনের ময়নাতদন্তের রিপোর্টটা নিয়ে তাঁর বাসাতেই আমাদের জন্য অপেক্ষা করবেন।

তাই গোটা তিনেকের সময় খাওয়া-দাওয়া সেরে আমরা একবার লালবাজার থানায় পুলিস কমিশনারের সঙ্গে দেখা করতে গেলাম।

বর্তমান কেস সম্পর্কেই কমিশনার সাহেবের সঙ্গে কিরীটীর নানা কথাবার্তা হল।

BanglaBook.org

কিরীটীর সঙ্গে পুলিস কমিশনারের খুব বেশী বন্ধুত্ব, অন্যান্য কথাবার্তার পর সাহেব একসময়ে বললেন, কুমারসাহেব এ ব্যাপারে অত্যন্ত ম্রিয়মান হয়ে পড়েছেন মিঃ রায়। তিনি গভর্ণমেণ্টকে দশ হাজার টাকার একটা চেক দিয়ে গেছেন—যে খুনিকে ধরিয়ে দিতে পারবে সে-ই ঐ পুরস্কার লাভ করবে।

তা বৈকি, কিরীটী বললো, তাঁর মত একজন সম্মানিত ব্যক্তির পক্ষে এ বড় কম অসম্মানকর কথা নয়! আজ সংবাদপত্রে দেখছিলাম, বর্তমানে শ্রীপুরে যে টি-বি হাসপাতাল তৈরী হচ্ছে গঙ্গার ধারে লক্ষ টাকা ব্যয়ে এবং যার সব কিছু ব্যয়ভার তিনিই নিয়েছেন—সেটা নাকি তাঁর কাকা স্যার দিগেন্দ্রর নামেই 'দিগেন্দ্র স্যানাটোরিয়াম' নাম দেওয়া হবে—তিনি ঘোষণা করেছেন।

পুলিস কমিশনারের ওখান হতে বিদায় নিয়ে আমরা ডাঃ চট্টরাজের বাসায় গিয়ে দেখি, তিনি আমাদের জন্যই অপেক্ষা করছেন। তাঁকে নিয়ে আমরা বেরিয়ে পড়লাম। এবং সকলে আমরা বরাবর কুমারসাহেবের ওখানে গিয়ে হাজির হলাম। কথায় কথায় একসময় কিরীটী প্রশ্ন করল কুমারসাহেবকে, আচ্ছা, প্রফেসার শর্মা সম্পর্কে আপনি কতটুকু জানেন বলুন তো কুমারসাহেব?

প্রফেসার শর্মার নামে কুমারসাহেবের সমস্ত শরীরটা যেন সহসা একবার কেঁপে উঠল মনে হল। পরক্ষণেই উত্তেজিত স্বরে তিনি বললেন, প্রফেসার শর্মা মানুষের দেহে একটি শয়তান, মিঃ রায়! He is a dirty snake! Blood-sucking Vampire!

প্রফেসার শর্মা আপনার মৃত সেক্রেটারী শুভঙ্কর মিত্রের পরম বন্ধু ছিলেন, তা জানেন বোধ হয় কুমারসাহেব?

ভগবানকে ধন্যবাদ যে সে বন্ধুত্বের অবসান হয়েছে। ভয়ঙ্কর লোক! লোকটা নাকি কি একটা নাটক লিখেছে এবং চেষ্টা করছিল নিরীহ শুভঙ্করকে দিয়ে আমার কাছ থেকে টাকা নিয়ে একটা থিয়েটার-পার্টি খুলতে।

শুনলাম ওরা দুজনে পরস্পর পরস্পরকে নাকি চিনতেন?

একটা মৃদু হাসি কুমারসাহেবের ওষ্ঠপ্রান্তে জেগেই মিলিয়ে গেল, বুঝতে পেরেছি মিঃ রায়, আপনি কি সন্দেহ করছেন—প্রফেসার শর্মাই ছদ্মবেশী আমার কাকা স্যার দিগেন্দ্র কিনা, না? কিন্তু আমি বলছি তা নয়, তবে সে একজন ভয়ঙ্কর শয়তান বটে। তারপর যেন একটু থেমে আবার আত্মগতভাবে বললেন, কিন্তু কাকার কথা আমি কিছুতেই ভুলতে পারছি না মিঃ রায়। মনে হচ্ছে এ বাড়ির কোথাও না কোথাও তিনি এখনও মৃত্যু-তৃষ্ণায় ওৎ পেতে বসে আছেন। হ্যাঁ, he is somewhere here! Somewhere here!

কুমারসাহেব আবার বলতে লাগলেন, এখন আর অবিশ্যি আমার বলতে বাধা নেই মিঃ রায়—কাল সন্ধ্যায় আমার সেক্রেটারী শুভঙ্কর আমাকে বলছিল শীঘ্রই নাকি সে কোথায় টাকা পাচ্ছে! আর সেই টাকা দিয়ে সে নাকি শীঘ্রই একটা থিয়েটার খুলছে, planও প্রায় তৈরী।

আচ্ছা, সন্ধ্যার পরে প্রফেসার শর্মার বাসায় গেলে তাঁকে পাওয়া যেতে পারে বলে আপনার কি মনে হয় কুমারসাহেব?

তা ঠিক বলতে পারি না, তবে শুনেছি দমদমার একটা বাগানবাড়িতে 'তলোয়ার সঙ্ঘ' মানে একটা নাকি গুপ্ত সঙ্ঘ আছে; সেইখানে সে ও আমার মৃত সেক্রেটারী প্রত্যহ সন্ধ্যার

পর তলোয়ার খেলতে যেত। সন্ধ্যার পর তার বাসায় না পেলেও, সেখানেই হয়তো তাকে পেলেও পেত পারেন। ঠিকানা দিতে পারি যদি চান।

আমাদের অনুরোধে কুমারসাহেব ঠিকানাটা দিয়ে দিলেন।

কুমারসাহেব, আপনি অরুণ কর বলে কাউকে চেনেন?

আমার মৃত সেক্রেটারীর একজন পরম ভক্ত ছিল শুনেছি। বেশ ছেলেটি। তেমন বিশেষ কিছু নয়, সামান্য একটু-আধটু জানাশোনা হয়েছিল একবার।

দেখুন কুমারসাহেব, কিরীটী বলতে লাগল, একটা খুনের মামলার তদন্ত করতে গেলে অনেক অপ্রিয় ব্যাপারের সামনে আমাদের যেতে হয় ; সেই জন্যই আগে বলে দিচ্ছি, যদি কোন সময়ে অপ্রিয় কিছু বলি তো মনে কিছু করবেন না যেন। আচ্ছা, এমন কি হতে পারে না যে, আপনার কাকা এমন কারও ছদ্মবেশ নিয়েছিলেন, যিনি হয়তো মিঃ শুভঙ্কর মিত্রের সঙ্গে যথেষ্ট পরিচিত ছিলেন? এমন কি হয়তো আপনার সঙ্গেও পরিচয় ছিল সেই লোকটির?

না, সম্ভব নয়।

অবিশ্যি একথা খুবই সত্যি যে, আপনার নিজের কাকাকে আপনি যতটা চেনেন, আর কারও পক্ষে ততটা চেনা একেবারেই সম্ভবপর নয়। আচ্ছা আপনার মনে কি হয়, এমনভাবে কোন পরিচিত ব্যক্তির ছদ্মবেশে আপনার কাকা স্যার দিগেন্দ্র এখানে আসতে পারেন বলে?

না,, বললাম তো, একেবারেই তা অসম্ভব। তাছাড়া আমার চোখকে তাঁর পক্ষে ফাঁকি দেওয়া সম্ভবপর নয় মিঃ রায়। এ চিন্তাও বাতুলতা।

যাহোক, কুমারসাহেবের ওখান থেকে বিদায় নিয়ে তাঁরই দেওয়া ঠিকানা অনুযায়ী আমরা দমদমায় 'তলোয়ার সঙঘ' অভিমুখে যাত্রা করলাম।

ব্যারাকপুর ট্রাঙ্ক রোডের ওপর সিঁথির কাছাকাছি এক পুরাতন বাগান-বাড়িতে ঐ সঙঘ।

লোহার গেটের মাথায় একটা কেরোসিনের বাতি টিমটিম করে জ্বলছে। বাগানের মধ্যে বড় বড় আম ও ঝাউ গাছ। অন্ধকারে সোঁ সোঁ করে ঝাউপাতার একঘেয়ে কান্না শোনা যায়।

সঙেঘর কর্তা রাম সিং একজন যুদ্ধ ফেরতা পাঞ্জাবী হাবিলদার সৈন্য।

কিরীটী ভৃত্যকে দিয়ে তাঁর কাছে কার্ড পাঠাতেই রাম সিং পাশের একটা ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন।

দানবের মতই উঁচু লম্বা চেহারা, অন্ধকারে যেন মুর্তিমান বিভীষিকার মতই প্রতীয়মান হয়।

রাম সিং আমাদের নিয়ে গিয়ে একটা ছোট কামরার মধ্যে বসালেন। তারপর আমাদের পরিচয় জেনে বললেন, আমিও মিঃ মিত্রের আকস্মিক মৃত্যুসংবাদ পেয়েছি বাবু। বাঙালীর মধ্যে অমন চমৎকার তলোয়ার খেলতে আজ পর্যন্ত বড় একটা রাম সিংহের চোখে পড়েনি বাবু। মনটা আমার বড্ড খারাপ হয়ে গেছে। বহুৎ আচ্ছা আদমি থা।

আমি আপনার যে ঘরে খেলা হয়, সে ঘরটা একবার গোপনে দেখতে চাই রাম সিংজী!

আসুন না।

পাশের বারান্দা দিয়ে আমরা একটা প্রকাণ্ড হলঘরের খোলা জানালার সামনে এসে

দাঁড়ালাম। ঘরের আলো বারান্দায় এসেও খানিকটা পড়েছে।

ঘরের দেওয়ালে দেওয়ালে তীক্ষ্ণ সব তলোয়ার টাঙানো।

ঘরের মেঝেতে প্রফেসার শর্মা দাঁড়িয়ে। পরিধানে দামী কালো সার্জের লংস ও ঝোলা একটা জামা গায়ে। মাথার চুলগুলো ব্যাক্‌ব্রাস্ করা। দেহের প্রতিটি মাংসপেশী যেন সজাগ শক্তির অহমিকায় সুস্পষ্ট। ঘরের পরিবেশে আজ প্রফেসার শর্মাকে যেন চমৎকার মানিয়েছে।

হাতে একটা তীক্ষ্ণ তরবারি নিয়ে তিনি চারপাশে বনবন শব্দে ঘোরাচ্ছেন। হঠাৎ এদিকে চোখ পড়তেই আমাদের সকল গোপনতা সত্ত্বেও তাঁর সঙ্গে চোখাচোখি হয়ে গেল। কিন্তু তিনি কোন ইঙ্গিত দিলেন না।

এমন সময় একজন ভৃত্য একটা থালায় করে বড় বড় সব কাচের গ্লাসে বাদামের সরবৎ নিয়ে ঘরে ঢুকল।

উপস্থিত যাঁরা ছিলেন সকলেই এক-একটা গ্লাস থালার ওপর থেকে তুলে নিলেন।

প্রফেসার শর্মা একটা সরবতের গ্লাস হাতে নিয়ে, সেটা মাথার ওপর তুলে ধরে আনন্দ-বিহ্বল কণ্ঠে বললেন, এস, যে বন্ধু আমাদের মারা গেল তার আত্মার কল্যাণে ও যে এর পরে মরবে তার শুভ কামনায় এই সরবত আমরা প্রাণভরে পান করি। হুররে!

সমস্ত সরবতটা এক চুমুকে পান করে, শূন্য গ্লাসটা সামনের একটা টেবিলের ওপরে শর্মা নামিয়ে রাখলেন সশব্দে। তারপর এক পাক ঘুরে আবার বললেন, উপস্থিত ভদ্রমহোদয়গণ, আমার কথা আপনারা অবিশ্বাস করবেন না ; শীঘ্রই আর একজনের মৃত্যু আসন্ন হয়ে এসেছে আমি স্পষ্ট সেটা যেন অনুভব করছি। বলতে বলতে প্রফেসার শর্মা হস্তধৃত তলোয়ারটার বাঁটটা শক্ত করে চেপে ধরলেন, বন্ধু সকল, আপনাদের মধ্যে কেউ আজ আমার সঙ্গে অসিমুখে শক্তি পরীক্ষা দিতে প্রস্তুত? আসুন তবে! একদিন তলোয়ার না খেললে যেন শরীর আমার ঝিমিয়ে আসে।

প্রফেসার শর্মার চোখে যখন আমরা পড়েই গেছি, তখন আর গোপনতার প্রয়োজনও নেই ; তাই আমরা সকলে ঘরের মধ্যে গিয়েই প্রবেশ করলাম।

ওর বুকে একটা সত্যিকারের শক্তি ঘুমিয়ে আছে বাবু। ও সত্যি বীর! সাবাস বেটা! রাম সিং বললে।

যাক গে, আপনাদের মধ্যে আমার সঙ্গে অসি খেলতে কারও সাহস নেই দেখছি। এই যে আমার নতুন বন্ধু মিঃ কিরীটী রায় এখানে উপস্থিত রয়েছেন, আসুন না, আপনার সঙ্গেই এক হাত খেলা যাক। অবিশ্যি আপনাকে যথেষ্ট সুযোগ দেব।

অশেষ ধন্যবাদ প্রফেসার শর্মা। ওটায় আমি তেমন রপ্ত নই। কিরীটী মৃদুস্বরে জবাব দিল।

তাহলে আর কি হবে, হতাশ হতে হল। আজ তবে আসি সর্দার। গ্রে স্ট্রীটের দিকে একটা জরুরী কাজ আছে...এখুনি যেতে হবে একবার। প্রফেশার শর্মা বলে ওঠেন।

আরে তাই নাকি, আমার বন্ধুরও তো রাত্রে আজ ও পাড়াতেই নিমন্ত্রণ! কি হে সব্রত, অরুণ করের বাড়িতে আজ তোমার নিমন্ত্রণ না? কিরীটী আমার মুখের দিকে তাকিয়ে সহাস্যে বললে।

কিরীটীর কথায় প্রফেসার শর্মার চোখ দুটো সহসা একবার তীক্ষ্ণ হয়েই আবার স্বাভাবিক হয়ে এল।

এরপর আমরা সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে রাম সিং-এর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে গাড়িতে এসে উঠে বসলাম। রাত্রির অন্ধকারে হেডলাইট জ্বালিয়ে গাড়ি ব্যারাকপুর ট্রাঙ্ক রোড ধরে ছুটে চলল।

কিরীটী একসময় হীরা সিংকে ডেকে আদেশ দিল, হীরা সিং, পথে মেছুয়াবাজারে একবার ডাঃ রুদ্রের ল্যাবরেটরীর সামনে থেমো। তারপর আমার দিকে তাকিয়ে বললে, আচ্ছা সুব্রত, এককালে তো তুমি কলেজ-জীবনে শুনেছি একজন খুব নামকরা 'অ্যাথলেট' ছিলে?

কেন বল তো হঠাৎ এ প্রশ্ন?

আচ্ছা তোমরা যখন কোন জায়গায় শো দেখাতে যেতে, তোমাদের সঙ্গে বড় বড় লাগেজ থাকত না?

তা থাকত বৈকি! আমি জবাব দিলাম।

কিরীটী মৃদুস্বরে বললে, হুঁ, এবারে পাকা বন্দোবস্ত। সন্দেহ হবার যোটি নেই। কিরীটী অন্যমনস্ক ভাবে কী যেন ভাবতে লাগল এর পর।

যথাসময়ে আমাদের গাড়ি ডাঃ রুদ্রের ল্যাবরেটরীর দরজার সামনে এসে দাঁড়াল।

ডাঃ রুদ্র ল্যাবরেটরীতে ছিলেন না। তাঁর একজন সহকারী আমাদের এসে অভ্যর্থনা করে সমাদরের সঙ্গে বসবার ঘরে নিয়ে গিয়ে বসাল, বললে, বসুন, ডাক্তার একটা জরুরী কাজে বের হয়েছেন; ফিরতে একটু দেরী হবে।

সহকারীর হাতে কিরীটী পকেট থেকে একটা লেড পেনসিল বের করে দিয়ে বললে, ডাঃ রুদ্রকে এই পেনসিলটা একটিবার পরীক্ষা করে দেখতে বলবেন তো অমিয়বাবু।...আমি শুধু জানতে চাই পেনসিলটা কোন্ গ্রুপের। হ্যাঁ ভাল কথা, যে বইটা দিয়ে গিয়েছিলাম, তার থেকে ফটো নিয়ে ডেভলাপ করে দেখবার কথা ছিল, সেটা করা হয়েছে কি?

আজ্ঞে, ফটোর নেগেটিভটা শুকোচ্ছে। আমরা পরীক্ষা করে দেখেছি, সাধারণ লেখবার কালি দিয়েই বইয়ের ওপর নামটা লেখা হয়েছিল। বইয়ের ওপর পড়া গেছে পরিষ্কার।

খুব সুখবর! প্লেটটা এখনি দেখব'খন। হ্যাঁ, পুলিসের রিপোর্টটা সার্জেন দিয়ে যায়নি?

হ্যাঁ, ডাক্তার বলছিলেন মৃত মিঃ মিত্রের রক্ত ও হৃৎপিণ্ড পরীক্ষা করে দেখা গেছে, তিনি আফিংয়ের নেশায় নাকি অভ্যস্ত ছিলেন, প্রায় অন্তত বছর খানেক ধরে।

হ্যাঁ। কুমারসাহেবের প্রাইভেট রুমের জানালার কাছে যে আঙুলের ছাপের ফটো তোলা হয়েছিল সেটার রিপোর্ট কী?

হুবহু স্যার দিগেন্দ্রর আঙুলের ছাপের সঙ্গে মিলে গেছে স্যার।

বেশ। যে তলোয়ারটা সেই ঘরে পাওয়া গিয়েছিল তার গায়ে কোন আঙুলের ছাপ পাননি, না?

আজ্ঞে না।

সবাই আপনারা ভালভাবে পরীক্ষা করে দেখেছিলেন তো অমিয়বাবু?

হ্যাঁ স্যার, সব কিছুই পরীক্ষা করে দেখেছি।

এবারে কিরীটী আমার দিকে ফিরে তাকিয়ে বললে, আমাদের কথাবার্তা শুনে সুব্রত বোধ হয় খুব আশ্চর্য হয়ে গেছ, না? ডাক্তারও হয়তো হয়েছেন। কিন্তু একটা কথা কি জানেন? একটা 'ক্রাইম'কে অনুসন্ধান করে তার গোপন কথা জানতে হলে অনেক ছোটখাটো

ব্যাপারেরও সাহায্য নিতে হয়। কারণ অনেক সামান্য ব্যাপারের মধ্যে কত সময় যে আমরা প্রয়োজনীয় সূত্রের সন্ধান পাই ভাবলেই বিস্মিত হতে হয়। একজন খুনী বা দোষীকে খুঁজে বের করতে হলেই যে টনটনে জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা থাকতেই হবে তার কোন মানে নেই—সামান্য বিচার বুদ্ধি ও common sense থাকলেই যে কেউ খুনীকে অনায়াসেই খুঁজে বের করতে পারেন।...অন্তত আমার বিশ্বাস তো তাই।

এরপর একটু থেমে আবার বলতে শুরু করে, জানি জীবনে শত পরাজয় আছে এবং সেইজন্যই হঠাৎ পাওয়া একটি দিনের জয়ের আনন্দ অতীতের সমস্ত পরাজয়ের বেদনায় যেন শান্তিবারি ছিটিয়ে দেয়। ঐ ধৈর্য, অধ্যবসায় ও সহজ বিচার-বুদ্ধি আছে বলেই জীবনে আজ পর্যন্ত আমি কখনো হতাশ হইনি। যে কোন রহস্যই আমার কাছে বিচার ও বিশ্লেষণে অল্প সময়ের মধ্যে সহজ হয়ে গেছে। যা হোক, এবার আমাদের উঠতে হয়, রাত্রি প্রায় সাড়ে আটটা হল। বলতে বলতে কিরীটী আমার ও ডাক্তারের চোখের সামনে একটা টাইপ করা কাগজ মেলে ধরল, তাতে এই কটা কথা লেখা।

"প্রফেসার কালিদাস শর্মা,—খোঁজ নিয়ে দেখলাম লোকটার বাড়ি ও জন্মস্থান কাশীতে। ওইখানেই এবং পরে পাটনায় ও কাশীতে ওঁর জীবনের চব্বিশটা বছর কাটিয়েছেন। ওঁর পিতার নাম স্বর্গীয় জ্ঞানদাস শর্মা। পাটনা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে উদ্ভিদ্ বিজ্ঞানে এম. এ. ডিগ্রী নেন। তার পর কলকাতায় ১৯৩৬ সন থেকে প্রফেসারী শুরু করেন। কিন্তু একটি বৎসর না যেতেই ১৯৩৭ সালে কলেজ সংক্রান্ত কতকগুলো কী ব্যাপার নিয়ে চাকরী যায়। বর্তমানে তিনি কোথাও কোন কাজ করেন না, তবে প্রায়ই দেখা গেছে অরুণ করের নাম সই করা চেক ব্যাঙ্ক থেকে উনি ভাঙিয়ে নিয়েছেন।"

কিরীটী আমাদের দিকে একবার চেয়ে অদ্ভুত একটু হেসে কাগজটা মুড়ে ভাঁজ করে পকেটে রেখে উঠে দাঁড়াল। চল, আশা করি এর পর আর রহস্যের মূল সূত্রটি খুঁজে পেতে তোমাদের কারও কষ্ট হবে না।

গাড়িতে বসে কিরীটী বললে, তাহলে সুব্রত, তুমি তো অরুণ করের বাড়িতেই যাবে, না?

হ্যাঁ।

আচ্ছা। আমার একটা জরুরী কাজ আছে অন্য জায়গায়, আমি আপাতত সেইখানেই যাব।

॥ বারো ॥

আমার গাড়িটা আজ ক'দিন হতে বিগড়ে আছে, অগত্যা বাসে চেপেই অরুণ করের নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে চললাম। রাত্রি তখন সাড়ে আটটা হবে, গ্রে স্টীটের মোড়ে বাস থেকে নামলাম। অরুণ করের দেওয়া ঠিকানা মত তাঁর বাড়িটা খুঁজে নিতে আমার বিশেষ কোন বেগ পেতে হল না। ট্রাম রাস্তার পিছনে একটা গলির মধ্য দিয়ে একটু এগিয়ে গেলে অরুণ করের বাড়ি। চমৎকার আধুনিক প্যাটার্নের কংক্রীটের তৈরী মাঝারি গোছের একখানা দ্বিতল বাড়ি ; লোহার গেট পার হলেই সামানেই একটা 'লন'—লাল সুরকি ঢালা রাস্তা বরাবর দরজা পর্যন্ত গেছে ; দু'পাশে কেয়ারী করা মেহেদির বেড়া ও নানাজাতীয় প্রচুর মরসুমী

ফুলের সৌন্দর্যের সমারোহ। তারপরই সাদা ধবধবে বাড়িখানি একটা সুমিষ্ট ফুলের গন্ধ বাতাসে ভাসিয়ে আনে।

করিডোরের সামনেই বোধ করি ড্রয়িংরুম। সূক্ষ্ম সিল্কের নেটের সবুজ পর্দা ভেদ করে ঘরের আলোর আভাস এদিকে স্পষ্ট ফুটে উঠেছে।

ড্রয়িংরুমে নিশ্চয় কারা বসে আছে মনে হল আমার, কারণ মৃদু কথা-বার্তার শব্দ শোনা যাচ্ছিল।

সহসা একটা তীক্ষ্ণ গলার স্বর শোনা গেল, না, না—এ আমি সহ্য করব না। কিছুতেই সহ্য করব না। বুঝে দেখ অরুণ, ভেবে দেখ!

চমকে উঠলাম। প্রফেসার শর্মার গলা। থমকে দাঁড়িয়ে গেলাম।

ম্রিয়মাণ কণ্ঠস্বরে অতি কষ্টে অরুণবাবু যেন জবাব দিলেন, কেন এই নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছেন মিঃ শর্মা? এর চাইতে একটুও বেশী আমি জানি না। আর জানতামও না।

তাহলে এই আমাকে বিশ্বাস করতে হবে, কর?

হ্যাঁ। কিন্তু প্রফেসার এবারে আপনাকে যেতে হবে। আমার একজন বন্ধুর এখানে আজ রাত্রে নিমন্ত্রণ আছে। হয়তো এখুনি তিনি এসে পৌঁছবেন।

আমি এগিয়ে গিয়ে দরজায় ধাক্কা দিলাম।

ভিতর থেকে আহ্বান এল, আসুন ভিতরে।

ভিতরে প্রবেশ করে দেখলাম, চমৎকার আধুনিক কেতায় সুসজ্জিত একখানি ড্রয়িংরুম, চারদিকে সোফা-কাউচ। মাঝখানে একটা শ্বেতপাথরের টেবিলে প্রকাণ্ড একটা জয়পুরী ফ্লাওয়ার ভাসে এক থোকা শুভ্র রজনীগন্ধা। বাতাসে তার মিষ্ট গন্ধ ছড়িয়ে দিচ্ছে।

আসুন, আসুন সুব্রতবাবু। অরুণবাবু বললেন, এঁকে চেনেন তো? প্রফেসার কালিদাস শর্মা—আমার বিশেষ বন্ধু।

হ্যাঁ, চিনি বৈকি।

নমস্কার সুব্রতবাবু। তারপর প্রফেসার নিঃশব্দে টুপিটা হাতে তুলে নিয়ে দরজার দিকে এগিয়ে গিয়ে বললেন, আচ্ছা শুভরাত্রি অরুণ, শুভরাত্রি সুব্রতবাবু। আমার গাড়ি গলির মুখেই আছে, আমি পিছনের দরজা দিয়েই চললাম।

প্রফেসার নিঃশব্দে বের হয়ে গেলেন। কিছুক্ষণ অরুণবাবু চুপচাপ বসে রইলেন, তারপর হঠাৎ একসময় বললেন, চা আনতে বলি সুব্রতবাবু?

না, থাক। এত রাত্রে আর চা খাব না।

আপনিও একজন ডিটেকটিভ, না সুব্রতবাবু?

না।

ভয়ঙ্কর চরিত্রের লোকগুলোকে আমার চিরকালই খুব ভাল লাগে, জানেন সুব্রতবাবু।

কেন বলুন তো?

আমার কথার কোন জবাব দিলেন না অরুণবাবু, চুপচাপ বসে রইলেন, তারপর সহসা একসময় বললেন, চলুন, পিছনের বাগানে আমাদের খাবার আয়োজন করেছি। বাগানের মধ্যে টেবিল-চেয়ার পাতা, মাথার উপর চীনা-লণ্ঠনের পীতাভ আলো। চলুন। চমৎকার আইডিয়া, না?

আমরা দুজনেই উঠলাম।

বাড়ির পিছনে ছোটখাটো একটি ফুলের ও ফলের বাগান আছে। একটা কামিনী গাছের তলায় টেবিল-চেয়ার পেতে খাবার আয়োজন করা হয়েছে।

শীতের রাত্রে এই খোলা বাগানে বসে খাওয়া...হাসি পাচ্ছিল। মাথার ওপরে গাছের ডালে ঝুলছে গোটাচারেক চীনা-লণ্ঠন। একটা পীতাভ আলোয় চারিদিক যেন স্বপ্নাতুর হয়ে উঠেছে।

এও এক অভিজ্ঞতা।

বাবুর্চি এসে টেবিলে খাবার দিয়ে গেল। গল্প করতে করতে আমরা খাওয়া শুরু করলাম। কথায় কথায় সাহিত্য নিয়ে তর্ক উঠল।

অরুণবাবু বলতে লাগলেন, রূপকথা পড়তে আমার বড় ভাল লাগে সুব্রতবাবু, একজন বন্ধুর মুখে একদিন আমি "সাত সমুদ্র তেরো নদীর পারে', রূপকথাটা শুনেছিলাম, বন্ধু আমাকে বইখানা এনে দেবেও বলেছিল। এনেও দিয়েছিল, অথচ বইখানা হিন্দীতে অনূদিত। উঃ, কি বিচ্ছিরি ঐ হিন্দী ভাষাটা! আমি দু'চক্ষে দেখতে পারি না। শেষটা আমি নিজেই একটা বাংলায় লেখা বই কিনি।

অরুণ করের কথায় আমার সহসা যেন তরতর করে দেহের সমস্ত রক্ত মাথায় গিয়ে উঠেছে বলে মনে হতে লাগল। তারপর আবার একসময় আত্মগতভাবেই তিনি বলতে লাগলেন, মানুষ মরেই, তার জন্য দুঃখ নেই। কিন্তু আমি গোলমাল ভালবাসি না। শান্তি চাই। সম্পূর্ণ শান্তি।

খাওয়া-দাওয়া শেষ হবার পর আমরা দুজনে বাগানে নানা গল্প করতে করতে ঘুরে বেড়াতে লাগলাম। মাথার উপরে নিস্তব্ধ শীতের রাত্রি। রাতের চোরা হাওয়ায় বাগানের গাছপালার পাতায় পাতায় মাঝে মাঝে সিপ্ সিপ্ শব্দ জাগে। চারিদিকে একটা অদ্ভুত থমথমে ভাব।

বাগানের এক দিকে কৃত্রিম ফোয়ারা থেকে ঝিরঝির করে জল পড়ছে। ফোয়ারার চার পাশ শ্বেতপাথরে গোল করে বাঁধানো।

ক্ষীণ অষ্টমীর চাঁদ মৃদু আলো বিকীরণ করছে শীতের আকাশের গায়ে। একটা বড় শিশু গাছের তলায় আসতেই সহসা অরুণবাবু পায়ে কি বেধে হোঁচট খেয়ে পড়ে যেতে যেতে উঃ বলে নিজেকে যেন কোনমতে সামলে নিলেন।

আমি শশব্যস্তে তাঁকে ধরে সামলাতে গিয়ে মৃদু চাঁদের আলোয় সামনের দিকে চেয়ে বিস্ময়ে আতঙ্কে নির্বাক হয়ে গেলাম। রক্তাক্ত একটা মৃতদেহ বাগানের মধ্যে ঘাসের ওপর উপুর হয়ে পড়ে আছে। গলাটা ধড় থেকে প্রায় দু ভাগ হয়ে এসেছে সামান্যর জন্য একেবারে পৃথক হয়নি।

সেই অস্পষ্ট আলো আঁধারিতেও চিনতে আমাদের কষ্ট হয়নি মৃতদেহটি কার। মৃতদেহটি প্রফেসার কালিদাস শর্মার।

একটা আর্ত চিৎকার করে হঠাৎ অরুণবাবু অজ্ঞান হয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়লেন।

অদৃশ্য আততায়ীর মরণ পরশ আবার নিঃশব্দে একজনকে গ্রাস করল।

উঃ কী ভয়ানক দৃশ্য! কী নিষ্ঠুর হত্যা! কী দানবীয় কাণ্ড!

একটা অশরীরী আতঙ্ক যেন মৃদু পদবিক্ষেপে বাগানের গাছের আড়ালে আড়ালে অন্ধকারে এগিয়ে আসছে। প্রথমটায় বেশ একটু যেন হকচকিয়েই গিয়েছিলাম, তারপর ঝরনা

থেকে জল এনে জ্ঞানহীন অরুণবাবুর চোখে-মুখে ঝাপটা দিতে লাগলাম ; কিছুক্ষণ বাদে অরুণবাবুর জ্ঞান ফিরে এল। তারপর অরুণবাবু খানিকটা সময় গুম্ হয়ে বসে থেকে একসময় হঠাৎ পাগলের মতই হাঃ হাঃ করে অদ্ভুতভাবে হাসতে শুরু করলেন।

উঃ, সে কী তীব্র হাসি! কবর ভেঙে যেন কোন অশরীরী প্রেতাত্মা এসে এখানে উন্মাদের মত হাসছে।

আমি অরুণবাবুর হাত ধরে প্রবল এক ঝাঁকুনি দিয়ে বললাম, কী হাসছেন পাগলের মত! থামুন, থামুন অরুণবাবু! অরুণবাবু, শুনছেন? আপনি কি পাগল হলেন? অরুণবাবু পূর্বের মতই উন্মাদ হাসি হাসতে হাসতে অদূরে একটা ঝোপের দিকে আঙুল দেখিয়ে বলতে লাগলেন, আমি দেখেছি তাকে সন্ধ্যাবেলা ঐ ঝোপের ধারে। আমি দেখেছি। জানি সে কে। সে মরে গিয়েও আমাদের মাঝখানে এসে দাঁড়িয়েছিল। প্রতিহিংসা! প্রতিহিংসা! হাঃ হাঃ হাঃ!

আঃ, অরুণবাবু! থামাবেন আপনার হাসি?

এবারে যেন অরুণ কর হঠাৎ হাসি থামিয়ে ফেললেন।

থেমেছি। আর হাসব না। কিন্তু আমি জানতাম যে সে মরবে। কিন্তু আমার বাড়িতেই বাগানের মধ্যে এমনি করে নিজেকে নিজে হত্যা করল!

কী পাগলের মত বকছেন যা-তা? আত্মহত্যা করলে মাথা ওরকম দেহ থেকে প্রায় পৃথক হয়ে আসতে পারে নাকি?

সহসা যেন অরুণবাবু আমার কথায় চমকে উঠলেন। কী বললেন সুব্রতবাবু...তবে সত্যি কি সে আত্মহত্যা করেনি? তবে কে তাকে এত রাত্রে খুন করে গেল অমন করে? সে নিজে নিজেকে তবে হত্যা করেনি? খুন করেছে ওকে? না, না, আত্মহত্যা করেছে ও ; হ্যাঁ, আত্মহত্যাই করেছে, আপনি জানেন না।

না। আত্মহত্যা নয়, কেউ খুনই করেছে। ভাল করে দেখুন না।

তবে কে হত্যা করলে তাকে অমন করে? কে? কে?

তা কী করে জানব? নিশ্চয়ই কেউ করেছে।

সহসা যেন অরুণবাবুর সমস্ত মুখখানা রক্তহীন পাংশু হয়ে গেল। অর্থহীন দৃষ্টিতে অদূরে অন্ধকার ঝোপের দিকে তাকিয়ে রইলেন। অদূরে ঝোপের অন্ধকারে হঠাৎ একটা যেন সিগারেটের লাল আগুন দেখা গেল। সঙ্গে সঙ্গে পায়ের শব্দও শুনতে পেলাম যেন। তারপরই পরিচিত গলার আওয়াজ কানে এল।

সুব্রত, এখানে উপস্থিত থেকেও তুমি এমন করে খুন হতে দিলে? একটু বাধা দিতে পারলে না?

কালো সার্জের সুট পরা, সিগারেট ফুঁকতে ফুঁকতে ঝোপের আড়াল থেকে ধীরপদে কিরীটী বের হয়ে এসে আমাদের সামনে দাঁড়াল।

কিরীটী, তুমি এখানে! অস্ফুট কণ্ঠে প্রশ্ন করলাম, হত্যাকারীকে তাহলে তুমি দেখতে পেয়েছ নিশ্চয়ই?

না, দেখিনি। কিন্তু অরুণবাবু অসুস্থ হয়ে পড়েছেন, আগে ওঁকে ঘরে নিয়ে যাও। তারপর বলছি কেমন করে এখানে এলাম।

আমি অরুণবাবুকে তখন চাকরদের সাহায্যে তাঁর শোবার ঘরে পৌঁছে দিলাম।

কিরীটীও পিছনে পিছনে এসে ঘরে ঢুকল।—বেচারী অত্যন্ত আঘাত পেয়েছেন এবং অসুস্থও হয়ে পড়েছেন। পাশের ঘরে ফোন আছে, একজন ডাক্তারকে ফোন করে দাও আগে সুব্রত। ইতিমধ্যে আমি একবার বাইরেটা ঘুরে আসি। ওঁর শ্বাসপ্রশ্বাস যে রকম ভাবে পড়ছে, এখুনি একজন ডাক্তার ডাকা দরকার!

কিরীটী ঘর হতে নিষ্ক্রান্ত হয়ে গেল। আমি অরুণবাবুর পাশেই বসে রইলাম।

একসময়ে চেয়ে দেখি, অরুণবাবু ক্লান্তিভরে ঘুমিয়ে পড়েছেন।

পাশের ঘরেই টেলিফোন ছিল, গাইড দেখে একজন ডাক্তারকে কল দিলাম, তারপর কিরীটীর খোঁজে বাইরে গেলাম।

বাগানে ঢুকে দেখি অন্ধকারে টর্চের আলো ফেলে কিরীটী বাগানের মধ্যে কিসের সন্ধানে যেন ঘুরে বেড়াচ্ছে।

পদশব্দে কিরীটী আমার সামনে এসে দাঁড়াল। অস্থির অসংযত চাপা স্বরে বললে, উঃ সুব্রত, আমি একটা আস্ত গাধা! সত্যি বলছি, আমি একটা গাধা। আমি ভুল লোককে পাহারা দিচ্ছিলাম এতক্ষণ। সত্যি এ ভুলের প্রায়শ্চিত্ত নেই। কিন্তু কাল রাত্রেও আমি জানতাম না সত্যিকারের খুনী কে। আমি তোমার কাছে প্রতিজ্ঞা করছি সুব্রত, কাল রাত্রের আগেই খুনীকে আমি ধরিয়ে দেব। আর তা যদি না পারি, আমি কিরীটী রায়ই নই। এস। উত্তেজনায় কিরীটীর কণ্ঠস্বর শেষের দিকে যেন কাঁপছিল।

কিছু বুঝতে পারলে? অমি প্রশ্ন করলাম।

এস তোমাকে দেখাই।

চল।

আমরা দুজনে মৃতদেহের কাছে দাঁড়ালাম বাগানে।

কিরীটী বলতে লাগল, ভাল করে চেয়ে দেখ, অস্ত্র দিয়ে গলা কেটে এঁকে খুন করা হয়নি। প্রথমে কেউ প্রফেসারকে দুবার ছোরা মেরেছে, একবার পিছন দিকে পিঠে, আর একবার পাশের পাঁজরায়। তারপর কোন ধারালো অস্ত্র দিয়ে দেহ থেকে মাথাটা পৃথক করে ফেলেছে। চেয়ে দেখ, দু'টি কশেরুকার (vertibra) মধ্যবর্তী তরুণাস্থির (cartilage) মধ্য দিয়ে আঘাত করা হয়েছে। সাধারণ লোক এভাবে আঘাত করতে পারে না। যে আঘাত করেছে, মানবদেহের গঠন-প্রণালী সম্পর্কে তার সম্পূর্ণ জ্ঞান আছে। অস্ত্রবিদ্যায় (surgery) সুপণ্ডিত না হলে এভাবে হত্যা করা একেবারেই অসম্ভব। আর wound দেখে মনে হয় এক ইঞ্চি পরিমাণ চওড়া কোন ভারী অস্ত্র দিয়ে আঘাত করা হয়েছে। অনেকটা বর্মার একপ্রকার অস্ত্রের মত। তারপর কিরীটী টর্চের আলো ফেলে দেখাল, ঐ যে সরু রাস্তাটা বরাবর বাগানের মধ্য দিয়ে বাগানের পিছনের দরজা পর্যন্ত গেছে, দেখ ওখানে রক্তের দাগ রয়েছে। খুব সম্ভব দরজার কাছাকাছি কোথাও দাঁড়িয়ে জানালা-পথে প্রফেসার তোমাদের লক্ষ্য করছিলেন, এমন সময় হত্যাকারী পিছনের দরজা দিয়ে এসে পিছন থেকে প্রফেসারকে ছোরা বসায় পিঠে। ছোরার আঘাত খেয়ে প্রফেসার সামনের দিকে চলে আসেন। সেই সময় পিছন থেকে হত্যাকারী হতভাগ্যের গলা কেটে ফেলবার চেষ্টা করে।

উঃ আর কয়েক সেকেণ্ড আগেও যদি বাগানে আসতাম কিরীটী, তবে হত্যাটা হত না। কিন্তু আশ্চর্য কোন চিৎকার বা শব্দও তো শুনতে পাইনি! দুঃখিত স্বরে বললাম।

পাওনি তার কারণ আহত ব্যক্তি চিৎকার করবারও সময় পায়নি—it was so

sudden! কিন্তু সে কথা থাক। যা হয়ে গেছে তার জন্য দুঃখ করে লাভ নেই। চল আর একবার সব ঘুরে ভাল করে দেখা যাক।

বাগানের পিছনের দরজা দিয়ে গলিপথে এসে দাঁড়ালাম দুজনে।

সামনেই একটা পোড়ো মাঠ। তার ওদিকে কতকগুলো খোলার বস্তি।

অনেক দূরে দূরে এক-একটা কেরোসিনের বাতি জ্বলছে। সাধারণতঃ এই অপ্রশস্ত পথটা কুলি-কামিন ছাড়া আর কারও দ্বারা ব্যবহৃত হয় না।

গতরাত্রে বৃষ্টি হয়েছিল, তাই এই গলিপথের কাদা এখনও শুকোয়নি। ঐ দেখ অন্ধকারে এখনও প্রফেসারের গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে। আমি জানতাম খুনী আজ এখানে আসবে, কিন্তু কেন? খুনী এখানে নিশ্চয়ই কোন ট্যাক্সিতে চেপে এসেছে, কিন্তু বাগানের দরজা পর্যন্ত আসেনি। পাছে তার ড্রাইভারের মনে কোনপ্রকার সন্দেহ জাগে। চল, এগিয়ে গিয়ে দেখা যাক কতদূর পর্যন্ত ট্যাক্সি এগিয়েছিল!

কিছুদূর এগিয়ে যাবার পরই আমরা গাড়ির চাকার দাগ দেখতে পেলাম ভিজে রাস্তার ওপর। তাহলে কিরীটীর অনুমান মিথ্যা নয়!

কিরীটী আবার বলতে লাগল, আজ রাত্রে খুনী যখন এখানে আসে তখন সে প্রস্তুত হয়েই এসেছিল ; কিন্তু যে অস্ত্র দিয়ে সে হত্যা করেছে সেটা রক্তাক্ত অবস্থায় সঙ্গে নিয়ে যায়নি, পাছে ড্রাইভারের মনে সন্দেহ জাগে। ফেলে রেখে গেছে সে সেটা নিশ্চয়ই, কিন্তু কোথায়? চল বাগানটা খুঁজে দেখি। থানায় খোঁজ নিলেই ট্যাক্সি এসোসিয়েশন থেকে আজ এমন সময় কোন ট্যাক্সি ভাড়া করা হয়েছিল কিনা অনায়াসেই জানতে পারব।

সত্যিই বাগানে খুঁজতে খুঁজতে একটা বকুল গাছের গোড়ায় ছুরিটা পাওয়া গেল।

কিরীটী বললে, থাক, ছুরিটা ধরো না ; চল অরুণবাবুর ঘরে যাই। এখুনি থানায় গিয়ে আমি হরিচরণকে এখানে পাঠাব। ভিজে মাটির বুকে অপরাধীর পায়ের দাগ নিশ্চয়ই পাওয়া যাবে। কেননা ট্যাক্সি থেকে নেমে বাকি পথটা সে হেঁটেই বাগানে এসেছিল!...এবারে চল, ভিতরে যাওয়া যাক। ঘরে ঢুকে দেখি একজন ডাক্তার এসেছে ; অরুণবাবুকে পরীক্ষা করে ওষুধের ব্যবস্থা দিয়ে তিনি বিদায় নিলে আমরা চলে এলাম।

* * *

পরের দিন সন্ধ্যার দিকে কিরীটী ফোনে আমায় একবার ডাকল, এখুনি তার ওখানে একবার যেতে হবে, খুব জরুরী। ডাঃ চট্টরাজও তার ওখানেই অপেক্ষা করছেন।

কিরীটীর ওখানে গিয়ে তার গাড়িতেই আমরা সোজা কুমারসাহেবের বাড়িতে গেলাম। দরজার গোড়াতেই ম্যানেজারবাবুর সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। তিনি বললেন, কুমারসাহেব বাড়ি নেই, আজ দুপুরের ট্রেনে নাকি মধুপুর গেছেন কী একটা জরুরী কাজে। কাল রাত্রের ট্রেনে ফিরবেন।

একসময় কিরীটী বললে, শুনেছেন ম্যানেজারবাবু, প্রফেসার শর্মা কাল রাত্রে খুন হয়েছেন?

অ্যাঁ! সে কি—কেন? কেন খুন হলেন? লোক তো খারাপ ছিলেন না নেহাৎ, তবে—; তারপর হঠাৎ কিরীটীর মুখের দিকে তাকিয়ে ব্যাকুল স্বরে বললেন, খুনীকে নিশ্চয় ধরেছেন, মিঃ রায়!

হ্যাঁ। আচ্ছা প্রফেসার শর্মা সম্পর্কে আপনাকে গোটাকতক কথা জিজ্ঞাসা করতে চাই—

আশা করি সঠিক জবাব পাব।

মৃদু হেসে ম্যানেজারবাবু জবাব দিলেন, কিরীটীবাবু কি মনে করেন, প্রফেসার শর্মার হত্যা সম্পর্কে কোন কিছু আমি জানি!

না, সেজন্য নয়, তাঁর সম্পর্কে কয়েকটা কথা জানা প্রয়োজন, তাই। আচ্ছা শুনেছি নাকি ভদ্রলোকের জন্ম ও জন্মাবার পর অনেক দিন তাঁর কাশীতেই কেটেছিল? অথচ তিনি বলতেন, তিনি বহুকাল বাংলা দেশেই আছেন এবং জন্মও নাকি তাঁর এই দেশেই! তাছাড়া অরুণবাবু যে সমস্ত চেক শর্মাকে দিতেন, আপনি নাকি সেগুলো আপনার অ্যাকাউন্টেই ব্যাঙ্ক থেকে ভাঙ্গিয়ে দিতেন? একথা কি সত্যি ম্যানেজারবাবু?

সম্পূর্ণ মিথ্যে কথা মশাই। আমার নিজের ব্যাঙ্ক-অ্যাকাউন্টে কারও চেক আমি কোনদিনই ভাঙাইনি।—

বেশ। শুনেছি তিনি একটা নাটক লিখেছিলেন এবং সেই নাটক নিয়ে থিয়েটার খুলবার জন্য কুমারসাহেবের কাছ থেকে শুভঙ্করবাবুর সাহায্যে টাকা আদায় করবার চেষ্টায় ছিলেন, এ কথা কি সত্যি?

হ্যাঁ, আমিও তা শুনেছি বটে।

আমরা 'মার্বেল হাউস' থেকে বের হয়ে গাড়িতে চেপে বিকাশ মল্লিকের বাসায় গিয়ে হাজির হলাম।

বিকাশবাবু তখন বের হবার আয়োজন করছেন, আমাদের দেখে বৈঠকখানায় নিয়ে গিয়ে বসালেন।

তারপর কিরীটীবাবু, কি মনে করে? আপনার 'কেস' কতদূর এগুলো?

আপনি প্রফেসার শর্মাকে চিনতেন, বিকাশবাবু? কিরীটী প্রশ্ন করল।

সামান্যই চেনা-পরিচয় ছিল। তাঁর সম্পর্কে প্রায়ই আমি অনেক কথা শুনতাম। উনি বেশ চমৎকার 'হিন্দী' বলতে কইতে পারতেন। শুভঙ্করবাবুর বাড়িতেই ওঁর সঙ্গে আমার আলাপ হয়। নেহাৎ মন্দ লোক বলে তাঁকে আমার কোনদিন তো মনে হয়নি! তবে একটু যেন 'হামবড়া' গোছের লোক ছিলেন। ...এরপর আরো কিছুক্ষণ কথাবার্তার পর আমরা বিদায় নিলাম।

* * *

গাড়ি কীলীঘাট ব্রীজ পার হতেই কিরীটী হীরা সিংকে বললে, টালিগঞ্জে ব্যারিস্টার চৌধুরীর বাড়ি।

মিঃ চৌধুরীকে গাড়িতে তুলে নিয়ে আমাদের গাড়ি বরাবর কলকাতা পুলিসের ময়নাঘরের সামনে এসে দাঁড়াল।

পুলিস সার্জেন ও একটা ডোম আমাদের জন্যে ঘরের মধ্যে অপেক্ষা করছিল।

পুলিস সার্জেন আমাদের আহ্বান জানালেন, শুভসন্ধ্যা, মিঃ রায়!

আপনার মৃতদেহগুলো কোন্ ঘরে থাকে? কিরীটী প্রশ্ন করল।

ঠাণ্ডি ঘরে।

শুভঙ্কর মিত্রের মৃতদেহটাও আছে বোধ হয় সেইখানেই।

হ্যাঁ, চলুন। এই কাল্লু, পরশুকার সেই গলাকাটা দেহটা ও মাথাটা স্ট্রেচারে করে বাইরে নামা!

কাল্লু চলে গেল।

সার্জেনের পিছু পিছু আমরা একটা অল্প পরিসর ঘরের মধ্যে এসে ঢুকলাম। একটা বিশ্রী উৎকট গন্ধে নাড়ি পাক দেয়। সামনেই একটা সেলফের মত আলমারিতে পর পর কতকগুলো মৃতদেহ সাজানো। কাল্লু স্ট্রেচারে করে শুভঙ্কর মিত্রের মৃতদেটা সামনে এনে নামাল আর একজন ডোমের সাহায্যে।

কিরীটী মৃতদেহটার আপাদমস্তক বেশ ভাল করে দেখে নিয়ে মৃদু হেসে বললে, না ঠিক আছে। দেহটা lock up করে রাখুন। এই নিন পুলিস কমিশনারের অর্ডার। একটা বেলে রঙের ছাপানো কাগজ সার্জেনের হাতে কিরীটী এগিয়ে দিল।

* * *

ময়নাঘর থেকে বের হয়ে আমরা সকলে সোজা বরানগরে মিঃ মিত্রের বাড়িতে এসে হাজির হলাম।

কড়া নাড়তেই মাধব এসে দরজা খুলে দিল।

ভিতরে চল মাধব। একটা শাবল যোগাড় করে আনতে পার মাধব এখুনি? কিরীটী বললে।

হ্যাঁ, কেন পারব না বাবু! চলুন।

শাবল! শাবল দিয়ে কী হবে মশাই? বিস্মিত চৌধুরী প্রশ্ন করলেন।

দরকার আছে, চলুন না। এস সুব্রত। হ্যাঁ, আর একটা লণ্ঠন জ্বলিয়ে নিয়ে এস মাধব।

॥ তেরো ॥

আমিও ভেবে পেলাম না কিরীটী হঠাৎ শাবল আনতে বললে কেন আর শাবল দিয়ে কী এমন কাজ হবে! যাহোক, একটু পরেই মাধব একটা শাবল ও একটা লণ্ঠন নিয়ে সেই ঘরের মধ্যে ফিরে এল। শাবলটা হাতে নিয়ে একটা টর্চ হাতে আমরা কিরীটীর পিছু পিছু রান্নাঘরের দিকে চললাম।

তারপর সিঁড়ি দিয়ে নেমে শুভঙ্কর মিত্রের অস্ত্রঘরের দিকে চললাম। ব্যাপার কি? কিরীটী কোথায় চলেছে? সে বলেছিল আজ সন্ধ্যার আগেই খুনীকে ধরিয়ে দেবে, কিন্তু এখানে কোথায় চলেছে? তবে কি খুনী ঐ বদ্ধ ঘরের মধ্যেই লুকিয়ে আছে নাকি কোথায়ও?

ঘরের সামনে এসে কিরীটী সদ্য চুনকাম করা দেওয়ালটার দিকে এগিয়ে গেল।—আলো উঁচু করে ধর সুব্রত, এই দেওয়ালটা খুঁড়তে হবে।

দেওয়ালটা সাত্যসত্যই সে শাবল দিয়ে খুঁড়তে লাগল। অল্পক্ষণ পরেই কতকগুলো ইট ঝুরঝুর করে পড়ে গেল। পাগলের মত শাবল দিয়ে কিরীটী চারপাশের ইট খুলতে লাগল। দেওয়ালের খানিকটা ভেঙে একটা গর্ত মত দেখা গেল।

সেই গর্তের মধ্যে পা দিয়ে উঠে দাঁড়িয়ে, কিরীটী শাবল দিয়ে কিসের ওপর আঘাত করল। ঠক করে একটা শব্দ হল। শাবলের সাহায্যেই চাড় দিয়ে কি যেন ভেঙে ফেলল। তারপর পকেট থেকে টর্চটা বের করে সেই গর্তের মুখে ফেলে আমাদের ডাকল, আসুন মিঃ চৌধুরী, চেয়ে দেখুন ঐ কাঠের বাক্সর মধ্যে। চেয়ে দেখুন তো, আপনার মক্কেল সত্যিকারের শুভঙ্কর মিত্রকে চিনতে পারেন কি না? ঐ—ঐ হচ্ছে সত্যিকারের শুভঙ্কর মিত্র।

আর একটু আগে ময়নাঘরে যাকে দেখে এলাম, সে কে জানেন? কিরীটী আমাদের মুখের দিকে চেয়ে বলতে লাগল, কুমার দীপেন্দ্রনারায়ণের কাকা—রাঁচি পাগলা গারদের পলাতক স্যার দিগেন্দ্র নারায়ণ।

মিঃ চৌধুরী একপ্রকার চিৎকার করে উঠলেন, অসম্ভব! আপনি কি পাগল হলেন, মিঃ রায়?

না, পাগল আমি হইনি।

একটা ভীষণ দুর্গন্ধে সেখানকার সমস্ত বাতাস বিষাক্ত হয়ে উঠেছে। একটা পচা গলা মৃতদেহ বাক্সের মধ্যে বীভৎস আকারে পড়ে আছে। কিন্তু বিকৃত হলেও বুঝতে কষ্ট হয় না যে, একটু আগে যে দেহটা ময়নাঘরে দেখে এলাম তার সঙ্গে এই মৃতদেহের খুব সামান্যই পার্থক্য আছে। হুবহু একেবারে মিল, যেন দুটি যমজ ভাই!

এই কি তবে বিশ্বাস করতে বলেন মিঃ রায় যে, মিঃ চৌধুরী বলতে লাগলেন, স্যার দিগেন্দ্র আসল শুভঙ্করকে হত্যা করে এইখানে তার মৃতদেহ লুকিয়ে রেখে এতদিন ধরে শুভঙ্কর সেজে বেড়াচ্ছিল?

আমারও যেন সব কেমন গোলমাল হয়ে যাচ্ছিল। আমি বললাম, তাহলে অন্য কেউ স্যার দিগেন্দ্রকে খুন করেছে এবং তারপর প্রফেসার শর্মাকে সে-ই খুন করেছে?

কিরীটী মৃদু হেসে বললে, চলুন, সব কথা এবারে খুলে বলব—ওপরে চলুন।

আমরা সকলে ওপরে এসে শুভঙ্কর মিত্রের শয়নঘরে বসলাম। মাধব একটা টেবিল-ল্যাম্প জ্বেলে দিয়ে গেল।

কিরীটী মাধবকে বললে, গাড়িতে আমার একটি অ্যাটাচি-কেস আছে, ড্রাইভারের কাছ থেকে সেটা নিয়ে এস তো মাধব।

মাধব কিরীটীর নির্দেশ পালন করতে চলে গেল।

এবারে কিরীটী বলতে লাগল, আপনারা সকলে খুব আশ্চর্য হয়েছেন না? প্রথম থেকেই হত্যার ব্যাপারে আপনারা ভুল পথে ছুটে চলেছিলেন, কিন্তু একটু ভেবে দেখলেই ব্যাপারটা বুঝতে পারতেন।

স্যার দিগেন্দ্র কোন একটা কারণে শুভঙ্কর মিত্রের ছদ্মবেশ নিয়েছিলেন। পাটনায় যখন আসল স্পোর্টসম্যান মিঃ শুভঙ্কর মিত্র ছিলেন, সেই সময় তাঁর সঙ্গে স্যার দিগেন্দ্রর কোন সূত্রে হয়তো আলাপ হয়। স্যার দিগেন্দ্র অত্যন্ত চতুর এবং বুদ্ধিমান ব্যক্তি ছিলেন। তিনি অবিকল তাঁর মত দেখতে এমন একটি লোককে খুঁজে বেড়াচ্ছিলেন। এমন সময় মিঃ মিত্রের সঙ্গে তাঁর বোধ হয় আলাপ-পরিচয় হয় এবং স্যার দিগেন্দ্র লক্ষ্য করলেন মিঃ মিত্র অবিকল তাঁরই মত দেখতে শুধু তাঁর নিজের নাকটা একটু ভোঁতা আর মিঃ মিত্রের নাকটা চোখা। স্যার দিগেন্দ্রর ফ্রেঞ্চকাট কালো দাড়ি আছে, মিঃ মিত্রের তা নেই। নাকের খুঁতটা স্যার দিগেন্দ্র ডাঃ রুদ্রের সাহায্যে অপারেশন করে ঠিক করে নিলেন এবং চেহারা বদলাবার আগে স্যার দিগেন্দ্রর পক্ষে মিঃ মিত্রের সঙ্গে কয়েক সপ্তাহ খুব ঘনিষ্ঠভাবে মিশে তাঁর স্বভাবচরিত্র, ভাবগুলো অনুকরণ করে নিতে এতটুকুও বেগ পেতে হয় নি। কিন্তু এত করেও একটা জিনিস স্যার দিগেন্দ্রর চোখে ধরা পড়েনি, সেটা হচ্ছে মিঃ মিত্রের ডান কানের কাছে ছোট সিকি-ইঞ্চি পরিমাণ লাল জড়ুল-চিহ্ন। এই ঘরে মিঃ মিত্রের ফটো দেখে সেইটা আমার নজরে পড়ে, আমি তখনি মিলিয়ে দেখবার জন্য ময়নাঘরে ছুটে যাই। কিন্তু মৃত ব্যক্তির

ডান কানের নীচে কোন জড়ুল-চিহ্ন পাই না। এতেই বুঝলাম যে কুমারসাহেবের বাড়িতে যে খুন হয়েছে সে মিঃ মিত্র নিশ্চয়ই নয়, জন্মের দাগ কখনও মিলায় না। তখন ভাবতে লাগলাম মৃতব্যক্তি যদি মিঃ মিত্র নাই হয়, তবে আসল মিঃ মিত্রই বা কোথায় এবং এই মৃত ব্যক্তিই বা কে? এদিকে এই বাড়ির অস্ত্রঘরের সামনে গিয়ে দেখলাম, একটা দেওয়ালে নতুন চুনকাম করা হয়েছে। সন্দেহ হল সমস্ত দেওয়াল বাদ দিয়ে এক জায়গায় মাত্র চুনকাম করা হয়েছে কেন? তবে কি ঐ চুনকাম করা দেওয়ালের আড়ালে কোন রহস্য লুকিয়ে আছে?

ভাবতে লাগলাম। এদিকে মিঃ মিত্র খুব ভাল হিন্দী জানতেন। অথচ স্যার দিগেন্দ্র হিন্দী জানতেন না। তিনি কয়েক মাস হয়তো পাটনায় থেকে কোন একজন মাস্টার রেখে হিন্দীটা আয়ত্ত করে নিয়েছিলেন মাত্র, কিন্তু তাতে করে কাজ চললেও ছদ্মবেশের কাজ চালানো যায় না।

তবে কি হিন্দীভাষায় অনূদিত "সাত সমুদ্র তেরো নদীর পারে" বইখানা তাঁরই? আমি এবারে উৎকণ্ঠিত ভাবে প্রশ্ন করলাম।

হ্যাঁ। কিরীটী আবার বলতে লাগল, এসব ছাড়াও তিনি নতুন করে আফিং খেতে শুরু করেছিলেন, কেননা মিঃ মিত্রের নাকি আফিংয়ের নেশা ছিল। তাছাড়া এই ঘটনা ঘটবার আগের দিন নকল মিঃ মিত্র ও কুমারসাহেব স্যার দিগেন্দ্রর বেনামীতে দুজনে দুখানা চিঠি পান। সে হাতের লেখাও মিলিয়ে দেখছি, সেই লেখা স্যার দিগেন্দ্রর হাতের লেখার সঙ্গে হুবহু মিলে যায়। পুলিশের ফাইলে স্যার দিগেন্দ্রর হাতের লেখার নমুনা ছিল। সেই চিঠিগুলো একপ্রকার সবুজ কাগজে পেনসিল দিয়ে লেখা। পেনসিল পরীক্ষা করে দেখা হয়েছে। পেনসিল সাধারণত চার শ্রেণীর হয়। 'কারবন', 'সিলিকেট' ও 'লোহা' দিয়ে মিশিয়ে যে পেনসিলের সীস্ তৈরী হয় তার লেখা সাধারণত ধূসর কালো রংয়ের হয়। 'গ্রাফাইট', 'সিলিকেট' ও 'লোহা দিয়ে যে পেনসিলের সীস্ তৈরী হয় তার লেখা সাধারণত বেশ ঘন কালো রংয়ের হয়। রংয়ের পেনসিলগুলো সাধারণত ওর সঙ্গে রং মিশিয়ে তৈরী হয়। আর কপিং পেনসিল তৈরী হয় 'অ্যানিলিন রং', 'গ্রাফাইট্' ও 'কেওলিন' দিয়ে। পেনসিল দিয়ে লেখা সেই চিঠিটার গায়ে 'অ্যাসিটিক এসিডের' ও ফেরোসায়োনাইডের একটা সলুশন ঢেলে দেওয়া হয়—তার ফলে লেখাগুলো একটা রাসায়নিক ক্রিয়ায় রঙীন হয়ে যায়। মাইক্রোসকোপ দিয়ে পরীক্ষা করে বুঝতে পারা গেছে, ঐভাবে লেখা সাধারণত রঙীন হওয়া উচিত নয়। ঐ সলুশন দিয়ে এবং ঐ রং দেখেই আমরা ধরতে পেরেছি কোন্ শ্রেণীর পেনসিল দিয়ে চিঠিটা লেখা হয়েছিল। বোঝা যায় লেখাটা কপিং পেনসিল দিয়েই লেখা হয়েছিল এবং সাধারণত এইচ. এইচ. কপিং পেনসিল দিয়ে লিখলে ঐ ধরনের লেখা হয়। সুব্রত, বোধ হয় মনে আছে, ঐ ধরনের একটা পেনসিল এ বাড়িতেই আমি পেয়েছি ডেস্কে, গতকাল বলেছিলাম। এখন বুঝতে পারছ, সেই পেনসিলটা দিয়েই ওই দুখানা চিঠি লেখা হয়েছিল।

এই পর্যন্ত বলে কিরীটী মাধবের আনীত অ্যাটাচি-কেস থেকে "সাত সমুদ্র তোরো নদীর পারে" বইখানা বের করল। এই বইখানা নিয়ে মিঃ মিত্র প্রায়ই অরুণ করের সঙ্গে আলোচনা করতেন এবং এই বইখানা কুমারসাহেবের খাবার ঘরে চেয়ারের ওপর পাওয়া যায়। স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে প্রথম পাতায় একটা নাম লেখা ছিল, তারপর রবার দিয়ে ঘষে সেটা তুলে

ফেলা হয়েছে। আমরা এটারও ফটোগ্রাফ নিয়ে পরীক্ষা করেছি। ফটো নেওয়া হয়েছিল 'অরথোক্রোম্যাটিক প্লেটে' ; একটা নেগেটিভ তোলা হয় এবং তাকে ছোট করে 'পারক্লোরাইড অফ মারকারি' দিয়ে জোরালো করা হয়। তারপর সেটা শুকোলে ফ্রেমে বসিয়ে তার সঙ্গে লাগিয়ে আর একটা প্লেটে ফটো নেওয়া হয়। এইভাবে প্রায় ছ-সাত বার ফটো নেওয়া। ফটোয় কি নাম পাওয়া গেছে দেখুন!

আমরা সকলে নেগেটিভের দিকে বিস্ময়ে হ্যাঁ হয়ে গেলাম! পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে তাতে লেখা—দিগেন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী। এরপরও অবিশ্বাস করা চলে না যে, স্যার দিগেন্দ্রনারায়ণই স্বয়ং আমাদের ছদ্মবেশী মৃত মিঃ শুভঙ্কর মিত্র! তবে এখন প্রশ্ন ওঠে, আসল শুভঙ্কর মিত্র কোথায়? স্যার দিগেন্দ্র তাঁকে খুন করেন। কিন্তু কোথায় তবে মিঃ মিত্র খুন হলেন? বিকাশবাবু গত ডিসেম্বর মাসে পাটনা থেকে মিঃ শুভঙ্কর মিত্রকে পাঞ্জাব এক্সপ্রেসে ফিরে আসতে দেখেছিলেন। এবং পাটনা থেকে ফিরে এসেই কিছুদিন পরে মিঃ মিত্ররূপী স্যার দিগেন্দ্র কুমারসাহেবের কাছে চাকরি নেন। তাহলে বোধ হয় ট্রেনের মধ্যেই স্যার দিগেন্দ্র কাজ সারেন এবং আসল মিঃ মিত্রের মৃতদেহটা খেলাধুলার সাজ-সরঞ্জাম রাখবার বড় বাক্সর মধ্যে ভরে সঙ্গে নিয়ে আসেন।

বিখ্যাত শিকারী ও স্পোর্টসম্যান হিসাবে মিঃ মিত্র সর্বত্রই সুপরিচিত। অতএব বিনা হাঙ্গামায় বাক্সবন্ধ হতভাগ্য মিত্রের মৃতদেহটা নিয়ে আসতে তাঁকে এতটুকুও বেগ পেতে হয়নি। মৃতদেহ রাস্তায় ফেলতে পারেননি পাছে তাঁর প্ল্যান ভেস্তে যায়। মৃতদেহ সঙ্গে করেই এনেছেন। কিন্তু কোথায় রাখবেন—এই হল তাঁর সমস্যা। এইখানেই তিনি সব চাইতে বুদ্ধির খেলা দেখালেন, মিঃ মিত্রের মৃতদেহ মিঃ মিত্রের বাড়ীতে লুকিয়ে রাখলেন। এখানে এসেই আগে তিনি পুরাতন চাকরদের বিদায় করে মাধবকে রাখলেন, পাছে তাঁকে কেউ সন্দেহ করে। তারপর এখানে এসে যখন তিনি মিঃ মিত্রের বন্ধুদের সঙ্গে মিশতে গেলেন তখন তিনি দেখলেন—সেদিনকার ঘটনা আমরা মিঃ চৌধুরীর মুখেই শুনেছি, কেননা মিঃ চৌধুরী সেদিন উপস্থিত ছিলেন, এবং সে রাত্রে প্রফেসার শর্মার কথা শুনতে শুনতে হঠাৎ মিঃ মিত্র কেমন অসুস্থ হয়ে পড়ে যান তাও আমরা জানি। মিঃ মিত্ররূপী স্যার দিগেন্দ্র নিমেষে বুঝতে পারলেন সে রাত্রে অসাধারণ চতুর আসল মিঃ মিত্রের শিশুকালের বন্ধু প্রফেসার শর্মার চোখে তিনি ধূলো দিতে পারেননি। তিনি তাঁকে চিনে ফেলেছেন। এখানে এসে অরুণ করের সঙ্গে আলাপ হয়ে স্যার দিগেন্দ্র ঠিক করেন অরুণের মাথায় হাত বুলিয়ে বেচারীর টাকা কটা বাগাতে হবে, কেননা মিঃ মিত্রের অনুসন্ধান নিয়ে দেখলেন মিঃ মিত্রের আর্থিক অবস্থা অত্যন্ত খারাপ ছিল। খুনের রাত্রে বোধ করি টাকার কথা বলবার জন্যই তাঁকে লুকিয়ে ওপরের ঘরে এসে দেখা করতে বলেন এবং টাকা ধারের কথা মিঃ চৌধুরীকেও বলেন। তাঁর ইচ্ছা ছিল আর একটা কোন জায়গা থেকে প্রচুর অর্থ নিয়ে এবং অরুণ কর ও হতভাগ্য মৃত মিঃ মিত্রের ঘরবাড়ি বন্ধক রেখে প্রভূত অর্থ নিয়ে এদেশ ছেড়ে চিরতরে চম্পট দেবেন।

মিঃ চৌধুরী কিরীটীর কথায় কেঁপে উঠলেন।

কিরীটী বলতে লাগল, কিন্তু এর মধ্যে তার চাইতেও চতুর আর এক চতুর চূড়ামণি এসে দেখা দিলেন। তিনি হচ্ছেন আমাদের হতভাগ্য প্রফেসার শর্মা!

সেইজন্য প্রায়ই প্রফেসার শর্মা এখানে আসতে লাগলেন মৃতদেহের খোঁজে। কেননা তখনও তিনি বুঝতে পারেননি যে স্যার দিগেন্দ্র মৃতদেহ কোথায় কী ভাবে লুকিয়ে রাখতে

পারেন। একটু ভাবলেই বোঝা যায় এবং তাই ভেবেই হয়তো মিঃ শর্মা অনুমান করেছিলেন নিশ্চয়ই, এ বাড়িরই কোথায়ও তাঁর মৃতদেহ লুকিয়ে রাখা হয়েছে, কেননা সেটাই হবে সবচাইতে বুদ্ধিমানের কাজ। কিন্তু কোথায়? বাগানে? না, তাতে লোক-জানাজানি হবে। সবচাইতে ভাল হবে অস্ত্রাগারে। কেননা সেটা সব চাইতে নির্জন।

মিঃ মিত্র যে আসল নয় জাল এবং খুঁজতে খুঁজতে অস্ত্রঘরেই যে সে লুকানো আছে প্রফেসার শর্মা এই ঠিক করলেন এবং দেখলেন এ মজাই হল—তিনি কোন কিছু না ভেঙে সুযোগের অপেক্ষায় রইলেন, কেননা তাঁরও অবস্থা তখন চাকরিবাকরি না থাকার দরুন 'অদ্যভক্ষো ধনুর্গুণঃ'। তাছাড়া অরুণ করের টাকায় তাঁর মত একজন অতি বিলাসী লোকের চলাও সম্ভবপর ছিল না।

॥ চৌদ্দ ॥

কিরীটী অল্পক্ষণের জন্য এবারে একটু থামল। তারপর সহসা চেয়ার ছেড়ে উঠে হাসতে হাসতে বললে, এবার চলুন বন্ধুরা, কুমারসাহেবের মার্বেল প্যালেসের দিকে যাওয়া যাক। অকুস্থানে বসেই আমার রহস্যের ওপর যবনিকা টানব।

তখুনি আমরা গাড়িতে চেপে রওনা হলাম। এবং রাত্রি প্রায় সোয়া বারোটায় আমরা সকলে বেহালায় কুমারসাহেবের মার্বেল প্যালেসের সামনে এসে নামলাম। একটা সুমধুর হাওইন গিটারে সুরের আলাপ কানে ভেসে এল। চকিত অতীতের অন্ধকারে যেন আলোর রশ্মি এসে পড়ল। এই সুর কোথায় শুনেছি! এ যে বহুকালের চেনা! আশ্চর্য, এত রাত্রেও নীচের হলঘরে আলো জ্বলছে দেখতে পেলাম।

ঘরে ঢুকে আরও আশ্চর্য হয়ে গেলাম।

কুমারসাহেব!

অথচ শুনেছিলাম আজই বিকেলে যে, তিনি আজ দুপুরে মধুপুর চলে গেছেন।

একটা সোফার ওপর গা এলিয়ে দিয়ে কুমারসাহেব হাওইন গিটার বাজাচ্ছেন।

কিরীটী ঘরে ঢুকেই উল্লাসভরা কণ্ঠে বললে, শুভরাত্রি ডাঃ স্যান্যাল।

আমাদের এতগুলো লোককে এত রাত্রে ঘরে ঢুকতে দেখে বাজনাটা হাতেই কুমারসাহেব সোফা ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন, তারপর সহসা কিরীটীর হাতের দিকে নজর পড়তেই চমকে উঠলেন যেন।

হাত তুলুন! কিরীটীর গলা শুনে তার হাতের দিকে চেয়ে দেখি কিরীটীর হাতে চকচক করছে একটা রিভলবার।

সুব্রত, এগিয়ে গিয়ে ডাক্তারের পকেট থেকে রিভলবারটা বের করে নাও। আর এই নাও, এই সিল্ক-কর্ডটা দিয়ে ওঁর হাত দুটো শক্ত করে বেঁধে ফেলো।

আমি এগিয়ে গিয়ে কুমারসাহেবের পকেট থেকে রিভলবারটা বের করে হাত দুটো কিরীটীর দেওয়া সিল্ক-কর্ড দিয়ে বেঁধে ফেললাম।

এসবের মানে কি কিরীটীবাবু? ক্ষুণ্ণস্বরে কুমারসাহেব বললেন।

বসুন আপনারা সবাই। শুনুন ডাক্তার সান্যাল ওরফে কালো ভ্রমর, ওরফে ছদ্মবেশী কুমারসাহেব। স্যার দিগেন্দ্রনারায়ণ ও প্রফেসার শর্মার হত্যাপরাধে আপনাকে আমি গ্রেপ্তার

করলাম। কিন্তু ডাক্তার, এতখানি জঘন্যতা আপনার কাছে আমি আশা করিনি কোন দিনও। বরাবর একটা শ্রদ্ধা আপনার ওপরে আমার ছিল। আপনারা হয়তো ভাবছেন ওঁকে আমি চিনলাম কী করে, না? মাত্র দুটি কারণে, এক নম্বর ওঁর হাতের লেখা দেখে, যার নমুনা এখনও আমার কাছে আছে। মনে পড়ে তোমাদের, মৃত স্যার দিগেন্দ্রর পকেটে হলুদে রংয়ের তুলট কাগজ গোটা দুই পাওয়া গিয়েছিল? এই দেখ সেই কাগজ। আর এই দেখ এতে ভ্রমর আঁকা। এই চিঠি পেয়েই গতরাত্রে মিঃ মিত্ররূপী স্যার দিগেন্দ্র ওঁকে চিনতে পারেন যে উনি কালো ভ্রমর।

উনি যে কুমার দীপেন্দ্র নন, স্যার দিগেন্দ্র প্রথম দর্শনেই তা টের পেয়েছিলেন, পাঁচ বছর আগে প্রথম যেদিন উনি ভাইপোর পরিচয়ে তাঁর কাছে আসেন। কিন্তু তখন তিনি কোন কথা প্রকাশ করেননি। ইচ্ছা ছিল গোপনে একদিন তিনি এঁকে শেষ করবেন, কিন্তু তাঁর সে চেষ্টা নিষ্ফল হয় এবং পাগলা গারদে তাঁকে যেতে হয় এঁরই প্রচেষ্টায়। সেই থেকে তিনি উপায় খুঁজছিলেন কেমন করে সে অপমানের প্রতিশোধ নেবেন! তাঁর ইচ্ছা ছিল এঁকে সরিয়ে টাকা হাতিয়ে সরে পড়বেন। কিন্তু দুর্ভাগ্য তাঁর, যে পরিচয়ে তিনি এখানে এসেছিলেন আমাদের তীক্ষ্ণবুদ্ধি অসাধারণ চতুর ও কৌশলী কালো ভ্রমরের চোখে তা ধরা পড়ে গেল। কিন্তু প্রফেসার শর্মাও এঁর আসল পরিচয় পাননি। তার ফলেই তিনি এঁকে উৎসাহিত করেছিলেন মিঃ মিত্ররূপী স্যার দিগেন্দ্রকে হত্যা করবার জন্যে। তিনি স্যার দিগেন্দ্রর আসল পরিচয় এঁর কাছে বলেছিলেন ; এবং এও তাঁর ধারণা ছিল ইনি অর্থাৎ কুমারসাহেব নিজেও আসল কুমারসাহেব নন ; এবং সে কথা এক দিগেন্দ্র ও প্রফেসার শর্মা ছাড়া আর কেউ জানতে পারেনি। কিন্তু কেউই জানতেন না যে ইনি ছদ্মবেশী স্বয়ং কালো ভ্রমর। তাহলে হয়তো কেউ এতটা উৎসাহিত বোধ করতেন না। ভেবেছিলেন ইনি সামান্য একজন প্রতারক মাত্র। প্রফেসারের ইচ্ছা ছিল এঁকে দিয়ে স্যার দিগেন্দ্রকে খুন করিয়ে এঁকে হাতে রেখে যখন-তখন blackmail করে প্রচুর অর্থলাভ করবেন, অথচ নিজে এর মধ্যে জড়াবেন না।

প্রথম থেকেই আমি জানতাম খুনী স্বয়ং কালো ভ্রমর। এবং তিনি ছদ্মবেশী কুমারসাহেব! কিন্তু সেই চিঠি থেকে প্রমাণ হল কী করে ইনি স্বয়ং কালো ভ্রমর! এঁর হাতের লেখা এঁদের স্টেটের ফাইলে পেয়েছি, তা ছাড়া গতকাল উনি যে কমিশনার সাহেবকে দশ হাজার টাকা পুরুস্কার ঘোষণা করে ফর্ম সই করে এসেছেন, সেই লেখার সঙ্গে কালো ভ্রমরের চিঠির হুবহু মিল হয়ে গেছে। উনি বর্মায় থাকতেই hashish সিগারেট খেতেন তা আমি জানতাম।

দু নম্বর কারণ সেই ছুরিটা, যেটা আমরা অরুণ করের বাগানে দেখি। সেটা বর্মী অস্ত্র। সেখানকার লোকেরা ঐ ধরনের অস্ত্র খুনখারাপি করতে ব্যবহার করে। কিন্তু কথা হচ্ছে, এঁকে অপরাধী বলে মনে হল কেন? মনে আছে তোমাদের, মৃত স্যার দিগেন্দ্রর আঙুলের নখে একটা জিনিস পাওয়া গিয়েছিল, সে হচ্ছে কালো রংয়ের সার্জের প্যান্টের সুতো। সেই সুতো এঁর প্যান্টের কাপড়ের সুতোর সঙ্গে অবিকল মিলে গেছে। গতকাল উনি যখন প্রফেসার শর্মাকে খুন করে রক্তাক্ত জামা-কাপড়ে এখানে ফিরে আসেন, সেই কোট-প্যান্ট উনি সরিয়ে ফেলবার অবকাশ পাননি। হরিচরণ ওঁর শয়নঘরের সোফার নীচে পেয়ে নিয়ে গেছে ওঁর অবর্তমানে ম্যানেজারকে ঘুষ দিয়ে আজ দ্বিপ্রহরে এখানে এসে। সেই প্যান্টের সুতোর সঙ্গে মৃত স্যার দিগেন্দ্রর নখের মধ্যে আটকে ছিল যে সুতো দুটো অবিকল মিলে গেছে।

ট্যাক্সি-ড্রাইভারকে ধরে জানা গেছে সে এই বাড়িতে একজনকে পৌঁছে দিয়ে গিয়েছিল কাল রাত্রে। তা ছাড়া সেই বাগানের ছুরিটার হাতলে যে আঙুলের ছাপ ছিল এবং এঁর আঙুলের ও কালো ভ্রমরের আঙুলের যে ছাপ আমার কাছে আছে, তার সঙ্গে হুবহু মিলে গেছে। তাছাড়া তোমার মনে পড়ে সুব্রত, প্রফেসার শর্মাকে যে ভাবে হত্যা করা হয়েছে, সে সাধারণ লোকের পক্ষে সম্ভব নয়, ডাক্তার বলেই ওভাবে হত্যা করা এঁর পক্ষে সম্ভব হয়েছিল! স্যার দিগেন্দ্র যে মুহূর্তে চিনতে পেরেছিলেন তাঁর ভাইপো আসলে কে, তখনই তিনি প্রাণভয়ে ব্যাকুল হয়ে উঠেছিলেন। কিন্তু ইনিও তখন বুঝতে পেরেছেন, জীবনে যে জঘন্য কাজ কোন দিনও করেননি আজ তাই তাঁকে করতে হবে। স্যার দিগেন্দ্র যদি একবার হাতের বাইরে চলে যান তবে তাঁর পক্ষে এই ছদ্ম পরিচয়ে বাঁচা আর সম্ভব হবে না। তাই চির-জীবনের মত স্যার দিগেন্দ্রকে পথ থেকে সরিয়ে দেবার মনস্থ করেছিলেন। এইবার ডাক্তার সান্যাল দয়া করে বলুন, মিঃ মিত্রকে কিভাবে খুন করেছিলেন সে রাত্রে? কেননা ও ব্যাপারটা এখনও আমার কাছে রহস্যাবৃতই রয়ে গেছে। এখনও বুঝে উঠতে পারছি না।

ডাঃ সান্যাল মৃদু হাসলেন, চমৎকার বুদ্ধি আপনার মিঃ রায়! সম্পূর্ণ হার মানলাম আপনার বুদ্ধির কাছে। সত্যিই আমি কালো ভ্রমর, ডাঃ এস. সান্যাল। কুমারসাহেব আমি নই, কোনদিন ছিলামও না। আপনি অনেক কিছু জানেন বা জানতে পেরেছেন, কিন্তু একটা কথা এখনও জানেন না। সেটা হচ্ছে এই, দিগেন্দ্রর অতীত ইতিহাস। এই দিগেন্দ্র এতকাল এই কলকাতায় থেকে আমারই দলে কাজ করত। সে ছিল আমার কলকাতার দলের প্রতিভূ। সেবার আপনাদের যখন আমি বর্মায় নিয়ে যাই, দিগেন্দ্র তখন সেখানে। সে-ই বনমালী বসু * নাম নিয়ে সনৎবাবুকে তাঁদের আমহার্স্ট স্ট্রীটের বাসা থেকে চুরি করে আনে। 'মৃত্যুগুহায়' সে রাত্রে আমি একজাতীয় বুনো গাছের তৈরী ঔষধ শরীরে ফুটিয়ে পাঁচ ঘণ্টার জন্য অজ্ঞান থেকে আপনার হাত থেকে বাঁচবার চেষ্টা পাই এবং আপনারা আমাকে ইরাবতীর জলে ভাসিয়ে দিয়ে আসেন। আমার অন্যতম বিশ্বস্ত অনুচর রামু ইরাবতীর মধ্যেই খানিকটা দূরে নৌকো নিয়ে অপেক্ষা করছিল, আমায় তুলে বাঁচায় সে। আমার পরিধানে তখন ছিল রবারের পোশাক। তাই জলে ভেসেছিলাম, ডুবিনি। আর ঐ ঔষধটার এমন গুণ ছিল যে, জল মুখে ঢুকলে তার কাজ নষ্ট হয়ে যায়। আমি সব রকম কিছু ভেবে আগে থেকেই সে রাত্রে প্রস্তুত হয়ে গিয়েছিলাম, সবই pre-arranged.

কয়েক দিন পরে একটু সুস্থ হয়ে ধনাগারে খোঁজ নিতে গিয়ে দেখি ধনাগার শূন্য, একটা কপর্দকও নেই। বর্মায় ফিরে এসে দেখি দিগেন্দ্র উধাও। ব্যাপার সব বুঝলাম। প্রতিশোধের হিংসায় জ্বলেপুড়ে মরতে লাগলুম। তারপর সেখান থেকেই দিগেন্দ্রকে একটা চিঠি দিই, ওই চিঠিটা এইজন্য দিয়েছিলাম, যাতে দিগেন্দ্র জানতে পারে আমি বেঁচে উঠেছি এবং ভয়ে ধনরত্নগুলো ফিরিয়ে দেয়। কিন্তু he was clever, তাই চুপচাপ রয়ে গেল, আমার চিঠির কোন জবাবই দেওয়া প্রয়োজন বোধ করলে না।

হ্যাঁ হ্যাঁ, মনে পড়েছে বটে, আমরা পরের দিন ধনাগারে ধনরত্ন আনতে গিয়ে দেখি ধনাগার শূন্য, কিছুই নেই। কিরীটী বললে।

তখন ডাক্তার আবার বলতে লাগলেন, কিন্তু মূর্খ সে, তাই আমার কথায় কান দিল

---

* 'কালো ভ্রমর' দ্বিতীয় ভাগ দ্রষ্টব্য। —লেখক

না। ওর সব ইতিহাস আমি জানতাম, সুতরাং ওর মৃত ভাইপোর পরিচয়ে এখানে এসে ঢুকলাম। বুঝলাম ও আমায় সন্দেহ করেছে, এবং পরে টের পেলাম ও আমাকে মারবার জন্যে প্রস্তুত হয়ে সুযোগ খুঁজছে। কিন্তু মারতে এসে একদিন সে ধরা পড়ে গেল, ও নিজেকে সাফাই করবার জন্য পাগলের ভান করলে। কিন্তু আমার চোখকে ফাঁকি দিতে পারল না।

ধরা পড়ল এবং ওকে গারদে পাঠালাম। কিন্তু আবার গারদ ভেঙে ও পালাল। খুন করা আমি চিরদিন ঘৃণা করি। কিন্তু নরাধম আমাকে বাধ্য করলে ওকে খুন করতে। কিন্তু প্রফেসার শর্মা একদিন আমাকে এসে বললে মিঃ মিত্রের আসল পরিচয় কী। কিন্তু নির্বোধ জানত না এ সংবাদ তার ঢের আগেই আমার জানা হয়ে গেছে। আমিও দেখলাম, ও যখন জেনেছে তখন ওকে বাদ দিয়ে কাজ করা তো চলবে না! এইখানেই আমার সব চাইতে বড় ভুল হল। মুর্খ আমাকে পেয়ে বসল। আমিও নিরুপায় হয়ে কিল খেয়ে কিল হজম করতে লাগলাম। প্রায়ই ও আমার কাছ থেকে টাকা নিত। কেননা আমি যে আসল কুমার নই সে ও টের পেয়েছিল। আসল কাজ হবে না ভেবে ওকে টাকা দিয়ে আমি নিরস্ত রেখেছিলাম। ভবিষ্যতে একদিন ওর পাওনা মেটাব বলে। প্রফেসার যখনই জানতে পারে আসল মিঃ মিত্র আমার সেক্রেটারী নয় এবং আসলে যে স্যার দিগেন্দ্র, তখন থেকেই সে উল্লাসে নাচতে লাগল। আমার জন্মোৎসবের রাত্রে সকলেই এখানে আমরা উপস্থিত, ছদ্মবেশী স্যার দিগেন্দ্র, আমি, প্রফেসার শর্মা।

এবার হয়েছে, আমাকে বলতে দিন ডাক্তার। কিরীটী সহসা বলে উঠল।

বলুন। ডাক্তার মৃদু হেসে জবাব দিলেন, কিন্তু হাতের বাঁধনটা খুলে দিতে বলুন। ভয় নেই, পালিয়ে বাঁচবার ইচ্ছা আর আমার নেই। পর পর দু-দুটো খুন করে এ জীবনে আমার ঘৃণা হয়ে গেছে। কুমারসাহেব ও আমার নিজের উপার্জিত সমস্ত সম্পত্তি আমি গতকালই উইল করে জনসাধারণের মঙ্গলের জন্য দান করে দিয়েছি, আর তার অছি নিযুক্ত করেছি কাকে জানেন?

কিরীটী অধীর স্বরে বললে, কাকে?

আমার জীবনের সব চাইতে বড় শত্রু ও সবার বড় বন্ধু আপনাকে ও সুব্রতবাবুকে।

ধন্যবাদ ডাক্তার। কিরীটী বললে।

এর পর ডাক্তারের হাত-পায়ের বাঁধন খুলে দেওয়া হল। মূহূর্তকাল কিরীটী চুপ করে রইল। তারপর আবার ধীরস্বরে বলতে লাগল, তাহলে এঁদের কৌতূহলটা মিটিয়ে দিই। হ্যাঁ শুনুন আপনার সেক্রেটারী অর্থ্যাৎ স্যার দিগেন্দ্র ৮.৫৫ মিনিট পর্যন্ত আপনার খাবার ঘরেই ছিলেন। তারপর সেখান থেকে তিনি বের হয়ে আসেন বোধ করি ঠিক ৮.৫৫ মিনিটে এবং সাড়ে নটার সময় আমাদের ধারণা ও দেখা অনুসারে তিনি প্রাইভেট রুমে ঢোকেন। এই যে ৩৫ মিনিট সময়—এই সময়টা কেউ তাঁকে দেখতে পায়নি। এই সময় তিনি খাবার ঘর, ড্রইংরুম, হলঘর, শোবার ঘর, লাইব্রেরী ঘর বা নীচে বা সিঁড়িতে কোথাও ছিলেন না। তবে নিশ্চয়ই তিনি ঐ সময় আপনার প্রাইভেট রুমে ছিলেন এবং খাবার ঘর থেকে বের হয়ে সোজা তিনি ঐখানেই গিয়ে ঢুকেছিলেন।

এটাও ঠিক ডাক্তার যে, ৮.৫০-৮.৫২ মিনিটের সময় আপনার ম্যানেজারের সঙ্গে দোতালার সিঁড়িতে আপনার দেখা হয়। তাহলে নিশ্চয়ই ধরা যায় ঠিক ঐ সময়ই মিঃ

মিত্ররূপী স্যার দিগেন্দ্র যখন আপনার খাবার ঘর থেকে বের হয়ে আসেন, দোতলার হলঘরে আপনাদের দুজনের সঙ্গে দেখা হয়েছিল। কেমন কিনা, am I right ?

হ্যাঁ, আপনার কথাই ঠিক মিঃ রায়। আমি সন্ধ্যার সময়েই ঠিক করেছিলাম মনে মনে, স্যার দিগেন্দ্রকে আজ শেষ করব। কেননা ও যা ভয়ানক লোক, সুযোগ পেলেই আমাকে অনায়াসে খুন করবে। তাই সন্ধ্যার অল্প পরেই আমার নিজ স্বাক্ষরে ওকে চিঠি দিলাম ঃ তোমার সময় উপস্থিত, আজই —প্রস্তুত থাক।—ইতি। 'কালো ভ্রমর'। সারা বাড়িতে তখন উৎসবের হুল্লোড় ; নটা বাজবার কয়েক মিনিট আগে ম্যানেজারের কাছ থেকে এসে hashish দিয়ে তৈরী কয়েকটা সিগারেট চেয়ে নিই। কেননা আপনি জানেন আমি বাড়িতে মরফিয়া ইন্‌জেকশন নিতাম। এখানেও ওটা অভ্যাস করে ছিলাম। কিন্তু মাঝে মাঝে মরফিয়া বন্ধ করবার জন্য অত্যন্ত ক্লান্তি বোধ হত। রাতে ভালো ঘুম হত না। প্রফেসার শর্মাকে এ কাজে নিয়েছিলাম, কেননা দুজনে না হলে এতগুলো লোকের চোখে ধুলো দেওয়া যাবে না। শর্মা আমায় বলে গেল, ওকে নিয়ে আমি খাবার ঘরে যাচ্ছি। তুমি সিঁড়ির কাছে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা কর। যখন সে খাবার ঘর থেকে বের হয়ে আসবে ওর সঙ্গে দেখা করবে। কিন্তু সাবধান, তোমাকে যেন কেউ লক্ষ্য না করে।

৮.৫৫ মিঃ কি ৯টার সময় দিগেন্দ্র খাবার ঘর থেকে বের হয়ে এল। ওপরের হলঘরে তখন বড় একটা কেউ ছিল না। যে দু-চারজন ছিল তারা তখন তাস খেলায় মত্ত। বাকি অভ্যাগতরা নীচের হলঘরে গান-বাজনায় জমে উঠে। প্রফেসার যখন খাবার ঘরে দিগেন্দ্রকে নিয়ে যায়, আমি সেই ফাঁকে এক সময় প্রাইভেট রুমে ঢুকে দেওয়াল থেকে তলোয়ারটাকে নামিয়ে সোফার ওপর গদির তলায় রেখে আসি। হলঘরে দাঁড়িয়ে আছি সিঁড়ির কোণায়। দিগেন্দ্র ঘর থেকে বেরিয়ে আসতেই ওকে ইশারায় ডেকে প্রাইভেট রুমে গিয়ে ঢুকি, কেউ দেখেনি। আমার মুখে একটা জ্বলন্ত সিগারেট ছিল। একসময় দুজনে কথা বলতে বলতে টুপ করে সেটা মেঝেয় ফেলে দিই ইচ্ছা করে। দিগেন্দ্র সেটা যেমন কুড়িয়ে নিতে নীচু হয়েছে, চক্ষের নিমেষে গদির তলা থেকে ভারী তলোয়ারটা টেনে নিয়ে তার গলা দু ভাগ করে দিই। তারপর মাথাটা নিয়ে মাঝখানে রেখে দিই। এখন বুঝতে পারছেন আপনারা, মৃতদেহের position ওরকম ছিল কেন!

তারপর ৯.১০ মিনিটের সময় আমি একটা চাদর জড়িয়ে ওঘর থেকে বের হয়ে সোজা শোবার ঘরে গিয়ে ঢুকি। সেখানে দেড় থেকে দু মিনিটের মধ্যে পোষাক বদলে আপনাদের সঙ্গে গিয়ে দেখা করি। আমি আগেই আপনাকে দিগেন্দ্রর লেখা চিঠি পাঠিয়ে এখানে এনেছিলাম। অত্যধিক অহঙ্কারেই ঐ কাজ করতে গিয়ে এইভাবে ধরা পড়লাম। নাহলে এ জগতে কারও সাধ্য ছিল না আমাকে ধরে। কিন্তু শর্মাকে যখন বললাম সে ভয়ে শিউরে উঠল। মনে মনে আমি হাসলাম এবং আমাদের পরামর্শমত ঠিক রাত্রি সাড়ে নটায় আমাদের চোখের সামনে দিয়েই শর্মা প্রাইভেট রুমে গিয়ে ঢুকলো। এবং ঠিক যখন প্রায় সে অদৃশ্য হয়েছে, তখন আপনার দৃষ্টি ওদিকে আকর্ষণ করলাম। এদিকে শর্মা ঘরে ঢুকে সঙ্গে সঙ্গে হলঘরের দরজা দিয়ে বের হয়ে যাবার সময়ে খুব ক্ষিপ্রতার সঙ্গে চাকরদের ডাকার ঘণ্টার দড়িটা টেনে, চকিতে খাবর ঘরের দরজার সামনে দিয়ে ঘুরে একেবারে আপনার হরিচরণের সামনে গিয়ে দাঁড়িয়ে কথা বলে। বেয়ারাকে আগে থেকেই শর্মা ওঘরে যাবার জন্য বলে রেখেছিল।

কিন্তু মিঃ মিত্রের পকেট থেকে চাবিটা চুরি করেছিল কে?

আমি। আমিই খুন করে আসবার সময় নিয়ে আসি। শর্মা আমাকে এগুলো নিয়ে আসতে বলেছিল।

তারপর কী হয়েছিল সে চাবি নিয়ে জানেন?

হ্যাঁ, জানি। শর্মা ঐ রাত্রেই মিঃ মিত্রের ওখানে গিয়ে তার সমস্ত কাগজপত্র সরিয়ে ফেলে ; আর তার ধারণা ছিল অস্ত্রঘরে আসল মিঃ মিত্রের মৃতদেহ লুকানো আছে, তাই সে অস্ত্রঘরের চাবি চুরি করে রেখেছিল।

প্রফেসারকে কেন সন্দেহ করেছিলাম সর্বপ্রথম জানেন ডাক্তার? উনি আমার লোক হরিচরণের কাছে সময়ের কথা জিজ্ঞাসা করেছিলেন বলে। হরিচরণকে জিজ্ঞসা করবার মানেই তার কাজের মিথ্যে সাফাই একটা রেখে দেওয়া। তাছাড়া আপনিই নিজে গিয়ে তিনতলায় অরুণের সঙ্গে ঐ ভাবে দেখা করেছিলেন।

হ্যাঁ, আমিই। আমার ইচ্ছা ছিল এতে যদি ভয় পেয়ে ও শর্মার মত লোকেদের পাপচক্রে আর না ভোলে। বড় ভাল ছেলেটি, দেখলে মায়া হয়।

হলঘরের ঘড়িতে ঢং ঢং করে রাত্রি বারোটা ঘোষণা করল। এক ঝলক হাওয়া খোল জানালা-পথে ঘরে এসে যেন সবার চোখে-মুখে শান্তির প্রলেপ দিয়ে গেল।

আমরা সকলে নিঃশব্দে বসে রইলাম।

হতভাগ্য শর্মাকে হয়তো আমি খুন করতাম না, কিন্তু ও আস্ফালন দেখালে, আমায় নাকি টিপে মারতে পারে ; সে বিনিময়ে চার লক্ষ টাকা চায়। তার টাকার সাধ চিরতরে কাল অরুণ করের বাড়িতে মিটিয়ে এসেছি। ওদের মত জঘন্য প্রবৃত্তির লোক এ দুনিয়ায় যত কম থাকে ততই ভাল, তার জন্য আমি এতটুকুও অনুতপ্ত নই।

ডাক্তার সান্যাল চুপ করলেন।

হলঘরের ঘড়িতে ঢং ঢং করে রাত্রি পাঁচটা ঘোষণা করল।

BanglaBook.net

রত্নমঞ্জিল

॥ এক ॥

আহারাদির পর দুই বন্ধু এসে বসবার ঘরে বসে।

শীতের রাত। শীতটাও কয়েকদিন ধর যেন জাঁকিয়ে বসেছে। ঘরের কোণে ইলেকট্রিক হিটার জ্বলছিল, তারই উত্তাপে ঘকটা বেশ আরামপ্রদ হয়ে উঠেছিল। দুজনে দুটো সিগারেট ধরিয়ে টানছে —বামাদেব অধিকারী আর কিরীটী রায়। বামাদেব অধিকারীর পূর্বপুরুষেরা এককালে বহরমপুরের নামকরা জমিদার ছিলেন। এখনো জমিজমা কিছু আছে বটে কিন্তু তার প্রাচুর্যের আসল উৎসটা ব্যবসা—কাঁচা মালের আমদানি রপ্তানির ব্যবসা দেশ-বিদশে। এবং বিরাট ফলোয়া ব্যবসা।

আর কিরীটী রায় তখনো হ্যারিসন রোডের মেস বাণীভবনে থাকে। একদা বামদেবের কলেজ-জীবনের সহধ্যায়ী বন্ধু।

কিরীটী হাতের সিগারেটটায় দীর্ঘ এক টান দিয়ে বললে, তারপর বল কিসের পরামর্শ করার জন্য আমায় ডেকেছিস? কোনরকম ভণিতা না করেই কিরীটী শুরু করল বলতে।

ব্যাপারটা হচ্ছে একটা সুবর্ণ হীরখচিত কঙ্কন—বামদেব বললে।

কি রকম? কিরীটী কৌতূহলী হয়ে বলল।

আগে কঙ্কনটা দেখ, তারপর বলছি সব কথা। বামদেব বললে।

উঠে গিয়ে আয়রণ সেফ থেকে পাশের ঘরের একটি সাবেককেলে লেদারের চৌকো বাক্স নিয়ে এল বামদেব। বাক্সের ডালা খুলতেই দেখা গেল একখানি কঙ্কন—হীরকখচিত সুবর্ণ কঙ্কন। সত্যিই অপূর্ব কারুকার্যমণ্ডিত কঙ্কনটি—চোখ যেন ফেরানো যায় না। মুগ্ধ দৃষ্টিতে চেয়ে থাকে কঙ্কনের দিকে কিরীটী।

আরো আধঘণ্টা পরে।

কিরীটী ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে টেবিলের ওপরে রক্ষিত ডোমে-ঢাকা বৈদ্যুতিক টেবিল ল্যাম্পের আলোয় মুগ্ধ বিস্ময়ে হস্তধৃত হীরকখচিত সুবর্ণ কঙ্কনখানি দেখছিল। ওজনে তিন ভরি তো হবেই—সেকেলে জড়োয়া গহনা যাকে বলে, একেবারে খাঁটি পাকা সোনার তৈরী। ভিতরটা গালা ভরা নয়, একেবারে নিরেট।

হীরকখচিত কঙ্কন। দু'পাশে হতে দুটো হাঙ্গরের হিংস্র মুখ যেন পরস্পরের সঙ্গে এসে ঠেকেছে। আজকালকার হালফ্যাসানের যুগে এ ধরনের ভারী অথচ সুক্ষ্ম কাজ বড় একটা চোখেই পড়ে না। ছোট ছোট হীরা কঙ্কনটির সারা গায়ে বসানো, ল্যাম্পের আলোয় সব ঝলমল করছে। অনেকক্ষণ ধরে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখে সম্মুখে চেয়ারের ওপরে উপবিষ্ট বামদেব অধিকারীর হাতে সেটা এগিয়ে দিল কিরীটী এবং প্রশ্ন করল, কিন্তু একটি কঙ্কন কেন—আর একটি কোথায়?

বামদেব মৃদু কণ্ঠে বলল, জানি না।

জানিস না মানে?

সত্যিই জানি না এর অন্য কঙ্কনটি কোথায়, কিরীটী।

ঠিক বুঝলাম না।

সেই কথা বলবার জন্যই এবং কি ভাবে অন্য কঙ্কনটি উদ্ধার করা যেতে পারে সেই পরামর্শ নেবার জন্যই তোকে ডেকে এনেছি—

সব কথা আমায় খুলে বল বাম। অন্য কঙ্কনটির কথা কিছুই তুই জানিস না—কিছুই জানিস না?

শুনেছি হারিয়ে গিয়েছে—

হারিয়ে গিয়েছে!

হ্যাঁ। সেই রকমই আমার পিসেমশাইয়ের মুখে শুনেছি। কঙ্কন জোড়া আমার পূর্বপুরুষের সম্পত্তি। আমার প্রপিতামহী বিন্ধ্যবাসিনী দেবী তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর একমাত্র পুত্রবধূ শরৎশশী দেবী আমার পিতামহীর হাতে আসে ঐ কঙ্কন জোড়া। আমার ঠাকুর্দার এক ছেলে ও এক মেয়ে। মেয়ে আমার পিসিমা মৃন্ময়ী দেবী ছিলেন আমার বাবার চাইতে বয়সে প্রায় চোদ্দ বছরের বড়।

বামদেব বলে চলে, দীর্ঘদিন পর্যন্ত আমার ঠাকুর্দার কোন পুত্রসন্তান না হওয়ায় মাত্র এগার বৎসর বয়সে কন্যা মৃন্ময়ীর বিবাহ দিয়ে পিসেমশাইকে ঘরজামাই করে রাখলেন—পুত্রের মতই! তের বৎসর বয়সে অর্থাৎ বিবাহের পরবৎসরই পিসিমার একটি পুত্র জন্মাল—আমার পিসতুত ভাই অনিলদা এবং অনিলদার জন্মের দেড় বৎসর পরে জন্মাল বাবা—

তাহলে তোর বাবা তোর পিসতুত ভাই অনিলদার থেকে বয়সে ছোট?

হ্যাঁ। প্রায় দেড় বৎসরের ছোট।

তারপর?

বামদেব অধিকারী পুনরায় শুরু করে তার কাহিনী, আমার পিসেমশাই শ্যামসুন্দর চক্রবর্তীর সংসারের প্রতি কোনদিনই তেমন আকর্ষণ ছিল না। দিবারাত্র জপতপ নিয়েই থাকতেন—শোনা যায় তিনি নাকি একজন রীতিমত সাধক ছিলেন।

তাই বুঝি?

হুঁ, দিবারাত্রি বেশীর ভাগ সময়েই জপতপ পূজাআর্চা নিয়েই থাকতেন। প্রথম যৌবনে শুনেছি আগুনের মত প্রখর রূপ ছিল আমার পিসেমশাইয়ের। বাবরী চুল, কটা চোখ, বিরাট দশাসই চেহারার পুরুষ আমার পিসেমশাইকে একবার দেখলে তাঁর দিক থেকে নাকি চোখ ফেরানো যেত না। প্রথম যৌবনে নাকি তিনি নিয়মিত কুস্তি ও ডনবৈঠক করায় দেহেও ছিল তাঁর অসুরের মতই বল। গরীব যজমান পুরোহিতের একমাত্র সন্তান ছিলেন পিসেমশাই। সেই জন্যই এবং তাঁর রূপে মুগ্ধ হয়ে ঠাকুর্দা তাঁর একমাত্র মেয়ের সঙ্গে তাঁর বিবাহ দিয়ে ঘরজামাই করে এনেছিলেন। কিন্তু পিসেমশাই সরল সাধক এবং সংসারের প্রতি ও সেই সঙ্গে স্ত্রীর প্রতি বিশেষ কোন আকর্ষণ না থাকায় বোধহয় বিবাহটা শেষ পর্যন্ত সুখের হলো না।

কেন? শুধু কি ঐ কারণেই বিবাহটা সুখের হয়নি?

না, আমার মনে হয় আরো কারণ ছিল। ধনশালী জমিদারের একমাত্র দুহিতা আমার পিসিমা ছিলেন যেমন গর্বিতা তেমনি অত্যন্ত নিষ্ঠুর প্রকৃতির স্ত্রীলোক, আর আমার পিসেমশাই ছিলেন ঠিক ভিন্ন প্রকৃতির—শান্ত সহিষ্ণু ও সদাহাস্যময় পুরুষ। তা সত্ত্বেও শুনেছি পিসেমশাই যথাসাধ্য মানিয়ে চলবারই চেষ্টা করেছেন দীর্ঘদিন ধরে, কিন্তু পিসিমার

দিক থেকে বোধ করি কোন কমপ্রোমাইজের ইচ্ছা ছিল না—তাই স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে প্রতি মুহূর্তে বিবাদ-বিসম্বাদ লেগেই ছিল। এবং সেই বিসম্বাদ চরমে উঠল অনিলদার জন্মের পর হতেই এবং যার ফল হল অতিবড় সহিষ্ণু ও শান্তপ্রকৃতির লোক পিসেমশাইকেও বাধ্য হয়ে একমাত্র স্বামী-স্ত্রীর লৌকিক সম্পর্কটা ছাড়া অন্য সমস্ত সম্পর্কই তাঁর স্ত্রীর সঙ্গে ছিন্ন করে জমিদারবাড়ির বাইরের মহলে নিজেকে একেবারে নির্বাসিত করতে হল। ঐ ঘটনার কিছুদিন পরেই আমার বাবার জন্ম। বাবার জন্মের কিছুদিন পর হতেই কিন্তু পিসিমা যেন সম্পূর্ণ ভিন্নরূপ নিলেন—চেষ্টা করতে লাগলেন পিসেমশাইয়ের সঙ্গে আবার নতুন করে সৌহার্দ্য স্থাপনের জন্য। কতদূর তাঁর প্রচেষ্টা সফল হয়েছিল জানি না, তবে পিসেমশাই কিন্তু অন্দরে আর ফিরে এল না। নিরুদ্দিষ্ট হওয়ার আগে পর্যন্ত বাইরের মহলেই রাত কাটাতে লাগলেন ও দিনের বেলাটা নির্জন একটা অন্ধকার ঘরে পূজাআর্চা নিয়েই কাটাতে লাগলেন। যখন আমার বাবার বছর দেড়েক বয়স সেই সময় একদিন মা ও মেয়ে অর্থাৎ পিসিমা ও আমার পিতামহীর সঙ্গে প্রচণ্ড একটা বিবাদ হয়ে গেল।

বিবাদ হলো কেন?

এই কঙ্কনের ব্যাপার নিয়েই। আমার পিতামহী শরৎশশীর পুত্র না থাকায় পিসিমার বিবাহের সময় কঙ্কন জোড়া কন্যাকেই যৌতুক দিয়েছিলেন। পরে পুত্র জন্ম নেওয়ায় একদিন পিতমহী কথাপ্রসঙ্গে মেয়েকে বলেছিলেন—মীনু, এ বংশের নিয়ম কঙ্কন জোড়া এই বংশের জ্যেষ্ঠ পুত্রবধূই পাবে। তোর যখন বিবাহ হয় তখন খোকা জন্মায়নি বলে এবং আর পুত্র হবার কোন সম্ভাবনা নেই ভেবেই কঙ্কন জোড়া তোকে যৌতুক দেওয়া হয়েছিল. কিন্তু এখন সে কঙ্কনের একমাত্র উত্তরাধিকারিণী হচ্ছে খোকারই স্ত্রী এই বাড়ির ভবিষ্যৎ বধূ। উত্তরে পিসিমা বললেন, সে কি মা! যে বস্তু একবার আমার বিবাহের সময় যৌতুক দিয়েছ, এতদিন বাদে সেটা আর কেড়ে নেবে কোন্ যুক্তিতে? আমিই বা লোকের কাছে মুখ দেখাব কি করে আর তোমাদেরই কি লজ্জায় মাথা কাটা যাবে না? মাতামহী কিছুক্ষণ স্তব্ধ হয়ে থেকে পিসিমাকে বললেন, ভেবে দেখ্ তুই মীনু, সমস্ত ব্যাপারটাই একটা দৈবনির্দেশ ছাড়া কিছুই নয়। নিয়মানুযায়ী ও কঙ্কনের একমাত্র উত্তরাধিকারিণী এই বংশের বধূ। মৃত্যুর সময় আমার শাশুড়ী এই প্রতিজ্ঞাই আমাকে দিয়ে করিয়ে নিয়েছিলেন। অন্যথায় তিনি বলেছিলেন, নাকি ভয়ানক অমঙ্গল দেখা দেবে। আমি বরং তোকে ওর চাইতেও দামী ও সুন্দর এক জোড়া কঙ্কন গড়িয়ে দেবো মা, ও কঙ্কন জোড়া তুই ফেরত দে।

কিন্তু পিতামহীর কোন যুক্তিই পিসিমা মানতে চাইলেন না এবং রীতিমত চেঁচামেচি ও ঝগড়া করে কড়া কড়া কতকগুলো কথা শুনিয়ে দিয়ে মাকে পিসিমা ঘর ছেড়ে হনহন করে চলে গেলেন। এসব কথা আমার মা'র মুখেই পরবর্তী কালে শোনা। মা শুনেছিলেন তাঁর শাশুড়ী আমার পিতামহীর কাছ থেকে।

তারপর?

পিসিমার ঐ ধরনের ব্যবহারে পিতামহী অত্যন্ত মনে ব্যথা পান এবং পিতামহও দুঃখিত হন।

হুঁ, থামলি কেন বল্!

যা হোক, শোনা যায় অতঃপর নাকি পিসিমা তাঁর মা'র ঘর থেকে বের হয়ে সোজা একেবারে বাইরের মহলে তাঁর স্বামীর কাছে গিয়ে হাজির হলেন।

পিসেমশায় ঐ সময় তাঁর নির্জন অন্ধকার কক্ষের মধ্যে প্রদীপের আলোয় বসে কি একখানি পুঁথি অধ্যায়ন করছিলেন, আচম্‌কা স্ত্রীকে কক্ষমধ্যে প্রবেশ করতে দেখে বিস্ময়ের সঙ্গে মখ তুলে তাকালেন।

এই মুহূর্তে আমি এ বাড়ি থেকে চলে যেতে চাই। যেখানে হোক অন্য কোথাও আমায় নিয়ে চল। পিসিমা বললেন তাঁর স্বামীকে।

কি হল হঠাৎ আবার? এত উত্তেজিত হয়ে উঠলে কেন?

বিচলিত—উত্তেজিত হই কি সাধে? তুমি যদি মানুষ হতে এতটুকু লজ্জা-সরমও যদি তোমার থাকত তো দুঃখ ছিল কি আমার!

কি হয়েছে শুনিই না। হাসতে হাসতে পিসেমশাই শুধান।

আমি এখানে এ বাড়িতে আর এক মুহূর্তও থাকব না।

কেন হল কি?

হবে আবার কি—বিবাহের পর স্ত্রীলোকের একমাত্র স্থান তার স্বামীর গৃহে তা সে পর্ণকুটিরই হোক বা গাছতলাই হোক। আমায় নিয়ে চল—

তুমি তো জান মৃন্ময়ী, আমি সহায়-সম্বলহীন, নিজের বলতে আমার একটি কুঁড়েঘরও নেই। করুণ কণ্ঠে পিসেমশাই বলেন।

তা জানি না, বিবাহ করেছ স্ত্রীকে ভাতকাপড় মাথা গোঁজবার ঠাঁই দিতে পার না—পুরুষমানুষ হয়ে কথাটা বলতে লজ্জা করল না।

পুরুষমানুষ হলে হয়ত লজ্জা করত, কিন্তু আমি যে ঘরজামাই। পুরুষ হলে কি ঘরজামাই হতাম! করুণ হেসে জবাব দেন তিনি।

কোন কথা শুনতে চাই না, এই মুহূর্তে তুমি আমাকে অন্য কোথায়ও নিয়ে যাবে কিনা বল। নচেৎ তোমার সামনেই আমি গলায় দড়ি দেব।

তা না হয় হল, কিন্তু ব্যাপার কি তাও বলবে না?

নেহাৎ অনিচ্ছার সঙ্গেই স্বামীর পীড়াপীড়িতে মৃণ্ময়ী দেবী তখন সমস্ত ঘটনা সংক্ষেপে পিসেমশাইয়ের গোচরীভূত করলেন। সমস্ত শুনে পিসেমশাই বললেন—মিথ্যে তুমি রাগ করছো মৃন্ময়ী। তোমাকে নিয়ে অন্যত্র কোথায়ও আজই যাব, কিন্তু কঙ্কন জোড়া এখান হতে চলে যাবার পূর্বে তোমায় ফেরত দিয়ে যেতে হবে। অদ্ভুত একটা দৃঢ়তা তাঁর কণ্ঠে প্রকাশ পেল।

না, আমি ফেরত দেব না। একবার যা দান করেছে, তার ওপরে আর ওদের কোন অধিকার নেই। প্রতিবাদ জানালেন পিসিমা।

উঁহু ফেরত তোমাকে দিতে হবেই। পিসেমশাইয়ের চিরদিন শান্ত নির্লিপ্ত কণ্ঠে যেন একটা বজ্রের আভাস পাওয়া গেল।

না—দেবো না। কারণ আমি জানি এ কঙ্কন ছাড়ার সঙ্গে সঙ্গে ভয়ানক অমঙ্গল আমাকেই ঘিরে ধরবে। আমি ঠাকুরমার মুখে ছোটবেলায় শুনেছি, সন্ন্যাসীপ্রদত্ত আশীর্বাদী এই কঙ্কন জোড়া। কোন এক সন্ন্যাসীর পরামর্শেই নাকি এই হীরকখচিত কঙ্কন জোড়া গড়িয়ে সন্ন্যাসীর মন্ত্রপূত আশীর্বাদসহ এই বংশেরই কোন পূর্বপুরুষ তাঁর স্ত্রীর হাতে পরিয়ে দিয়েছিলেন এবং সেই হতেই কঙ্কন জোড়া এ বাড়ির জ্যেষ্ঠ বধূর হাতে থাকে এবং সন্ন্যাসী নাকি বলে গিয়েছিলেন—যতদিন এই কঙ্কন কোন নারীর হাতে থাকবে ততদিন তাকে

কোনদিন বৈধব্য স্পর্শও করতে পারবে না, এমন কি কোন অমঙ্গলই তাকে স্পর্শ করতে পারবে না। এবং একমাত্র মৃত্যু ভিন্ন এ কঙ্কন একবার হাতে পরে খুলে ফেললেও মহা সর্বনাশ হবে।

পিসেমশাই নাকি অতঃপর শান্তকণ্ঠে পিসিমাকে সম্বোধন করে বলেছিলেন, শোন মৃন্ময়ী, তোমার কথা হয়ত মিথ্যা নয়, কিন্তু সবটাই তো তোমার শোনা কথা—

না না—শোনা কথা নয়! পিসিমা বলেন।

তা ছাড়া কি? বংশপরম্পরায় ঐ কাহিনী মুখে মুখে গড়ে উঠেছে। তাছাড়া একটা কথা কি জান, ভাগ্যে যা লেখা আছে তা কেউ জানতে কি আজ পর্যন্ত পেরেছে, না পারে? শোন আমি যা বলি, তুমি এখানে থাকতে চাও না আর একটা মুহূর্তও বেশ—এখানে থেকে নিয়ে তোমাকে আমি যাব কিন্তু তার আগে যা বললাম তা তোমায় করতে হবে—

কি?

ঐ কঙ্কন জোড়া তোমার মা যখন বলেছেন, ফিরিয়ে দেবে তুমি তাঁকে। তারপর এ বাড়ি থেকে আমরা বেরুব।

না না, তাহলে আমার সর্বনাশ হয়ে যাবে। পারবো না—আমি তা পারবো না।

হঠাৎ এবার শ্যামসুন্দর চক্রবর্তীর কণ্ঠস্বরটা যেন বদলে গেল। তিনি স্ত্রীর মুখের দিকে চেয়ে শান্ত কঠিন কণ্ঠে বললেন, শোন মৃন্ময়ী, এ বাড়ি ছেড়ে যদি সত্যিই যেতে চাও তুমি তো আমার কথা তোমাকে সর্বাগ্রে মানতে হবে—

আমি—

শোন আরো একটা কথা—যদি আমার কথা তুমি না রাখ, তাহলে জানবে কালই এ বাড়ি ছেড়ে আমি চলে যাব—এই আমার শেষ কথা।

মৃন্ময়ী অতঃপর বলে ওঠে, না না—ও কথা বলো না। আমার অমঙ্গলের কথা আদৌ আমি চিন্তা করিনি। আমি আমাদের একমাত্র সন্তান অনিলের কথা ভেবেই বলেছি। যদি ওর কোন অমঙ্গল হয়—

কি জানি কেন শ্যামসুন্দর চক্রবর্তী তাঁর একমাত্র পুত্রটিকে প্রাণের চাইতেও বেশী ভালবাসতেন। মৃন্ময়ীর কথায় কিছুক্ষণ স্তব্ধ হয়ে বসে রইলেন, তারপর আবার একসময় বললেন, বেশ তবে এক কাজ কর—একটা কঙ্কন তোমার হাতে থাক, অন্যটা খুলে মাকে দিয়ে এস।

আশ্চর্য! মৃন্ময়ী তার স্বামীর প্রস্তাবটিকে মুহূর্তকালের জন্য ভাবলেন, তারপরই রাজী হয়ে গেলেন।

ঠিক হল ঐদিনই সন্ধ্যার পর রাত্রে তাঁরা তাঁদের একমাত্র সন্তানকে নিয়ে ঐ বাড়ি ছেড়ে চলে যাবেন একটি কঙ্কন ফিরিয়ে দিয়ে।

যাবার পূর্বে শ্যামসুন্দরের ইচ্ছামত মৃন্ময়ী একখানি কঙ্কন তার মা'র হাতে ফিরিয়ে দিলেন আর বললেন, অন্যটা তিনি যতদিন বেঁচে আছেন ধারণ করবেন তাঁর স্বামীর মঙ্গলের জন্য। শরৎশশী দেবী মেয়ের কথায় হাঁ বা না কোন কথাই বললেন না আর, কেবল হাত পেতে একখানা কঙ্কনই মেয়ের কাছ থেকে নিলেন।

মৃন্ময়ী একটি কঙ্কন ফিরিয়ে দিলেন বটে কিন্তু তাঁর মাকে ঘুণাক্ষরেও জানতে দিলেন না যে, সেই রাত্রে ওঁরা ঐ গৃহ ছেড়ে চলে যাচ্ছেন।

ঠিক ছিল রাত বারোটার পর সকলে ঘুমিয়ে পড়লে, চারদিক নিযুতি হয়ে গেলে শ্যামসুন্দর অন্দরে এসে তাঁর স্ত্রীকে ডেকে নিয়ে যাবেন।

নির্দিষ্ট সময়ে স্ত্রীকে ডাকতে এসে তাঁর কক্ষমধ্যে প্রবেশ করে শ্যামসুন্দর স্তম্ভিত হয়ে দাঁড়িয়ে গেলেন।

ঘরের মধ্যে তাঁর বালক পুত্রটি একাকী শয্যায় গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন, আর মৃন্ময়ীর প্রাণহীন দেহটা ঘরের মেঝেতে পড়ে আছে। হাতে তাঁর কঙ্কনটি নেই। আর মৃন্ময়ীর প্রাণহীন দেহের পাশে পড়ে আছে একটা খালি শিশি—তাতে লেখা বিষ। ঐ রাত্রেই শ্যামসুন্দর জমিদারবাড়ি ছেড়ে চলে যান এক বস্ত্রে।

তার পর? শ্যামসুন্দরের আর কোন খোঁজ পাওয়া যায়নি? কিরিটী শুধাল।

না।

মৃন্ময়ী তাহলে বিষপান করে আত্মহত্যা করেছিলেন?

হুঁ।

কিন্তু এসব কথা তুমি জানলে কি করে? কিরীটীর প্রশ্ন।

পিসিমার এক বুড়ি ঝি ছিল, তারই মুখে সব কথা শোনা। সে **পিসিমাকে বিষপান করতে** দেখেনি বটে—তবে পিসেমশাইকে ঘরে ঢুকতে দেখেছিল।

তারপর কঙ্কনটির আর কোন খোঁজ পাওয়া যায়নি?

না।

॥ দুই ॥

একটু থেমে বামদেব আবার বলতে লাগলেন।

অনিলদা আমার প্রিতামহের কাছেই মানুষ হতে লাগল। দীর্ঘ ষোল বৎসর পরে পিসেমশাই আবার একদিন আমাদের ওখানে ফিরে এলেন, এখনো তিনি বেঁচে আছেন। পরে অবশ্য এ গল্প তাঁর মুখেও আমার শোনা।

এই পর্যন্ত বলে বামদেব অধিকারী চুপ করলেন।

কিরীটীও স্তব্ধ।

বাইরে নিযুতি রাত্রি।

তারপর? কিরীটী প্রশ্ন করে।

আজ পর্যন্ত পিসিমার হাতের সেই কঙ্কনটির আর কোন খোঁজ পাওয়া যায়নি। কেনই বা পিসিমা আত্মহত্যা করলেন আর কি করেই বা পিসিমার হাত হতে কঙ্কনটি চুরি হয়ে গেল—আজও সে রহস্য উদঘাটিত হল না। যা হোক, অপহৃত সে কঙ্কনটির কথা সকলে ভুলেই গিয়েছিল পিসিমার মৃত্যুর ব্যাপারের সঙ্গে সঙ্গে এবং এতদিন পর্যন্ত সে কঙ্কনটির কথা আর কারো মনেও পড়েনি। কিন্তু মাত্র মাসখানেক আগে আমাদের বহরমপুরের পৈতৃক বাড়িটা বিক্রির কথাবার্তা শুরু হবার পর হতেই আমাদের কলকাতায় এই বাড়িতে ঘন ঘন চোরের উপদ্রব শুরু হলো—

চোরের উপদ্রব? বিস্মিত কিরীটী প্রশ্ন করে।

হ্যাঁ। এই গত মাসখানেক ধরে পাঁচ-সাতবার চোর **এসেছে এই বাড়িতে** এবং প্রত্যেক

বারই আমার স্ত্রীর ঘরে। আমাদের কোন সন্তানসন্ততি নেই। একমাত্র আছে আমাদের এক পালিতা পিতৃমাতৃহীন বন্ধু কন্যা সুজাতা। সুজাতা ও আমার স্ত্রী এক ঘরেই শোয়। কারবারের কাজে মধ্যে মধ্যে আমাকে কলকতার বাইরে যেতে হয়। দেখেছি আমি বাইরে গেলেই বাড়িতে রাত্রে চোরের উপদ্রব হয় সাধারণত—

আচ্ছা একটা কথা! কিরীটী প্রশ্ন করে।

কি?

চোর এসেছে কিন্তু কিছু চুরি যায়নি?

সেটাই আশ্চর্য; চোর এসেছে বটে কিন্তু কিছুই চুরি যায়নি।

কি রকম?

তাই। প্রথমটায় তাই ব্যাপারটার মাথামুণ্ডু কিছুই বুঝতে পারিনি, পরে হঠাৎ একটা কথা মনে হয় ভাবতে ভাবতে—

কি?

চোর এসেছে বার বার আমার স্ত্রীর হাতের ঐ কঙ্কনটির লোভে।

বল কি। কিন্তু—

সেই কথাই বলছি। বামদেব বলতে লাগল, শেষবার চোর এসে প্রথমে আমার স্ত্রীর ঘুমন্ত অবস্থায় তার হাত থেকে কঙ্কনটি খুলে নেবার চেষ্টা করে, কিন্তু ব্যর্থকাম হয়, তখন কঙ্কনটা আমার স্ত্রীর হাতসমেতই কেটে নিয়ে যাবার মতলবে ছিল বোধ হয়। শেষ পর্যন্ত কিন্তু অন্ধকারে লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়ে ধারাল অস্ত্রের কোপটা পাশের বালিশে পড়তেই স্ত্রীর ঘুম ভেঙে যায়। পরের দিনেই সকালবেলা আমি ফিরে আসি। প্রথমটায় আমরা ধারণাও করতে পারিনি যে চোরের লক্ষ্য ঐ কঙ্কনটির উপরেই। পরে আমরা ব্যাপারটা বুঝতে পেরে শেষবারের ঐ চেষ্টার পর অমঙ্গলের সম্ভবনা সত্ত্বেও আমার স্ত্রীর হাত হতে কঙ্কনটি খুলে বাধ্য হয়ে সিন্দুকে তুলে রাখি, কিন্তু তাতেও রেহাই নেই, গতরাত্রেও আবার চোর এসেছিল এবং লোহার সিন্দুকটাই ভাঙবার চেষ্টা করেছিল কিন্তু জার্মান সিন্দুক খুলতে পারেনি। এতে আরো ব্যাপারটা স্পষ্ট হয়ে উঠছে, চোরের লক্ষ্য ঐ হীরকখচিত সুবর্ণ কঙ্কনই। তোমার কি মনে হয় কিরীটী? বামদেব কিরীটীর মুখের দিকে তাকিয়ে প্রশ্নটা করল।

সেই রকম বলেই তো মনে হচ্ছে তোমার মুখে সব শুনে। মৃদুকণ্ঠে কিরীটী জবাব দেয়।

কিন্তু একটা কথা আমি বুঝে উঠতে পারিছ না কিরীটী, আমার স্ত্রীর আরো বহু টাকার স্বর্ণালঙ্কার আছে কিন্তু চোরের এই কঙ্কনটির ওপরেই কেবল নজর কেন?

কিরীটী প্রত্যুত্তরে হেসে বলল, তাহলে তো কঙ্কন-রহস্যই আমাদের কাছে পরিষ্কার হয়ে গেল বামদেব। আমার সব শুনে মনে হচ্ছে নিশ্চয়ই এই সুবর্ণ কঙ্কনের পশ্চাতে এমন কোন গোপন ইতিহাস আছে যেটা চোরকে বিশেষভাবে কঙ্কনটির প্রতিই লালায়িত করে তুলেছে।

আমার স্ত্রীও অবিশ্যি সেই কথাই বলছিল, কিন্তু বিশ্বাস করিনি। পুরাতন দিনের আর অবিশ্যি পিসেমশাই ব্যতীত কেউ বেঁচে নেই, কিন্তু এমন কোন ইতিহাস ঐ কঙ্কনের সঙ্গে জড়িত থাকলে অন্ততঃ পিসেমশাইও কি সেকথা জানতেন না।

না জানতেও তো তিনি পারেন! সর্বদা তো তিনি বহির্বাটিতে জপতপ নিয়েই থাকতেন শুনলাম?

হ্যাঁ। সংসারে থাকলেও কোনদিন তিনি সংসারী ছিলেন না।

আচ্ছা একটু আগে তুমি যে বলেছিলে, বহরমপুরের পৈতৃক বাড়িটা তোমার বিক্রির কথাবার্তা হচ্ছে!

হ্যাঁ, ওই বাড়িটা অর্থাৎ 'রত্নমঞ্জিলে'র বিক্রির কথাবার্তা চালাচ্ছি। একপ্রকার পাকাই হয়ে গিয়েছে বলা যায়, বায়না নেওয়া হয়েছে।

বাড়িটা অনেক দিনের না?

হ্যাঁ। আমাদের কোন পূর্বপুরুষ নবাব সরকারের চাকরি করতেন। আসলে আমরা চাটুয্যে, অধিকারী আমাদের বংশের নবাব-প্রদত্ত খেতাব। নবাব সরকারে ঐ চাকরির সময়েই বহরমপুরে তিনি একখানা গৃহ নির্মাণ করেন, পরে পূর্ববঙ্গ হতে এসে পরবর্তী পুরুষ বসবাস করতে শুরু করেন এবং ক্রমে জমিদারীও ক্রয় করেন। তারপর একদিন আমার পিতৃদেব কলকাতায় এই বাড়ি করে চলে আসেন এখানে এবং সেই হতে বহরমপুরের বাড়িটা প্রায় খালিই পড়ে ছিল কিন্তু বাড়িটার মাল-মশলা খুব ভাল থাকায় ও গঠনকৌশল সেকেলে এবং মজবুত থাকায় বাড়িটা পুরাতন হয়ে গেলেও এখনও অটুট আছে। বাড়িটা দেখতে অনেকটা পুরাতন কেল্লার মত, গঙ্গার একেবারে ধারে এবং গঙ্গাও মজে গিয়েছে এবং বহুদিনের অব্যবহারে চারিপাশে এখন ঘন জঙ্গল হয়ে গিয়েছে।

বাড়িটা মানে তোমাদের ঐ রত্নমঞ্জিল কিনছে কে?

এক গুজরাটি ভদ্রলোকে। নাম রতনলাল রাণা।

লোকটার অবস্থা কেমন—নিশ্চয়ই ধনী?

তা তো নিশ্চয়ই!

তা হঠাৎ অমন জায়গায় একটা অতদিনকার পড়ো পুরনো বাড়ি কেনবার তাঁর সখ হল যে!

শুনেছি কাঁসার জিনিসপত্র তৈরির একটা ফ্যাক্টরী নাকি খুলবেন তিনি।

হুঁ—দাম? তাও আশাতীত।

কি রকম?

পঞ্চান্ন হাজার টাকা।।

বল কি!

কিরীটীর মনের মধ্যে তখন বহরমপুরে গঙ্গার ধারে নবাবী আমলের এক পুরাতন কেল্লাবাড়ি রত্নমঞ্জিল ছায়াছবির মত আকার নেবার চেষ্টা করছে। নবাবী আমলের পুরাতন কেল্লা বাড়ি।

সামনে টেবিলের ওপর রক্ষিত টাইমপিসটা একঘেয়ে টিকটিক শব্দ জাগিয়ে চলেছে নিষুতি রাতের স্তব্ধতার সমুদ্রে।

পুলিসেই সংবাদ দেওয়ার আমার ইচ্ছা ছিল, কিন্তু কিরীটী ব্যাপারটা এমন ধোঁয়াটে—পুলিস হয়ত বিশ্বাসই করবে না, কিন্তু চুপচাপ বসেও আর থাকতে পারলাম না—তাই তোমার শরণাগত হয়েছি। বামদেব আবার বললে।

কিরীটীর মাথার মধ্যে তখনও রত্নমঞ্জিল ঘোরাফেরা করছে।

বহরমপুর! রত্নমঞ্জিল!

এখন তুমি কি পরামর্শ দাও কিরীটী?

একটু আমায় ভেবে দেখতে হবে। তবে প্রথম পরামর্শ হচ্ছে, কাল সকালেই সর্বাগ্রে কোন ব্যাঙ্কে গিয়ে ঐ কঙ্কনটি তাদের সেফ কাস্টডিতে তোমাকে রেখে আসতে হবে।

বেশ, তাই করব।

আচ্ছা আজ তাহলে আমি উঠি।

এস।

ভাল কথা, কত বায়না নিয়েছ, বলছিলে না বড়িটার জন্য?

নিয়েছি—দশ হাজার টাকা। কথা আছে সামনের মাসে দশ তারিখে বিক্রয়-কোবালা রেজিষ্ট্রি হবে।

॥ তিন ॥

মিঃ অধিকারীর ওখান থেকে বিদায় নিয়ে কিরীটী বাড়ি ফিরছিল। রাত বেশী নয় কিন্তু শীতের রাত বলে এর মধ্যেই চারিদিক যেন নিযুতি হয়ে এসেছে। আর শীতও এবার যেন বেশ জাঁকিয়ে এসেছে শহরে। একেবারে হাড়কাঁপানো কনকনে।

যে ট্যাক্সীতে কিরীটী বামদেবের ওখানে গিয়ছিল, সেটা ছাড়েনি অত রাত্রে কোন ট্যাক্সি পাওয়া যাবে না বলে। পাঞ্জাবী ড্রাইভার ট্যাক্সি চালাচ্ছিল। চলমান গাড়ির খোলা জানালা পথে শীতের রাত্রির কনকনে হাওয়া নাকে চোখে মুখে কিরীটর এসে ঝাপ্‌টা দিচ্ছে।

রাস্তার দু'পাশে দোকানপাট সব বন্ধ হয়ে গিয়েছে। মধ্যে মধ্যে শুধু চোখে পড়ে ক্বচিৎ কখনো এক-আধটা পানের দোকান এখনও খোলা। তারই সামনে দেখা যায় এখনো দু-চারজন শেষ খরিদ্দার। আর চোখে পড়ে এক-আধটা মিঠাইয়ের দোকান—তারাও একেবারে দরজা বন্ধ করার উদ্যোগ করছে।

দু-একটা ট্যাক্সি বা প্রাইভেট গাড়ি পাশ দিয়ে ছুটে যাচ্ছে।

কিরীটীর মাথার মধ্যে তখনও পাক খেয়ে ফিরছিল গঙ্গার ধারে একখানা নবাবী আমলের পুরাতন বাড়ি। বিক্রয়-কোবালা—যার এখনো রেজিষ্ট্রি হয়নি কিন্তু বায়না হয়েছে দশ হাজার টাকা।

কে এক রাণা বাড়িটা কিছুদিন আগে পঞ্চান্ন হাজার টাকায় বামদেবের কাছ হতে ক্রয় করে নেবে বলে বায়না দিয়েছে। কাঁসার বাসনের ফ্যাক্টরী খুলবে। কাঁসার বাসনপত্রের জন্য বহরমপুরের খাগড়া অঞ্চল অবশ্য বিখ্যাত। গুজরাটি ব্যবসায়ীর সেদিকটায় নজর পড়েছে। ব্যাপারটা খুব একটা অস্বাভাবিক নয় তবে অত অধিক মূল্যে একটা পুরাতন আমলের বাড়ি ক্রয় করেছে যখন গুজরাটি ব্যবসায়ী, মিথ্যে সে নিশ্চয়ই অতগুলো টাকা ব্যয় করছে না।

এক-আধটা টাকা নয় তো—পঞ্চান্ন হাজার টাকা!

টাকাটাও অবশ্য এখনো সম্পূর্ণ পেমেন্ট হয়নি—হাজার দশেক বায়না নিয়েছে বামদেব এবং সামনের পনের তারিখে বাকি পেমেন্টের সঙ্গে সঙ্গে বিক্রয়-কোবালা রেজিস্ট্রি হবে। আগাম দশ হাজার টাকা নিয়েছে এবং কথাবার্তার যখন সব ঠিক-ঠাক, কেবল বিক্রয়-কোবালা রেজিষ্ট্র করা বাকী, তখন একপ্রকার বিক্রয়ই হয়ে গিয়েছে ধরে নিতে হবে।

হঠাৎ কিরীটীর চিন্তাসূত্রে বাধা পড়লো।

গাড়ির মধ্যস্থিত দর্পনে বার দুই একটা গাড়ির সাইড হেডলাইটের আলো ওর সতর্ক দৃষ্টি আকর্ষণ করে। সঙ্গে সঙ্গে কিরীটী ড্রাইভারকে বলে গাড়ির গতি আর একটু কমিয়ে দিতে। ট্যাক্সির স্পীড কমতেই কিরীটী সন্তর্পণে পিছনের দিকে তাকাল। সামান্য ব্যবধানে সাইডলাইট জ্বালিয়ে একখানা গাড়ি ট্যাক্সির পিছনে পিছনেই আসছে সমগতিতে।

কিরীটী তার সহজ বিচারবুদ্ধি দিয়েই বুঝতে পেরেছিল, সাধারণ কোন গাড়ি নিশ্চয়ই নয়, তাই ট্যাক্সির গতি কখনো একটু কমিয়ে কখনো একটু বাড়িয়ে বেশ কিছুটা পথ পরীক্ষা করে দেখল এবং বুঝতে দেরি হয় না ওর পাশ্চাতের গাড়িখানা ওকে অনুসরণ করছে।

সঙ্গে সঙ্গে কৌতূহলী হয়ে ওঠে কিরীটী। এবং আরো কিছুটা পথ চলে কিরীটী সুস্পষ্টই লক্ষ্য করে পাশ্চাতের গাড়িটা ঠিক একই ভাবে তার ট্যাক্সিকে অনুসরণ করে আসছে। ব্যাপারটায় ও একটু বিস্মিতই হয়।

নিতান্ত বামদেব কর্তৃক আমন্ত্রিত হয়েই কিরীটী বামদেবের ওখানে রাত্রের ডিনারে গিয়েছিল এবং বামদেবও প্রথমটায় আসল উদ্দেশ্যটা তার কিরীটীকে খুলে বলেনি। খাওয়া-দাওয়ার পর সব বলল।

এ ক্ষেত্রে বাইরের কোন তৃতীয় পক্ষের তো ব্যাপারটা আঁচ করাও সম্ভব নয়। তবে?

এখন স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে বামদেবের ওখানে যাওয়াটা তার কারো-না-কারো শ্যেন সতর্ক দৃষ্টিকে এড়ায়নি। বামদেবের ওপরে কারো-না-কারো লক্ষ্যও আছে। অতঃপর কিরীটী সোজাপথে না গিয়ে ইচ্ছা করে ট্যাক্সি ড্রাইভারকে বলে খানিকক্ষণ এদিক-ওদিক ঘোরাফেরা করতে লাগল।

কিরীটী মনে মনে বুঝি মৃদু হাসে এবং সে সঙ্গে সঙ্গে সতর্ক হয় মনে মনে তাঁর অনুমানটা মিথ্যে নয় বলে। সে ট্যাক্সি-ড্রাইভারকে আদেশ দেয়, সর্দারজী, সোজা পার্কসার্কাসের দিকে চল। সঙ্গে সঙ্গে সর্দারজী গাড়ি ঘোরায়। পার্কসার্কাস অঞ্চলে কিরীটীর এক শিল্পী বন্ধু থাকে। সবিতাব্রত সেন। কিরীটীর নির্দেশে সর্দারজী সেই দিকে গাড়ি চালায়।

নির্জন রাস্তায় কেবল গ্যাসের আলোগুলো টিম্ টিম্ করে জ্বলছে। এদিক হতে ওদিকে যতদূর দৃষ্টি চলে রাস্তাটা শূন্য—একেবারে খাঁ-খাঁ করছে।

সবিতাব্রতর বাড়ির বন্ধ দরজার সামনে এসে কিরীটী সর্দারজীকে থামতে বললে সর্দারজী গাড়ি থামাল—কিরীটী সঙ্গে সঙ্গে সবিতাব্রতর বাড়ির কাছাকছি আসতেই সর্দারজীকে গাড়ির স্পীডটা স্লো করতে বললে এবং একসময় চলন্ত ট্যাক্সি থেকে নেমে পড়ল, ট্যাক্সি আবার স্পীড নিল।

অন্য গাড়িটাও ততক্ষণে থেমে গিয়েছে। পশ্চাতে গড়ির সাইডলাইট দুটো দপ করে হঠাৎ ঐ সময় নিভে গেল।

কিরীটী গাড়ি থেকে নেমে একটা লাইটপোস্টের আড়ালে আত্মগোপন করে রইল কিছুক্ষণ, তারপর এক সময় এগিয়ে গিয়ে সবিতাব্রতর বাড়ির দরজার গায়ে কলিং বেলটা টিপল।

কিরীটী বারকয়েক বাজাবার পর দরজার ওপাশে পদশব্দ শুনতে পেল।

দরজা খুলে দিতে লোক আসছে, কিরীটী বুঝতে পারে।

দরজা খুলতেই সামনে সবিতাব্রতর সঙ্গে চোখাচোখি হয়ে গেল কিরীটীর।

এত রাত্রে কিরীটীকে দেখে সবিতাব্রত কম বিস্মিত হয়নি। সবিতাব্রত ঘুমোয়নি, জেগে

বসে একটা ছবিতে রিটাচ দিচ্ছিল স্টুডিওর মধ্যে

ব্যাপার কি রে! এত রাত্রে তুই? সবিতাব্রত প্রশ্ন করে।

কথা আছে—চল্ ভেতরে। কিরীটী বললে।

কিরীটীর অদ্ভুত চরিত্রের সঙ্গে সবিতাব্রত পূর্বেই পরিচিত। তাই দ্বিতীয় আর কোন প্রশ্ন না করে কেবল আহ্বান জানল, আয়।

দরজা বন্ধ করে দুজনে ওপর উঠতে লাগল সিঁড়ি দিয়ে। সিঁড়ি বেয়ে উঠতে উঠতে কিরীটী প্রশ্ন করে, জেগে ছিলি মনে হচ্ছে—

হ্যাঁ, একেটা ছবির রিটাচ দিচ্ছিলাম।

সবিতাব্রতর দোতলায় বসবার ঘরের মধ্যে ঢুকে ইজিচেয়ারটার ওপরে গাটা এলিয়ে দিতে দিতে আরাম করে চোখের পাতা দুটো বুজিয়ে মৃদুকণ্ঠে কিরীটী বললে, এক কাপ কফি খাওয়াতে পারিস সবিতা?

করছি—

সবিতাব্রত বলতে গেলে একাই থাকে। দ্বিতীয় প্রাণী এক বৃদ্ধ ভৃত্য। ইলেকট্রিক স্টোভে দু'কাপের মত কফির জল চাপিয়ে দিল সবিতাব্রত।

গরম কফির কাপে চুমুক দিতে দিতে কিরীটী বললে, বাকি রাতটুকু এখানে কাটাব চেয়ারে শুয়েই—একটা বালিশ দে!

কিরীটী যে বিনা কারণে এই শীতের মধ্যরাত্রে তার বাড়িতে এসে ওঠেনি সবিতাব্রত তা জানে। মনের মধ্যে কৌতূহল উঁকিঝুঁকি দিলেও ও সম্পর্কে এতক্ষণ কোন প্রশ্নই করেনি। আকারণ কৌতূহল কিরীটী পছন্দ করে না। কোন দিন প্রশ্রয়ও দেয় না

কিন্তু কিরীটী নিজেই সবিতাব্রতর কৌতূহলের অবসান ঘটায়।

আচ্ছা জব্দ করা গেছে বেটাকে—বলতে বলতে কিরীটী নিঃশেষিত কফির কাপটা একপাশে নামিয়ে রেখে ভাল করে হেলান দিয়ে শোয় চেয়ারের ওপরে।

কিরীটীর হাস্যোদীপ্ত মুখের দিকে তাকিয়ে সবিতাব্রত প্রশ্ন করে, কাকে আবার জব্দ করলি?

সে আছে একজন। বামদেববাবুর ওখানে গিয়েছিলাম—সর্দারজীর ট্যাক্সিতে ফিরছি, দেখি বেটা আমায় ফলো করছে। হঠাৎ মনে হল রাতটা তোর এখানে এসে কাটিয়ে যাওয়াই ঠিক হবে। বেটা বোধ হয় এখনো ট্যাক্সিটা ফলো করছে।—বলতে বলতে কিরীটী হাসল।

আলোটা নিভিয়ে দেব? সবিতাব্রত প্রশ্ন করে।

তা দে।

ঘরের আলোটা নিভিয়ে দিয়ে সবিতাব্রত এগিয়ে গিয়ে আবার ছবিটা নিয়ে বসল পাশের ঘরে। দুই ঘরের মধ্যবর্তী দরজাটা খোলাই রইল

অন্ধকার ঘরের মধ্যে একটা স্তব্ধতা যেন হঠাৎ চাপ বেঁধে ওঠে।

লালবাজারে এল কিরীটী। তার বিশেষ পরিচিত ইন্সপেক্টর সুভাষ দত্তর ঘরে গিয়ে ঢুকল।

সুভাষ দত্ত বললেন, কি ব্যাপার কিরীটীবাবু?

কিরীটী বলল, অ্যাটর্নি রমেশ দত্ত তো আপনার পরিচিত, না?

হ্যাঁ।

তাঁর পার্টনার রাঘব সাহা লোকটা কেমন জানেন?

যেমন মোটা তেমনি কালো ও তেমনি কুটচক্রী। দত্ত অ্যাণ্ড সাহা অ্যাটর্নি ফার্মের ইদানীং যে দুর্নাম রটেছে বাজারে তা তো ঐ রাঘব সাহার জন্যেই শুনেছি। সুভাষ দত্ত বললেন।

আজ একবার দত্ত-সাহার ওখানে একজন কাউকে এখান থেকে পাঠাতে পারবেন?

কেন পারবে না! কিন্তু ব্যাপারটা কি?

শুনুন বহরমপুরে আমার এক বিশেষ পরিচিত ভদ্রলোক বামদেব অধিকারীর রত্নমঞ্জিল নামে একটা বাড়ি বিক্রি হচ্ছে—কথাটা আরো একটু পরিষ্কার করে বলি, কে এক রাণা বাড়িটা কিনবার জন্য দশ হাজার টাকা ইতিমধ্যে অগ্রিমও দিয়েছে। দাম ঠিক হয়েছে পঞ্চান্ন হাজার টাকা। সামনের মাসের পনেরই বিক্রয়-কোবালা-রেজিস্ট্রি হবার কথা।

বুঝলাম।

রাঘবকে সে বলবে তার হাতে একজন খদ্দের আছে। সে ষাট হাজার টাকা দাম দেবে। এবং কমিশন হিসাবে তাকে দেবে পাঁচ হাজার।

বাড়িটা যাতে রাণা কিনতে না পারে, এই তো?

না, ঠিক তা নয়—আসলে বাড়ি বিক্রির ব্যাপারটা মাসখানেক পিছিয়ে দিতে চাই। এমনিতে দত্ত রাজী হলেও তার পার্টনার রাজী হবে না, তাই ঐ টোপ আর কি!

বেশ। কিন্তু ব্যাপারটা কি কিরীটীবাবু?

আসলে ঐ রত্নমঞ্জিলের সঙ্গে একটি অপহৃত সুবর্ণ-কঙ্কন-রহস্য জড়িয়ে আছে।

সুবর্ণকঙ্কন!

হ্যাঁ। পরে আপনাকে সব বলব। কিরীটী আর দ্বিতীয় বাক্যব্যয় না করে একটা ফাইল টেনে নেয়।

ঐদিনই অ্যাটর্নি দত্ত-সাহার নিভৃত চেম্বারে সুভাষবাবু-প্রেরিত লোক যতীন ঘোষ ও রাঘব মুখোমুখি বসে দ্বিপ্রহরে কথা হচ্ছিল। পাশে দত্তও ছিল।

কিরীটীর অনুমান ভুল হয়নি।

রাঘব সাহা নির্বিবাদেই তার টোপ গিলেছে। কিন্তু আপত্তি তুলেছে তার পার্টনার দত্ত।

দত্ত যতীন ঘোষকে বললে, এখন তা কি করে সম্ভব যতীনবাবু। দশ হাজার টাকা অগ্রিম নেওয়া হয়ে গিয়েছে—এতে ব্রিচ অফ্ কনট্রাক্টের মামলায় পড়তে হবে যে!

চেষ্টা করলে আপনি ব্যাপরটা ম্যানেজ করতে পারবেন না—এ আমি বিশ্বাস করতে পারছি না মিঃ দত্ত। এতে করে যদি দু-চার হাজার খরচও হয় আমার পার্টি দিতে রাজী আছে।

রাঘব সায় দেয়, চেষ্টা করে দেখতে একবার ক্ষতিটা কি দত্ত? পাঁচ হাজার টাকাও তো কম নয়!

কিন্তু আসলে ব্যাপারটা কি বলুন তো মিঃ ঘোষ? ঐপুরাতন বাড়িটার প্রতিই বা আপনার ক্লায়েন্টের লোভ হল কেন? দত্ত যতীন ঘোষকে প্রশ্ন করে।

যতীন ঘোষ বললেন, আমার ক্লায়েন্ট কেন ঐ বাড়িটা কিনতে চান তা তো বলতে পারব না তবে ডিলটা করে দিতে পারলে আমিও কিছু পাব।

রাণার তো এখনই আসবার কথা—তাকে আসতে বলেছি। দশ হাজার টাকা সুদ-সমেত দিলে যদি রাজী হয়ে যায়! রাঘব বলে ওঠে।

তা হলে অবিশ্যি কোন ঝামেলাই থাকে না। তবে ব্যাপার যা বুঝেছি তাতে অত সহজে সে রাজী হবে বলে মনে হচ্ছে না।

এমন সময় বেয়ারা এসে সেলাম দিয়ে দাঁড়াল।

কি রে?

আজ্ঞে, রাণা সাহেব এসেছেন।

ভেতরে পাঠিয়ে দে। দত্ত বলে।

একটু পরে রাণা এসে ঘর প্রবেশ করল চেম্বারের সুইংডোর ঠেলে, রাম রাম! দোত্তবাবু, কি ব্যাপার? এত জরুরী তোলব কেন?

বসুন—বসুন রানা সাহেব!

যতীন ঘোষ চেয়ে দেখছিলেন আগন্তুককে। মোটাসোটা ভুঁড়িয়াল চেহারা। গায়ে দামী সার্জের সেরওয়ানী, পরনে মিহি নয়নসুখের ধুতি।

চোখ দুটো ছোট, কিন্তু সতর্ক দৃষ্টি। অতি মাত্রায় সজাগ।

খানিকটা ভণিতা করে অবশেষে সোজাসুজি দত্তই ব্যাপারটা রাণাকে বললে, একটা কথা ভাবছিলাম রাণা সাহেব, মিথ্যে কেন অতগুলো টাকা ঐ পুরাতন বাড়িটার পেছনে ঢালবেন! তার চাইতে আশে পাশে অন্য কোন বাড়ি—

মৃদু হাসিতে রতনলাল রাণার মুখটা উজ্জ্বল হয়ে ওঠে, বলে বাত তো হাপনি ঠিকই বলিয়েছেন দোত্তবাবু—লেকেন একবার যখন টাকা হামি আগাম দিয়েসে, কন্ট্রাক্ট্ ভি হইয়েসে, তোখন ও তো বিক্রিই হয়ে গিয়েসে—কি বোলেন অ্যাঁ!

তা অবিশ্যি বলতে পারেন। তবে যদি আপনাকে সুদের উপরেও কিছু বেশী ধরে দেওয়া যায়! কথাটা বললে রাঘব।

রতনলাল রাণাকে টাকা দেখলাবেন না দোত্তসাহেব। টাকার বাৎ থোড়াই আছে, চান তো আরো কিছু আগাম ভি হামি দিতে পারি। লেকেন ও বাড়িটা হামার চাই-ই।

কিন্তু কেন বলুন তো রাণা সাহেব? রাঘব সাহা প্রশ্ন করে।

সে কি দোত্তবাবু, হাপনাকে তো হামি বলিয়েসে কেন বাড়িটার হামার প্রয়োজন।

ফ্যাক্টরী করবেন তো? তা ওর চাইতে যদি ভাল একটা বাড়ি পাওয়া যায়—মানে অত পুরনো নয়।

না, ওহি বাড়ি হামি লিবে।

শুনুন তবে, আর একজন খরিদ্দার আছে—বলেন তো মাঝখান থেকে কিছু মোটা মতন পেতে পারেন—

না।

তাহলে আপনি ঐ বাড়িটাই নেবেন?

হ্যাঁ।

কিন্তু আমি বলছিলাম কি—

দেখেন দোত্তবাবু, হামি রতনলাল —সিধা বাতের লোক আছে। সিধা বাতই হামি পসন্দ্ কোরে। হাপনাদের কাছে ভি সিধা বাতই চাই দোত্তবাবু। রূপেয়া দেখলাচ্ছেন

রতনলালকে—ও তো হাতের মোয়ালা আছে, আনা-যানা তো রূপেয়াকে দস্তুর আছে!

মিঃ রাণা, আপনি ঠিক আমাদের কথা ধরতে পারেননি—ও কথা আমি বলিনি। বলিছলাম একটা সেকেলে পুরাতন বাড়ির পিছনে মিথ্যে কেন অতগুলো টাকা ঢালবেন! তাছাড়া—বিনীত হাস্যের সঙ্গে রাঘব সাহা আরো বলবার চেষ্টা করে।

কিন্তু থামিয়ে দেয় রাণা। বলে, আইনের কারবারী আপনি দোত্তবাবু, এ কেমন বাত করছেন? হামি যদি বলি, যে বাবুটি এখোন বাড়িটা কিনতে চাইছেন তিনিই বা কিনতে চান কেন? বোলেন—জবাব দেন! বলতে বলতে হা-হা করে রতনলাল হেসে ওঠে।

হাসির উচ্ছ্বাসে তার মেদ ও চর্বিবহুল বিরাট শরীরটা দুলতে থাকে।

যতীন বুঝতে পারে রতনলালকে অত সহজে ঘায়েল করা যাবে না। সে গভীর জলের কাতলা। এবং তার অফিসের সুভাস দত্তর মুখ থেকে শোনা কহিনীটা আবার আগাগোড়া তার মনে পড়ে।

সুবর্ণকঙ্কন আর রত্নমঞ্জিল এই দুটোর মধ্যে যে একটা রহস্য জড়িয়ে আছে এবং একে অন্যের সঙ্গে যে ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কিত সে সম্পর্কেও আর সন্দেহের অবকাশ মাত্রও থাকে না।

আচ্ছা দোত্তবাবু, হামি এবারে উঠ্‌বে। আর হাঁ, রূপেয়ার আউর জরুরৎ হোয় তো গদিতে একটা ফোন কোরে দেবেন, হামি রূপেয়া ভেজ দেবো। রাম রাম বাবু!

রতনলাল গাত্রোত্থান করল এবং ধীরপদে একবার আড়চোখে অদূরে চেয়ারে উপবিষ্ট যতীনের দিকে তাকিয়ে ঘর হতে বের হয়ে গেল।

সুইং-ডোরটা ফাঁক হয়ে আবার স্বস্থানে ফিরে এল।

তাহলে এখন উপায়? প্রশ্নটা করে যতীন দত্তকে এবারে।

রেজিস্ট্রির দিনটা মাসখানেক পিছিয়ে দেওয়া ভিন্ন তো আর কোন উপায় দেখছি না! চিন্তিতভাবে দত্ত বলে।

বেশ, তবে অন্তত তাই করুন।

আরো মিনিট পনের পরে যতীন দত্ত-সাহার অফিস হতে বিদায় নিয়ে রাস্তায় এসে জীপগাড়িতে উঠে ড্রাইভারকে স্টার্ট দিতে বললে।

॥ চার ॥

ওল্ড কোর্ট হাউস স্ট্রীট তখন অসংখ্য প্রাইভেট গাড়ি ও মানুষের ভিড়ে সরগরম।

একটা পান-সিগারেটের দোকানের সামনে লম্বা ঢ্যাঙা মত একজন লোক মুখে একটা সিগারেট, আড়চোখে পুলিসের জীপগাড়ির দিকে তাকিয়ে ছিল। যতীন দত্তকে গাড়ীতে উঠে চলে যেতে দেখে সেও চট্ করে একটা ট্যাক্সিতে উঠে ড্রাইভারকে বললে অগ্রবর্তী জীপগাড়িটা দেখিয়ে সেটাকে অনুসরণ করতে।

এদিকে দত্ত অ্যাণ্ড সাহা অ্যাটর্নির ফার্ম থেকে বের হয়ে রতনলাল সোজা নেমে এসে রাস্তায় অপেক্ষামান তার নিউ মডেলের ঝকঝকে স্টুডিবেকার গড়িটার সামনে দাঁড়াল। ড্রাইভার কিষেণ হাত বাড়িয়ে গাড়ির দরজা খুলে দিল।

গড়ির মধ্যে অত্যন্ত ঢ্যাঙা ও রোগা একটি লোক, পরিধানে পায়জামা ও পাঞ্জাবি, তার

উপরে সার্জের সেরওয়ানী, মাথায় একটা সালের টুপি, হাতে ধরা মার্কোভিচের একটা টিন, নিঃশব্দে বসে ধূমপান করছিল।

রতনলালকে গাড়ির মধ্যে উঠে বসতেই সেই ঢ্যাঙা লোকটি প্রশ্ন করলে, তোমার অ্যাটর্নি কেন ডেকেছিল হে?

প্রশ্নকারীর জবাব কোন কিছু না বলে রতনলাল ড্রাইভার কিষেণের দিকে তাকিয়ে বলল, অফিস চল। জোরে চালাও।

গাড়ি চলতে শুরু করে।

কোর্ট ভেঙেছে, এই সময়—ঐ রাস্তায় বেজায় ভিড়, তা সত্ত্বেও কিষেণ দক্ষ চালনায় অনায়াসেই ভিড়ের মধ্যে দিয়ে বাঁচিয়ে গাড়ি বেশ জোরেই চালিয়ে নিয়ে যায়।

রতনলাল গাড়ির নরম গদিতে বেশ আরাম করে হেলান দিয়ে বসে জামার পকেট থেকে সুদৃশ্য একটা রূপার কৌটা বের করে, কৌটা হতে দু-আঙুলের সাহায্যে খানিকটা সুগন্ধি মিষ্টি সুপারি বের করে মুখগহ্বরে ফেলে কৌটোটা আবার যথাস্থানে রেখে দিল।

আরাম করে সুপুরি চিবুতে চিবুতে এতক্ষণে রতনলাল কথা বললে, পিয়ারীলাল, আজ রাত্রেই তুমি একবার বামনদেব অধিকারীর সঙ্গে দেখা কোরবে। তোমার হাতে হামি কিছু নগদ টাকা দেবে—চেষ্টা কোরবে যাতে কোরে রত্নমঞ্জিলের বিক্রয়-কোবালাটা দু'তিনদিনের মধ্যেই রেজিষ্ট্রি করিয়ে নেওয়া যায়। দরকার যেমন বুঝবে—পঞ্চান্ন হাজার টাকা ছাড়াও দু-চার হাজার যদি বেশীও দিতে হয়, কবুল করে আসবে। মোট কথা মনে রাখবে, রেজিস্ট্রিটা দু-তিন দিনের মধ্যেই করিয়ে নিতে চাই।

পঞ্চান্ন হাজার টাকার উপরেও আরো দু-চার হাজার!

হ্যাঁ, দরকার হলে আরো দশ-বিশ হাজার—

কিন্তু ব্যাপারটা কি শেঠ?

ও বাড়ির আরো খরিদ্দার জুটেছে।

বল কি শেঠ।

হ্যাঁ—

কিন্তু অধিকারীকে তো আগাম দশ হাজার টাকা বায়না দেওয়া হয়ে গিয়েছে, এখন অন্য পার্টির কথা আসে কোথা থেকে?

সে যদি এখন খেসারত দিয়ে বায়না ফিরিয়ে দেয়, বলে বিক্রি করব না—আটকাবে কি কোরে? তাই ভেবেছি চাঁদির জুতি দিয়ে বেটার মুখ বন্ধ করব। আমিও রতনলাল রাণা। একবার যখন হাত বাড়িয়েছি, এত সহজে হাত গুটাবো না।

কিন্তু শেঠ, তুমি কি সত্যিই মনে কর সেই বেটা মালীর কথা সত্যি?

কিন্তু সোনার মোহরটা তো সত্যি! একেবারে খাঁটি বাদশাহী মোহর!

পিয়ারীলাল বললে, বহরমপুর এককালে নবাবদের লীলানিকেতন ছিল! সেখানকার মাটিতে এক-আধটা বাদশাহী মোহর কুড়িয়ে পাওয়া এমন কোন আশ্চর্য ব্যাপার নয়। স্রেফ্ একটি দু'টি সোনার মোহর পাওয়ার ওপরে এতগুলো টাকা নিয়ে এমনি বাজি খেলাটা কি যুক্তিসঙ্গত হবে শেঠ?

আরে জীবনটাই তো একটা বাজি খেলা! বাজি খেলায় হারজিত আছেই—জীবনে বহু বাজিতে জিতেছি, না হয় এ বাজিতে হারলামই। রতনলাল তার জন্য পরোয়া করে না!

সত্যি স্রেফ্ একটা বাজি খেলাই বটে!
রতনলাল রাণা বাজি খেলতেই নেমেছে!

মাস দেড়েক আগেকার কথা।

ব্যাপারটা প্রথম হতেই একটা দৈবাৎ ঘটনাচক্র বলেই মনে হয়।

হরিহর রতনলালের বাড়িতে ভৃত্যের কাজ করে। তার দেশ বহরমপুরে।

মাসখানেকের ছুটি নিয়ে হরিহর গিয়েছিল তার দেশে বহরমপুরে। অনেকদিনের বিশ্বাসী এবং প্রিয় ভৃত্য হরিহর রতনলালের। বহরমপুরে বামদেব অধিকারীর পূর্বপুরুষদের বাড়ী রত্নমঞ্জিল এমনি খালিই বহুদিন হতে পড়ে আছে। হরিহরের এক ভাই মনোহর রত্নমঞ্জিল থাকে 'কেয়ার টেকার' হিসাবে।

খাওয়া-পরা ছাড়া নগদ ত্রিশটি করে টাকা মাসান্তে বামদেব পাঠিয়ে দিতেন নিয়মিত মনোহরকে।

প্রকাণ্ড দোমহলা বাড়ি রত্নমঞ্জিল, প্রসাদ বললেও অত্যুক্তি হয় না। বাড়ির সামনে ও পশ্চাতে এখন অবিশ্যি দুর্ভেদ্য জঙ্গল। সেখানে বিষধরদের সর্পিল আনাগোনায় মধ্যে মধ্যে হঠাৎ কম্পন জাগে?

মনোহরের বয়স চল্লিশের মধ্যে। একা মানুষ, বিয়ে-থা করেনি। কালো কুচকুচে কষ্টিপাথরের মত গাত্রবর্ণ এবং বেঁটে গাঁট্টাগোট্টা চেহারা। প্রথম বয়সে মনোহর এক রাজপুত দারোয়ানের সঙ্গে দোস্তি পাতিয়ে লাঠি খেলা শিক্ষা করেছিল। এখনো তার সে রোগ যায়নি। রত্নমঞ্জিলের পশ্চাৎভাগে খানিকটা জঙ্গল পরিষ্কার করে নিয়ে পাড়ার কয়েকটি উৎসাহী ছেলেকে যোগাড় করে লাঠি খেলা শেখায় ও কসরৎ করে প্রতিদিন বিকেলের দিকে। নিচের মহালের একটা ঘর পরিষ্কার করে নিয়ে সেখানেই থাকে।

নিজের হাতে দু'বেলা রান্নাবান্না করে আর পাঁচ হাত লম্বা তৈলমসৃণ লাঠিটা রাত্রে শিয়রের কাছে রেখে নিশ্চিন্তে নাক ডাকায়।

সপ্তাহের মধ্যে এক-আধদিন ওপরের ও নীচের মহলের ঘরগুলি ঝাড়পোঁছ করে। নিচের মহলের খান দুই ঘর ও ওপরের মহলের দক্ষিণ দিকের একটা ঘরে তালা দেওয়া। পুরাতন আমলের ভারী লোহার তালা প্রায় সের দেড়েক ওজনের হবে। কতকাল যে তালাগুলো খোলা হয় না—জং ধরে আছে। ঐ তিনটি বন্ধ ঘর ছাড়া অন্যান্য ঘরগুলোর তালার চাবি মনোহরের কাছেই থাকে।

গত ষোল-সতের বছর ধরে বামদেব অধিকারী রত্নমঞ্জিলে পা দেননি। মনোহরই এ বাড়ির একমাত্র বাসিন্দা। মনোহর প্রায় বছর আঠারো-উনিশ হয়ে গেল এ বাড়িতে 'কেয়ার টেকার' হয়ে আছে। মনোহরের জানিত কালে বার তিনেকের জন্য মাত্র বামদেব অধিকারী রত্নমঞ্জিলে এসেছিলেন। একবার দুদিন, তার পরের বার আটদিন ও শেষবার দিনচারক থেকে গিয়েছিলেন এবং সে সময়েও ঐ তালাবন্ধ ঘর তিনিটি খোলা হয়নি, কারণ বামদেবের কাছেও ঐ তালার চাবি ছিল না।

বহুকালের পুরাতন বাড়ি। নিচের তলার ঘরের মেঝেতে ফাটল ধরেছে। আচম্‌কা একদিন মনোহর যে ঘরে বাস করত নিচের তলায় তারই মেঝের ফাটলপথে দেখা দেয় এক বিষধর কালকেউটে। সন্ত্রস্ত মনোহর কেউটের বাসা ধ্বংস করতে গিয়ে ঘরের মেঝের খানিকটা

খুঁড়ে ফেলে এবং মাটি খুঁড়তে গিয়ে পায় দুটি বাদশাহী মোহর!

সোনার মোহর দুটি মনোহর সযত্নে তার প্যাঁটরার মধ্যেই রেখে দিয়েছিল, কারণ তার যথার্থ মূল্য সম্পর্কে মনোহর যথেষ্ট ওয়াকিবহাল ছিল তো না ই—এবং সে কোনদিন খুব বেশী অর্থ সম্পর্কে সচেতনও ছিল না বলেই আকস্মিকভাবে মাটি খুঁড়তে গিয়ে পাওয়া সোনার মোহর দুটি সম্পর্কেও বিশেষ কোন উত্তেজনা বোধ করেনি। কেবল যত্নের সঙ্গে প্যাঁটরার মধ্যে রেখে দিয়েছিল জামাকাপড়ের তলায় একফালি ন্যাকড়ায় বেঁধে।

ভুলেও গিয়েছিল বাদশাহী মোহর দুটোর কথা। তবে ইচ্ছা ছিল এবারে বাড়ির কর্তা এলে তার হাতে মোহর দুটি তুলে দেবে।

এমন সময় এলো কলকাতা হতে হরিহর! হরিহরেরও সংসারে এক মা-মরা বয়স্থা কন্যা ছাড়া কেউ ছিল না। তার বিয়েটা দিতে পারলেই সে নিশ্চিন্ত। প্রভু রতনলালকেও সে কথা বলেছিল। রতনলাল তার মেয়ের বিবাহে সাধ্যমত সাহায্যদানের প্রতিশ্রুতিও দিয়েছিল।

হরিহরের এবারে ছুটি নিয়ে আসবার আরো একটা উদ্দেশ্য ছিল মেয়েটিকে দেখেশুনে পাত্রস্থ করা। পাত্র একটি দেখা হল, কিন্তু টাকার খাঁকতি তার বড় বেশী। একদিন কথায় কথায় সেকথা মনোহরকে বলতে মনোহর তাকে আশ্বাস দিল তার হাতে জমানো যা আছে সে সব দেবে। এবং কথায় কথায় হঠাৎ সোনার মোহর দুটির কথা মনে পড়ায় সে দুটি প্যাঁটরা হতে বের করে হরিহরের হাতে দিয়ে বলে, মাটির তলায় মোহর দুটি সে পেয়েছে, সে ভেবেছিল বাড়ির মালিককেই মোহর দুটি দেবে—তা ঐ দুটোতে হরিহরের যদি কোন সাহায্য হয় তো সে নিতে পারে।

কলকাতায় শেঠের বাড়িতে চাকরি করে হরিহর, মোহর দুটি দেখেই সে বুঝেছিল তার মূল্য আছে এবং তার প্রভু শেঠকে মোহর দুটি দিলে বিনিময়ে সে বেশ মোটামত কিছু পাবে। সেই আশাতেই মোহর দুটি এনে সে মনিবের হাতে তুলে দেয়।

জহুরী রতনলাল মোহর দুটি পেয়ে সবিস্ময়ে প্রশ্ন করে হরিহরকে, কোথায় পেলি?

হরিহর মোহরের বৃত্তান্ত সব খুলে বলে।

হরিহরের মুখ থেকে মোহরের বৃত্তান্ত শুনে রতনলাল ব্যাপারটা গভীর ভাবে চিন্তা করে। পুরনো বাড়ির মেঝে খুঁড়ে মোহর পাওয়া গিয়েছে। ব্যাপারটার মধ্যে বিস্ময়কর কিছু নেই। আগেকার দিনে অমন অনেকেই তাদের ধনরত্ন ঘরের মেঝেতে—মাটির নীচে সংগোপনে লুকিয়ে রাখত, হয়তো ঐ রত্নমঞ্জিলের মাটির নীচেও তেমনি আছে!

সঙ্গে সঙ্গে একটা লোভের আগুন জ্বলে উঠে রতনলালের মনের মধ্যে।

রতনলাল হরিহর কে প্রশ্ন করে, এ মোহর দিয়ে তুই কি করবি?

কি করব আর বাবু—বিক্রী করে দেবো।

রতনলাল মোহর দুটি রেখে তখন হরিহরকে নগদ একশত টাকা দেয় হরিহর তাতেই খুশী।

দিন দুই বাদে কথা প্রসঙ্গে রাণা রতনলাল তার এক বাঙালী বন্ধুকে মোহরের কথা বলায় কৌতূহলী বন্ধু মোহর দুটো দেখতে চান।

॥ পাঁচ ॥

মোহর দুটো দেখে এবং মোহর প্রাপ্তির কাহিনী রাণার মুখে শুনে বন্ধু বলেন, তাজ্জব ব্যাপার! শুনেছি আগেকার দিনে অনেক ধনীরা মাটির নীচে ঘড়া ঘড়া মোহর পুঁতে যখ করে রাখত। খবর নাও শেঠ, বাড়িটা কতদিনের পুরাতন এবং বর্তমানে মালিক কে!

হরিহর কিছু কিছু সংবাদ রত্নমঞ্জিল সম্পর্কে তার ভাই মনোহরের মুখেই শুনেছিল—সবই শেঠকে বলেছিল।

শেঠের মুখে সেই কাহিনী শুনে বন্ধু বলেন, নিশ্চয়ই ঐ বাড়ির নীচে মাটির তলায় গুপ্তধন পোঁতা আছে। এক কাজ কর রতনলাল, তুমি ঐ বাড়িটা কিনে নাও!

রতন তখন বলে, আমারও তাই মনে হচ্ছে—

বন্ধু বলেন, মনে হচ্ছে কি হে! নিশ্চয়ই অনেক মোহর আছে ঐ রত্নমঞ্জিলের মাটির নীচে!

অর্থের প্রলোভন বড় মারাত্মক। একবার সে প্রলোভন মনের মধ্যে এসে বাসা বাঁধলে তার হাত থেকে রেহাই পাওয়া দুষ্কর।

অনিশ্চিত গুপ্তধনের নেশায় মেতে ওঠে রতনলাল।

একদিন গিয়ে সে অধিকারীর সঙ্গে দেখা করলে। বাড়িটা সে কিনতে চায়, খাগড়ার বাসনের কারখানা খুলবে—কি দাম চান অধিকারী?

বামদেব কিন্তু বিস্মিত হন প্রস্তবটা শুনে। প্রথমটায় তো তিনি বিশ্বাসই করতে পারেননি।

কিন্তু রাণার বারংবার বিশেষ অনুরোধে শেষ পর্যন্ত বলেন ভেবে দেখি, পরে জানাব।

দিন কয়েক পরে ফের রাণা দেখা করে, কিন্তু সেবারও ঐ একই জবাব পায়।

রাণার কিন্তু সবুর সয় না। দিন দুই পরে আবার তাগাদা দেয়, কি মিঃ অধিকারী ভেবে দেখলেন? বাড়িটা তো আপনার পড়েই আছে! আপনার কলকাতায় বাড়ি আছে, আপনি আর যাবেনও না সে বাড়িতে—

তা ঠিক। তবে পূর্বপুরুষের বাড়ি—একটা স্মৃতি—

স্মৃতি দিয়ে কি হবে বলুন? শিক্ষিত লোক—আপনাদেরও যদি এসব সেন্টিমেন্ট থাকে—তা ছাড়া বাড়িটা তো ভাঙছি না, রইলই যেমন তেমন—

আমাকে আর কটা দিন ভেবে দেখতে দিন!

এর আর ভাববেন কি। চেক-বই আমি সঙ্গেই এনেছি, বলনে তো কিছু আগাম দিয়ে যাই—

ব্যস্ত হচ্ছেন কেন! হবে'খন। —তবু বামদেব বলে।

দিন দুই বাদে আবার রতনলালের তাগাদা, কি ঠিক করলেন?

বেশ তো হবে'খন! —সেই পূর্বের জবাব।

হবে'খন নয়, আমাকে কথা দিন—ও-বাড়ি আমাকে ছাড়া বেচবেন না!

বামদেব রতনলালের বাড়ি কেনার অতি মাত্রায় আগ্রহ দেখে কেমন যেন একটু বিস্মিতই হয়, সত্যি কথা বলতে কি।

একটা পুরাতন আমলের বাড়ি তাও দূর শহরে এবং লোকালয় থেকে দূরে তার জন্য রাণার এত আগ্রহই বা কেন?

স্ত্রীর সঙ্গে পরামর্শ করেন বামদেব। স্ত্রী সাবিত্রী বলেন, দাও বিক্রি করে। পড়েই তো আছে। ঐ টাকা দিয়ে কলকাতায় না-হয় আর একটা বাড়ি কেনা যাবে।

ব্যবসায়ী লোক বামদেব। স্ত্রীকে বললে, ভেবে দেখি।

তারপর শুরু হল বাড়ির দর নিয়ে কষাকষি। এবং রাণার গরজ বুঝে বামদেব বাড়ির দাম হাঁকাতে শুরু করলে।

শেষ পর্যন্ত দর কষতে কষতে পঞ্চান্ন হাজার টাকায় স্থির হল মূল্য এবং একদিন দশহাজার টাকা অগ্রিম বায়না দিয়ে একটা লেখাপড়াও হল ; স্থির হলো পরের মাসের পনেরই বিক্রয়-কোবালা রেজিষ্ট্রি হবে।

উক্ত ঘটনারই দিন তিনেক পর হতে বামদেবের কলকাতার বাড়িতে চোরের উপদ্রব শুরু হল হঠাৎ।

এবং সেই সূত্রেই বামদেব একদিন তার বন্ধু কিরীটীকে ডেকে পাঠায় তার ওখানে। তার পরামর্শ নেবে স্থির করে ও ঐ ব্যাপারে।

অফিস ঘরে ঢুকে রতনলাল পিয়ারীকে বসতে বললে।

তোমার গাড়িতে বসে যেমন বললাম সেই ভাবে কাজ করবে পিয়ারী। অধিকারী রাত দশটা নাগাদ বাড়ি ফেরে, তুমি দু-চার মিনিট আগেই তার বাড়িতে বসে অপেক্ষা করবে। আর কাল সকালেই রাঘবের সঙ্গে দেখা করবে।

বেশ। তবে এবারে আমি উঠি।

হ্যাঁ, যাও।

পিয়ারী বের হয়ে গেল। সঙ্গে সঙ্গেই বেয়ারা এসে ঘরে প্রবেশ করল, ছট্টুলাল হুজুরের সঙ্গে দেখা করবে বলে সেই দুপুর থেকে এসে বসে আছে।

ছট্টুলাল নামটা শুনেই রতনলালের ভ্রূ দুটো কেমন কুঁচকে ওঠে, বলে বলগে যা আজ দেখা হবে না। কাল-পরশু আসতে।

বেয়ারা চলে যাচ্ছিল, হঠাৎ রতনলালের একটা কথা মনে পড়ায় বলে, আচ্ছা দে ঘরে পাঠিয়ে।

একটু পরেই ছট্টুলাল এসে ঘরে প্রবেস করল। ছট্টুলালকে দেখে তার বয়স ঠিক কত নিরূপণ করা শক্ত। দড়ির মত পাকানো শরীর। ঘাড়টা লম্বা। একটা আলপাকার সবুজ রংয়ের রুমাল ফাঁস দিয়ে বাধা গলায়। পরিধানে ঢোলা অর্ধমলিন পায়জামা, গায়ে একটা পাঞ্জাবি ও গরম জহর কোট। পায়ে ডার্বি সু।

সমগ্র মুখখানায় দীর্ঘ অত্যাচারের চিহ্ন যেন অত্যন্ত সুস্পষ্ট। অত্যধিক ধূমাপানের ফলে কালো কুচকুচে ঠোঁট দুটো। ডান ভ্রূর ওপর একটা দেড় ইঞ্চি পরিমাণ লম্বা ক্ষতচিহ্ন।

সেলাম শেঠজী!

কি খবর ছোট্টু?

বত্রিশটা দাঁত বিকশিত করে ছট্টু বিনয়ে যেন বিগলিত হয়ে গেল, দিন-কাল আর তো চলছে না শেঠজী। পাকিট গড়ের মাঠ। ভোঁ ভোঁ।

কত টাকার দরকার?

হুজুর তো হাত ঝাড়লেই পর্বত! যা দেবেন দয়া করে—

একটা কাজ করতে পারবি?

গোলাম তো সর্বদাই হুজুরের হাজির। বাতলান কি করতে হবে! কারোর জান, কলিজা—

না, না—ওসব কিছু না। কিন্তু কাজটা শক্ত। পারবি তো?

বলেনই না। কি এমন শক্ত কাজ আছে!

বহরমপুরে যেতে হবে—

কবে?

আজকালের মধ্যেই, যত তাড়াতাড়ি হয়।

যাব। কিন্তু বহরমপুরে কেন হুজুর?

বলছি।

ছট্টুলাল তাকায় রতনলালের মুখের দিকে।

তোকে ঠিকানা লিখে দিচ্ছি। একটা বাড়ির ওপরে নজর রাখতে হবে। কেউ আসে কিনা—কেউ এলে সে কেমন দেখতে, কি নাম, কোথা হতে আসছে যতটা সম্ভব খবর দিবি। পারবি তো? ভেবে দেখ্!

কেন পারব না হুজুর? এ আর এমন কাজটা কি—

পকেট থেকে দশ টাকার খান-দশেক নোট বের করে এগিয়ে দিল রতনলাল ছট্টুর দিকে, আপাতত এই টাকা রাখ্। ফার্স্ট ট্রেনেই যাবি।

শীর্ণ বাঁকানো লোভী আঙুলগুলো সমেত হাত বাড়িয়ে দেয় ছট্টু, টাকগুলো নেবার জন্য। এবং একপ্রকার প্রায় ছোঁ মেরেই টাকাগুলো মুঠি করে জামার পকেটে ঢোকায়।

সেলাম শেঠজী। চললাম, সব খবর এনে দেবো।

নিমেষে ছট্টুলাল ঘর হতে বের হয়ে গেল।

আরো ঘন্টাখানেক বাদে অফিস ছুটি হয়ে গিয়েছে। কর্মচারীরা যে যার ঘরে চলে গিয়েছে।

রতনলাল এগিয়ে গিয়ে ঘরের দরজাটা ভিতর থেকে এঁটে দিয়ে চেয়ারের ওপরে এসে আরাম করে বসল। চাবি দিয়ে বাঁ পাশের ড্রয়ার খুলে একটা বেঁটে কালো বোতল, একটা গ্লাস ও জলের বোতল বের করল। খানিকটা তরল পদার্থ গ্লাসে ঢেলে কিছুটা জল মিশিয়ে বার দুই সবে চুমুক দিয়েছে, এমন সময় বন্ধ দরজার গায়ে মৃদু টোকা পড়ল।

কে?

কোন জবাব নয়। আবার দুটো টোকা পড়ল।

pathagar.net

॥ ছয় ॥

বামদেব অধিকারীর পার্ক সার্কাসের বাড়ির দ্বিতলের একটি ঘর। রাত আটটা বাজে।

সোফায় বসে একটি মেয়ে কি একখানা বই পড়েছে। বছর কুড়ি বয়সের মেয়েটি ছিপছিপে দেহের গঠন। গায়ের রং গৌরবর্ণ না হলেও সমস্ত চেহারার মধ্যে যেন একটা অপূর্ব শ্যাম স্নিগ্ধতা। মুখখানি বয়সের অনুপাতে যেন কচি বলেই মনে হয়। টানা আয়ত দুটি সচকিত চঞ্চল ভাব। মাথার চুল ঘাড়ের দু'পাশে বেণীর আকার লম্বমান।

মেয়েটির নাম সুজাতা। বামদেবের পালিতা বন্ধুকন্যা। একটা ভয়াবহ মোটর দুর্ঘটনায় সুজাতার মা-বাবা ঘটনাস্থলেই মারা যান। সেই থেকে বামদেব ও তাঁর স্ত্রী সাবিত্রী সুজাতাকে

নিজ সন্তানের মত লালন করে এসেছেন। সুজাতা তখন মাত্র তিন বৎসরের বালিকা। সুজাতার তো মা-বাপকে মনেই নেই, বাইরের লোকেরাও জানে সাবিত্রী ও বামদেবেরই একমাত্র কন্যা সুজাতা ; একমাত্র সন্তান। সুজাতা জানে সাবিত্রী দেবীই তার মা। বামদেবই তার বাপ। সুজাতা কলেজের তৃতীয় বার্ষিক শ্রেণীর ছাত্রী।

সাবিত্রীর ইচ্ছা তার বোনপো বিনয়ের সঙ্গে সুজাতার বিবাহ দেন। বিনয়ের সঙ্গে সুজাতার পরিচয় আছে। বিনয় যখন শিবপুরে থেকে ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ত, সেই সময় থেকেই বামদেবের বাড়িতে তার ঘন ঘন যাতায়াত ছিল।

শিবপুর থেকে ইঞ্জিনিয়ারিং পাশ করে বিনয় বিলেতে যায় এবং বছর দেড়েক হল সেখান থেকে ফিরে কলকাতার এক বিদেশী ফার্মে মোটা মাহিনায় চাকরি নিয়েছে এবং পূর্বের মতই এখনো ঐ গৃহে সে যাতয়াত করে। সাবিত্রীর ইচ্ছা ছিল বিনয় এবারে তারই বাড়িতে থাকুক কিন্তু বিনয় কিছুতেই রাজী হয়নি। সে এক হোটেল ঘর নিয়ে আছে।

বিনয়ের প্রতি সুজাতার মনোগত ভাবটা ঠিক কিন্তু বোঝা যায় না। বিনয় ও সুজাতার সঙ্গে দেখা হলেও দু-চার মিনিটের মধ্যে খিটিমিটি লেগে যায়। বিনয়ের বাঁশীর মত টিকোল নাক—সুজাতা তাকে 'নাকু' 'নাকেশ্বর' 'নাকানন্দ' প্রভৃতি বিশেষণ বিভূষিত করে। আর বিনয়ও সুজাতার গায়ের রং শ্যামবর্ণ বলে কখনো 'কালোজিরে' 'কালিন্দী', 'কালীশ্বরী' ইত্যাদি ইত্যাদি ভূষণে অলঙ্কৃত করে তাকে রাগাবার চেষ্টা করে।

আবার পরস্পরের যত শলাপরামর্শ পরস্পরকে বাদ দিয়েও হয় না।

সাবিত্রী কখনো কখনো বলেছেন, বিনয়ের সঙ্গে ঝগড়া করিস, ওর সঙ্গেই তো তোর আমি বিয়ে দেব ঠিক করেছি!

নাক সিঁটকে ঘাড় দুলিয়ে সুজাতা বলেছে, মাগো, ঐ নাকুয়া নাকেশ্বর বোনপোকে তোমার কোন্ দুঃখে বিয়ে করতে গেলাম মা! সারা দেশে কি আর পাত্তর নেই!

অমন পাত্র কোথায়, বিলেত-ফেরতা ইঞ্জিনিয়ার, বড় চাকুরে—

রক্ষে কর মা জননী। তার চাইতে গেরুয়া বসন অঙ্গেতে ধরে যোগিনী হওয়াও ঢের ভাল।

অমন পাত্র তোর মনে ধরে না পোড়ারমুখী! বরাতে তোর তাই লেখা আছে—কৃত্রিম কোপের সঙ্গে বলেছেন সাবিত্রী দেবী।

সঙ্গে সঙ্গে দু'হাতে মায়ের গা জড়িয়ে ধরে সুজাতাও বলেছে ঃ

মা আমার গণৎকার
ইয়া লম্বা দাড়ি তার
আমার ভাগ্যে দেছে গনে,
বলতো দেখি আর কি আছে
ভাগ্যে আমার লেখা—
কপাল আমার গুণে?

আথচ এদিকে আবার দেখেন দু-তিনদিন পরপর বিনয় না এলে সুজাতা ব্যস্ত হয়ে ওঠে। কারণে অকারণে এঘর এঘর করে বেড়ায়। কেমন একটা চাঞ্চল্য।

সাবিত্রী শুধান, অমন ছট্‌ফট করছিস কেন রে?

আচ্ছা, নাকানন্দ স্বামীর কি হয়েছে বল তো মা! হিমালয়েই তপস্যা করতে গেলেন

নাকি? টিকিটি পর্যন্ত দেখা যাচ্ছে না কদিন।

জানি না বাপু। মনে মনে হাসেন সাবিত্রী।

কিন্তু একটা খোঁজ নেওয়া তো দরকার!

গরজ থাকে নিজে যা না গাড়ি নিয়ে।

বয়ে গিয়েছে তোমার নাকেশ্বর কুচ্‌কুচের ওখানে যেতে! মরুক গে। যেমন গণ্ডারের মত নাক তেমনি হোঁৎকা বুদ্ধি তো। তাছাড়া খবর নেওয়া উচিত তো তোমারই, তুমি তো আর পর নও—নিজের মায়ের পেটের বোন মাসী বলে কথা।

সাবিত্রী মেয়ের কথায় আবার না হেসে থাকতে পারেন না।

বামদেবের কিন্তু এসব খেয়াল নেই। নিজের কাজ-কারবার নিয়েই ব্যস্ত।

দিন-পাঁচেক বিনয় এ-বাড়িতে আসেনি।

সুজাতা সোফায় বসে বই পড়ছিল। নিঃশব্দ পায়ে পশ্চাৎ দিকে এসে এমন সময় দাঁড়ায় বিনয়। পায়ে ক্রেপ সোলের চপ্পল পরিধানে সাদা ট্রাউজার ও সাদা লিনেনের হাফ্ শার্ট।

টক্‌টকে গোরাদের মত গায়ের রং—সমস্ত মুখখানার মধ্যে নাকটা যেন উদ্ধত ভঙ্গীতে উঁচিয়ে আছে। জোড়া ভ্রু। কোঁকড়ানো চুল ব্যাকব্রাস করা করা। মাঝারি দোহারা গঠন। বিনয়কে সত্যিই সুন্দর বলা চলে।

হঠাৎ পিছন দিক হতে অধ্যয়নরত সুজাতার বইখানা ছোঁ মেরে টেনে নিয়ে গম্ভীর গলায় বিনয় বলে, কাকেশ্বরী কোন্ দাঁড়কাক-কাহিনী পড়া হচ্ছিল দেখি!

দেখ, ভাল হবে না কিন্তু—দাও, আমার বই ফিরিয়ে দাও বলছি। বলতে বলতে দু-হাত বাড়িয়ে ওঠে সুজাতা।

দেবো—আগে চা খাওয়াও এক কাপ।

ইঃ, বয়ে গেছে নাকানন্দকে আমার চা খাওয়াতে। মুখ বেঁকিয়ে জবাব দেয় সুজাতা।

চা না হয় এক কাপ কোকো কিংবা এক কাপ কফি।

এক গ্লাস এঁদো পুকুরের পচা জলও নয়। কি আমার গুরুঠাকুর এলেন রে!

বোঝা যাবে দাও কি না। একবার সাতপাক ঘোরাই—

আমিও চোদ্দপাক ঘুরিয়ে নাকচ করে না দিই তো আমার নাম সুজাতা নয়।

তাতে করে আরো শক্ত হবে বাঁধান। হা-হা করে হেসে ওঠে বিনয়।

ঘরে এসে প্রবেশ করলেন বামদেব ঐ সময়, এই যে বিনয় ; কখন এলে?

এই কিছুক্ষণ।

সুজাতা দ্রুতপদে ঘর ছেড়ে চলে যায়।

বস, আমি জামাটা ছেড়ে চলে আসি।

বিনয় সোফার ওপর একা একা বসে সুজাতার বইয়ের পাতা ওল্টাতে থাকে।

একটু পরে বামদেব ফিরে এলেন, তোমাকে আমি ডেকে পাঠিয়েছি একটা পরামর্শের জন্য বিনয়।

পরামর্শ!

হ্যাঁ!

কিসের পরামর্শ মেসোমশাই?

তুমি জান বহরমপুরের রত্নমঞ্জিলটা এক গুজরাটি ভদ্রলোককে বিক্রী করব বলে বায়না

নিয়েছিলাম, আশাতীত মূল্য আবার পাওয়া যাচ্ছিলও—

হ্যাঁ, মনে আছে।

গতকাল ডাকে একটা অজ্ঞাতনামা ব্যক্তির চিঠি পেয়েছি! চিঠিটা অদ্ভুত। চিঠির নীচে কারো নাম সই নেই, কেবল লেখা আছে জনৈক ব্যক্তি। এই সেই চিঠি, পড়ে দেখ।

এগিয়ে দিলেন বামদেব চিঠিটা বিনয়ের দিকে। সংক্ষিপ্ত চিঠি।

শীযুক্ত বামদেব অধিকারী সমীপেষু,

জানিলাম আপনি রত্নমঞ্জিল বিক্রয় করিতেছেন। পূর্বপুরুষের ভিটা এভাবে টাকার জন্য হস্তান্তর করিবেন না। করিলে সমূহ ক্ষতিগ্রস্ত হইবেন। মঙ্গল চান তো বায়না ফেরত দিন।

—ইতি

শুভাকাঙ্ক্ষী জনৈক ব্যক্তি

ব্যাবসাক্ষেত্রে ঐ শেঠ জাতটার একাধিপত্য থাকলেও এবং লোকগুলো প্রচণ্ড ধনী হলেও চিরদিন বিনয়ের ওদের প্রতি কেমন যেন একটা বিদ্বেষই ছিল। তাছাড়া অর্থই যে সর্বতোভাবে জীবনের একমাত্র মানদণ্ড নয়, স্বপ্নবিলাসী বিনয় সেটা বিশ্বাস করতো।

বিক্রয়ের ব্যাপারে যখন রতনলালের সঙ্গে বামদেবের দরকষাকষি চলছিল তখনই সে বলেছিল, কিছু ভাববেন না মেসোমশাই ও বোকা শেঠের যখন একবার মাথায় রত্নমঞ্জিল প্রবেশ করেছে, শেষ পর্যন্ত দেখবেন ঐ পঞ্চান্ন হাজারেই বেট টোপ গিলবে। স্রেফ চুপ করে থাকুন না এবং কার্যক্ষেত্রে হলও তাই।

কিন্তু আজ বামদেব-প্রদত্ত চিঠিটা পড়ে ওর পূর্বের সমস্ত চিন্তাধারা যেন ওলটপালট হয়ে গেল। রত্নমঞ্জিল ক্রয়ের ব্যাপারে রাণার জিদ ও শেষ পর্যন্ত পঞ্চান্ন হাজার স্বীকৃতি সব কিছুর মূলে যেন এখন ওর মনে হচ্ছে কোথায় একটা রহস্য লুকিয়ে আছে।

বিনয়কে নিঃশব্দে চুপ করে বসে থাকতে দেখে বামদেব প্রশ্ন করেন, কি মনে হচ্ছে এখন বিনয়? চিঠিটার মানে কিছু বুঝতে পারলে?

না। তবে চিঠির মানে যাই হোক না কেন, আপাতত সামনের মাসের পনের তারিখে বাড়ি রেজিষ্ট্রি করা হবে না এটা ঠিক।

কিন্তু জান তো বায়না নেওয়া হয়ে গিয়েছে।

তা হোক, তবু যে ভাবেই হোক আমাদের কিছুদিন **সময় নিতেই হবে, যদি একান্তই** বায়নার টাকা ফেরত না দেওয়া যায়—

কি তুমি বলতে চাও বিনয় খুলে বল!

এই চিঠির নিশ্চয়ই কোন অর্থ আছে—

অর্থ! বিস্মিত বামদেব বিনয়ের মুখের দিকে তাকালেন।

হ্যাঁ। অবশ্য এখুনি চট্ করে আপনাকে সঠিক কিছু আমি **বলতে পারছি না, দুটো দিন** ভাবতে দিন।

আচ্ছা একটা কাজ করলে কেমন হয়?

বলুন!

তুমি হয়ত জান না, এ বাড়িতে গত দু-মাস ধরে চোরের **উপদ্রবের ব্যাপারে** আমার বন্ধু কিরীটী রায়কে পরশু রাত্রে আমি ডেকে এনেছিলাম—

সত্যি!

হ্যাঁ।

তিনি কি বললেন? ব্যগ্র কৌতূহল উৎকণ্ঠা বিনয়ের চোখেমুখে।

সঠিক কিছুই বলেনি, তবে যা বললে—তার ধারণা হচ্ছে হীরকখচিত সোনার আমাদের পূর্বপুরুষের সেই কঙ্কন, রত্নমঞ্জিল ও এখানে চোরের উপদ্রব গত কিছুদিন ধরে—সব কিছুর মধ্যে কোথায় যেন একটা যোগাযোগ আছে।

বিনয় এবার বলে, মেসোমশাই, আপনার কথা শুনে আমারও কেমন যেন মনে হচ্ছে, আপনার বাড়িতে কিছুদিন ধরে যে চোরের উপদ্রব হচ্ছে সেটা সামান্য তুচ্ছ একটা ব্যাপার নয়। এর পিছনে কোন একটা গভীর উদ্দেশ্য আছে। আমারও মনে হচ্ছে কিরীটীবাবুর ধারণা হয়ত মিথ্যে নয়।

বামদেব বিনয়ের কথাগুলো শুনে এবাবে যেন সত্যিই একটু চিন্তিত হয়।

বিনয় আবার বলে এবং মনে হচ্ছে সব কিছুর মূলে সত্যিই ঐ রত্নমঞ্জিলই আর তাই ঐ শেঠজীর ঐ ভাঙা রত্নমঞ্জিলের ব্যাপারে এত আগ্রহ—এত উৎসাহ!

তোমার কথা কিছুই আমি বুঝতে পারছি না। যদিও কষ্টকল্প তা হলেও চোরের উপদ্রব ও কঙ্কনের সঙ্গে একটা যোগাযোগ থাকলেও থাকতে পারে, কিন্তু তার সঙ্গে রত্নমঞ্জিলের যে কি সম্পর্ক থাকতে পারে সেটাই বুঝতে পারছি না!

ঠিক যে কি সম্পর্ক তা হয়ত এখনো বোঝা যাচ্ছে না বটে, কিন্তু এটা কি একবারও ভেবে দেখেছেন, কেনই বা শেঠজীর বহরমপুরের ঐ পুরাতন বাড়িটা সম্পর্কে এত আগ্রহ? খাগড়ার বাসনের ফ্যাক্টরী করবে। একটু অস্বাভাবিক নয় কি? তাছাড়া শেঠজী ঐ বাড়িটার খোঁজ পেলেই বা কি করে? এবং, ফ্যাক্টরীই যদি করবার ইচ্ছা ওর বহরমপুরে, একমাত্র ঐ রত্নমঞ্জিল ছাড়া কি আর কোন বাড়ি বা জায়গা নেই ঐ তল্লাটে? সবচাইতে বড় কথা, কেউ অত টাকা ঢালে ঐ পুরাতন একটা বাড়ির জন্য? শেষ পর্যন্ত আর একটা ব্যাপার ঐ সঙ্গে ভেবে দেখুন, বায়না নেওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই এ বাড়িতে চোরের উপদ্রব শুরু হয়েছে—

এমনও তো হতে পারে, সব কিছুই একটা যোগসূত্রহীন আকস্মিক ব্যাপার!

হতে যে পারে না তা বলছি না মেসোমশাই, তবে ঐ সঙ্গে এও তো ভাবা উচিত, নাও হতে পারে। ব্যাপারগুলো যা পর পর ঘটেছে, কোনটাই তার আকস্মিক বা উদ্দেশ্যহীন নয়। না মেশোমশাই, কিরীটী রায়ের সঙ্গে পরামর্শ করে ঠিকই করছেন। ভাল কথা, এ চিঠির কথা তাঁকে জানিয়েছেন?

না। কাল সন্ধ্যার ডাকে অফিসের ঠিকানায় এই চিঠিটা পেয়েছি মাত্র। তারপর হঠাৎ থেমে কতকটা চিন্তান্বিত ভাবেই বললেন, না সত্যিই তুমি যে আমায় ভাবিয়ে তুললে বিনয়।

দাসীর হাতে ট্রেতে করে চায়ের সরঞ্জাম নিয়ে সুজাতা ঐ সময় কক্ষমধ্যে এসে প্রবেশ করল।

সামনের ত্রিপয়ের ট্রে-টা নামিয়ে রেখে কাপে কাপে চা ঢালতে ঢালতে ঘাড় ফিরিয়ে বামদেবের দিকে তির্যক দৃষ্টিতে চেয়ে আব্দারের সুরে সুজাতা বলে, অফিস থেকে ফিরে এসেই কি ফুসুর-ফুসুর গুজুর-গুজুর লাগিয়েছ বাবা।

তাই তো মা, বিনয় যে আমাকে বড় চিন্তায় ফেলে দিল—

বাঁকা দৃষ্টিতে একবার বিনয়ের দিকে তাকিয়ে সুজাতা জবাব দেয়, কে কি আবোল-তাবোল বাজে বকল, তাই নিয়ে মিথ্যে কেন মাথা ঘামাচ্ছ বাবা! তার চাইতে ওপরে চল, রেডিওতে আজ খুব ভাল রবীন্দ্র-সঙ্গীত আছে!

এমন সময় ভৃত্য এসে সংবাদ দিল বাইরে একজন **বাবু এসেছেন** দেখা করতে।

এ সময় আবার কে এল!

ভৃত্য বললে, নাম বললে পিয়ারীলাল—

রাণার দূত! বিনয়, আমার মনে হচ্ছে লোকটা—

আপনি যান নীচে। দেখুন আবার কি সে বলে। কিন্তু কোন কথা দেবেন না। তারপর চলুন, আজই একবার কিরীটীবাবুর সঙ্গে গিয়ে দেখা করি।

কোনমতে গরম গরম চা-টা গলাধঃকরণ করেই উঠে পড়লেন বামদেব। গায়ের ওপরে শালটা চাপিয়ে বললেন, তাহলে তুমি একটু অপেক্ষা কর। দেখি আমি হঠাৎ এ অসময়ে আবার রাণার দূত কেন! তারপর একসঙ্গেই না হয় বের হওয়া যাবে!

॥ সাত ॥

একটু যেন চঞ্চল পদেই বামদেব ঘর হতে বের হয়ে গেলেন।

সুজাতা বিনয়ের ব্যবহারে একটু যেন বিস্মিতই হয়েছিল। ক্ষণপূর্বে ও বিনয়কে খোঁচা দিয়েই কথা বলেছে এবং ইতিপূর্বে কোনদিনই বিনয় খোঁচা খেয়ে খোঁচা নির্বিবাদে হজম করেনি, বিশেষ করে সুজাতার কাছ থেকে খোঁচা খেলে বরং দ্বিগুণ উৎসাহে দ্বিগুণ চোখা বক্রোক্তিই সে ফিরিয়ে দিয়েছে।

বিনয় বুঝতে পারে কৌতূহলে সুজাতা ফেটে পড়বার উপক্রম, তথাপি সে নির্বিকারভাবে শিস্ দিয়ে যায়। বেশীক্ষণ কিন্তু বিনয় নির্বিকার থাকতে পারে না। সামনে উপবিষ্ট মেয়েটিকে এবারে শান্ত করা দরকার!

ইঃ মেয়ের মুখখানা দেখ না—বেজায় চটেছে।

হঠাৎ এমন সময় অন্যমনস্কভাবে পকেটে হাত যেতেই বিনয়ের একটা কথা মনে পড়ে যায় এবং সঙ্গে সঙ্গে ওষ্ঠপ্রান্তে বিচিত্র হাসি দেখা যায়।

বিনয়-সুজাতার মধ্যে লৌকিক চক্ষে যত গরমিলই থাক, পরস্পরের মধ্যে যে পরস্পরের একটা সত্যিকারের গাঢ় প্রীতির সম্পর্ক আছে অন্য কেউ না জানলেও পরস্পরের নিকট সেটা অবিদিত নেই।

তৃতীয় কেউ না জানলেও পরস্পর পরস্পরকে মধ্যে মধ্যে দু-চার ছত্রের এক-আধখানা দেয়। অবশ্য সে চিঠিতে কোন সম্বোধন বা চিঠির নীচে ইতির শেষে কোন নাম বা পরিচয়-সংজ্ঞা না থাকলেও, চিঠি যে যখন পায় এবং যে যখন চিঠি লেখে তারা উভয়েই বুঝতে পারে এবং জানেও কার চিঠি এবং কে কাকে লিখেছে। এবং ঐ ভাবে গোপনে চিঠি লেখালেখির ব্যাপারটা দুজনের মধ্যে একটা বিচিত্র আকর্ষণের সূত্র হয়ে দাঁড়িয়েছিল এবং অমনি একখানা চিঠি মাত্র দিন দুই আগে বিনয় পেয়েছে এবং পকেটে হাত যেতে সেই চিঠিটাই হাতে ঠেকতে ওর ওষ্ঠপ্রান্তে বিচিত্র হাসি দেখা দিয়েছিল।

উৎসাহে এতক্ষণে বিনয় সোজা হয়ে উঠে বসে। এবং নিজের সঙ্গেই যেন নিজে কথা বলছে এইভাবে বলে ওঠে, তাই তো, সেই মেয়েটির একখানা চিঠি তো পরশু পেয়েছি! জবাব দেওয়া তো এখনো হয়নি। নাঃ, কি ছাই যে ভোলা মন হয়েছে আমার! মেয়েটি এত করে চিঠি লিখলে, অথচ একটা উত্তরও দেওয়া হল না!

কথা বলতে বলতে চিঠিখানা বের করে বেশ একটু উচ্চকণ্ঠেই এবারে বিনয় পড়তে শুরু করে।

সবুজ রংয়ের একটা চিঠির কাগজ। চিঠিটা পকেট থেকে বের করতেই মৃদু মিষ্টি একটা বিলাতী ল্যাভেণ্ডারের গন্ধ পাওয়া যায়। পড়তে গিয়ে কিন্তু বিনয়ের মাথার মধ্যে একটা দুষ্টুমি চাড়া দিয়ে ওঠে। সঙ্গে সঙ্গে সম্পূর্ণভাবে নিজের মন থেকে কল্পনায় বানিয়ে বানিয়ে ঈষৎ উচ্চকণ্ঠে পড়তে শুরু করে ঃ

ওগো, তোমার নীরবতা যে আর আমি সহ্য করতে পারছি না! তুমি কি নিষ্ঠুর—হৃদয় বলে কি তোমার কোন পদার্থই নেই! আমার এ রক্তাক্ত হৃদয় তোমার পদতলে লুণ্ঠিত করে—

এই পর্যন্ত বিনয় বলেছে, হঠাৎ মুখ ভেংচে সুজাতা বলে ওঠে বিকৃত কণ্ঠে, এঃ, রক্তাক্ত হৃদয় তোমার পদতলে—মিথ্যুক কোথাকার! বয়ে গিয়েছে লুণ্ঠিত হতে কারো হাতীর মতো গোদা পায়ে!

হো হো করে বিনয় গলা ছেড়ে এবার হেসে ওঠে।

আরো রেগে যায় সুজাতা বিনয়ের হাসিতে, কোন মেয়ের তো খেয়েদেয় কাজ নেই, ঐ হোঁৎকা নাকেশ্বরের গোদা পায়ে লুণ্ঠিত হতে যাবে!

কিন্তু যদি এমন কোন মেয়ে থাকে—

কক্‌খনো না। থাকতেই পারে না।

কিন্তু শ্রীমতী কালোজিরে বোধ হয় সম্যক জ্ঞাত নন যে, বিগত যুগে মুনিঋষিরাও বলে গিয়েছেন যে নারী-মন বিচিত্র! নচেৎ যে মেয়েটি আমার প্রেমে গদ্‌গদ হয়ে এই পত্রবাণ নিক্ষেপ করেছেন—

বয়ে গিয়েছে নাকানন্দ নাকেশ্বরের প্রেমে গদ্‌গদ হতে!

আহা রে! সত্যি বলছি কালিন্দী, ক্যামেরাটা এসময় সঙ্গে নেই, নচেৎ ঐ মুখ-চন্দ্রিমার এই অবিস্মরণীয় মুহূর্তের একখানি ছবি তুলে নিতে পারলে—হায় হায়, কি ভয়ঙ্কর অপূরণীয় ক্ষতি! হায় পৃথিবীর মনুষ্যগণ, তোমরা কি হারাইলে তোমরা জান না! বাইবেলের ভাষার বঙ্গানুবাদে বলতে ইচ্ছা করছে, ঈশ্বর তোমাদের প্রেম দিতে চাহিয়াছিলেন—

খিলখিল করে এবারে সমস্ত কষ্টকল্পিত গাম্ভীর্য ও বিরাগের মুখোশটা খুলে ফেলে দিয়ে উচ্ছ্বাসিত হাসির উচ্ছ্বাসে গড়িয়ে পড়ে সুজাতা।

অভিমানের গুমোটটা কেটে যায়।

সুজাতার সঙ্গে হাসিতে যোগ দেয় বিনয়ও। বিনয় জানত, বাইবেলের ঐ ধরনের অদ্ভুত বঙ্গানুবাদ সুজাতাকে কি ভাবে হাসায় —তাই বরাবরই কপট মান-অভিমানের কলহের শেষে ঐ ব্রহ্মাস্ত্র প্রয়োগেই সুজাতার সঙ্গে সন্ধি করত। আজও শেষ পর্যন্ত তাকে সেই আশ্রয়ই গ্রহণ করতে হল।

হসির মধ্যে দিয়েই ভাব হয়ে গেল।

সুজাতা অতঃপর প্রশ্ন করে, বাবার সঙ্গে কি আলোচনা হচ্ছিল?

সেই চিরাচরিত সহজাত নারীমনের কৌতূহল। বিনয় হাসতে থাকে।

না না, নাকু সত্যি বল না, কিসের চিঠি তোমাকে পড়তে বাবা দিয়েছিলেন?

জনৈক শুভাকাঙ্ক্ষী ব্যক্তির—

তার মানে?

সত্যিই তাই। জনৈক শুভাকাঙ্ক্ষী ব্যক্তি মেসোমশাইকে সাবধান করে দিয়েছেন, রত্নমঞ্জিল যেন বিক্রি করা না হয়। অন্যথায় তাঁকে নাকি সমূহ ক্ষতিগ্রস্ত হতে হবে।

না, না—be serious!

এমন সময় সিঁড়িতে বামদেবের জুতোর শব্দ পাওয়া গেল।

বামদেব আসছেন।

দুজনেই ঠিক হয়ে গুছিয়ে সরে বসে। বামদেব ঘরে এসে ঢুকলেন। মুখে তাঁর চিন্তার রেখা সুস্পষ্ট।

সোফার উপরে বসতে বসতে বামদেব বললেন, বোধ হয় তোমার কথাই ঠিক, বিনয়। পিয়ারীলাল কেন এসেছিল জান!

কেন?

পঞ্চান্ন হাজারের উপরে রাণা আরো কিছু বেশী দিতে প্রস্তুত এবং আরো দশহাজার অগ্রিম দিতে চায়। এবং বললে, সামনের মাসের পনের তারিখের আগে বিক্রয়-কোবলাটা রেজেস্ট্রী হয় তাদের ইচ্ছা—

আপিন কি বললেন?—

আমার হাতে অনেক কাজ বর্তমানে—সেটা সম্ভব নয় তাই বলে দিলাম। কাল-পরশুর মধ্যে একবার রাণার অফিসে যেতে বলে গেল।

কি বললেন আপনি? যাবেন নাকি?

তাই ভাবছি।

কিন্তু আমার মনে হয় না যাওয়াই আপনার ভাল। সত্যি আমি যেন ব্যাপারটার মাথামুণ্ডু কিছুই বুঝতে পারছি না!

এদিকে আবার কি হয়েছে জান?

কি?

রাঘব সাহা যে আবার এইমাত্র ফোন করেছিল!

রাঘব সাহা—মানে ঐ অ্যাটর্নি?

হ্যাঁ।

সে আবার ফোন করেছিল কেন?

A new offer—

হ্যাঁ, কে এক নাকি আবার নতুন খরিদ্দার জুটেছে বাড়িটার—সে নাকি আরও কুড়ি হাজার বেশী দাম দিতে চায়।

বলেন কি!

তাই তো বললে সাহা।

হুঁ, আমার এখন কি মনে হচ্ছে জানেন মেসোমশাই!

কি?

এই রত্নমঞ্জিলের মধ্যেই কোন একটা রহস্য আছে—

তাই তোমার মনে হচ্ছে?

হ্যাঁ, নচেৎ একটা ভাঙা বাড়ি নিয়ে এমন টানা-হ্যাঁচড়া শুরু হত না। তা নতুন খরিদ্দারটি আবার কে এলেন, শুনলেন কিছু?

তার নামধাম তো কিছু বলল না, কেবল বললে টাকার কথা—

বলছিলাম কি, একবার চলুন না আপনার বন্ধু কিরীটী রায়ের ওখান থেকে ঘুরে আসা যাক এখুনি!

আগে একবার ফোন করে দেখ তাহলে উনি আছেন কিনা?

বামদেবের নির্দেশে বিনয় ফোন করবার জন্য ফোনের কাছে গিয়ে মাউথপিসটা তুলে নিল।

প্রায় মিনিট দশেক চেষ্টার পর কানেকশন পাওয়া গেল।

মিঃ রায় আছেন?

কথা বলছি, বলুন!

ধরুন, মিঃ অধিকারী আপনার সঙ্গে কথা বলবেন।

বামদেব এসে ফোনটা ধরলেন, কে কিরীটী নাকি?

হ্যাঁ, বল!

আমি বামদেব কথা বলছি—

ওপাশ হতে মৃদু হাস্যধ্বনির সঙ্গে সঙ্গে প্রশ্ন এলো, কি ব্যাপার রত্নমঞ্জিলের আবার কোন নতুন offer এসেছে বুঝি অন্য কারো কাছ থেকে?

আশ্চর্য! ঠিক তাই, কিন্তু তুমি জানলে কি করে?

অনুমান! কিন্তু তোমার কাছে রাণার লোক যায়নি?

আশ্চর্য, তাও তো এসেছিল! তার চাইতেও একটা আশ্চর্য ব্যাপার হচ্ছে গতকাল একটা চিঠি পেয়েছি—

চিঠি! কার?

কোন নাম-স্বাক্ষর নেই, লেখা আছে জনৈক শুভাকাঙ্ক্ষী ব্যক্তি—

চিঠিতে কি লেখা আছে?

বাড়ি বিক্রি করতে নিষেধ করেছে। বিক্রি করলে নাকি ক্ষতিগ্রস্ত হব!

আমি জানতাম, জানতাম—I smelt it—অস্পষ্ট আত্মগতভাবেই যেন শেষের কথাগুলো উচ্চারণ করে কিরীটী।

অ্যাঁ, কি বললে!

দেখ, আমাদের একবার বহরমপুরে অবিলম্বে যাওয়া প্রয়োজন—

বহরমপুর?

হ্যাঁ। কালই চল, রওনা হওয়া যাক।

কিন্তু—

না, এর মধ্যে আর কোন কিন্তু নেই। প্রস্তুত থেকো—কালই।

বেশ।

তাহলে স্টেশনেই আমাদের দেখা হবে।

*　　*　　*

কালই বহরমপুর যাচ্ছি বিনয়—

আমিও আপনাদের সঙ্গে যাব মেসোমশাই।

তুমি! কিন্তু। তোমার অফিস?

ছুটি পাওনা আছে, ছুটি নিয়ে নেব।

সুজাতা বলে, তাহলে আমিও কিন্তু যাব বাবা তোমাদের সঙ্গে—

তুই! তুই কোথায় যাবি?

ঐ তো বললাম, বহরমপুর তোমাদের সঙ্গে—

দেখি তোর মাকে তাহলে গিয়ে বলি। বামদেব ভিতরে চলে গেলেন।

উঁহু, পথে নারী বিবর্জিতা—বিনয় বলে।

মুখ ভেংচে প্রত্যুত্তর দেয় সুজাতা, কি আমার নর রে! নাকেশ্বর, নাকানন্দ, **নাকসর্বস্ব!**

তবু কালোজিরে যাচ্ছেন না—

যাচ্ছি—যাব!

উঁহু।

যাবই।

নৈব নৈব চ।

হুঁ, if নাকু goes—I go!

তবে বল বিয়ে করবে আমায়?

নৈব নৈব চ। এ জীবনে নয়।

বহরমপুর যাওয়ার সময় সুজাতাও ওদের সঙ্গী হল।

কন্যার প্রতি দুর্বলতায় বামদেবের শেষ পর্যন্ত ইচ্ছা না থাকলেও মুখে না করতে পারলেন না। এবং যাবার সময় বিনয় মুখখানা গম্ভীর করে থাকলেও মনে মনে খুশি হল, মেয়েটা শেষ পর্যন্ত তার জিদ বজায় রেখেছে দেখে ও মেশোমশাই বামদেবেও কন্যার প্রতি দুর্বলতার খাতিরে সুজাতাকে সঙ্গে নিলেন দেখে।

যাহোক নির্বিবাদেই সকলে বহরমপুরে এসে পৌঁছল।

সারাটা দিন সুজাতা পুরাতন রত্নমঞ্জিলের সর্বত্র হৈচৈ করেই বেড়াল।

কলকাতার বদ্ধ জীবনের পর বহরমপুরের খোলা মুক্তির মধ্যে সুজাতা যেন নিজেকে নতুন করে আবিষ্কার করে এবং না হোক দশ-বারো বার বামদেবকে বললে, এই বাড়ি তুমি কেন বিক্রি করবে বাবা! এ-বাড়ি তুমি কিছুতেই বিক্রি করতে পারবে না।

কিন্তু বায়না যে নেওয়া হয়ে গিয়েছে মা—

তাতে কি, ফেরত দিয়ে দাও! বায়না নিয়েছ তো কি এমন মহাভারত অশুদ্ধ হয়ে গিয়েছে! বলবে ভেবেছিলাম বিক্রি করব কিন্তু ভেবে দেখলাম বিক্রি করতে পারছি না, ব্যাস!

বামদেব হাসলেন, পাগলী!

বারন্দায় একটা ইজিচেয়ারের উপর বসে বামদেব ও তাঁর মেয়ে সুজাতা রত্নমঞ্জিল সম্পর্কে যখন কথাবার্তা বলছিল, বিনয় সেই সময় একা একা ঘুরে ঘুরে বাড়ির চারপাশ

PATHAGAR.NET

কি?

এই রত্নমঞ্জিলের মধ্যেই কোন একটা রহস্য আছে—

তাই তোমার মনে হচ্ছে?

হ্যাঁ, নচেৎ একটা ভাঙা বাড়ি নিয়ে এমন টানা-হ্যাঁচড়া শুরু হত না। তা নতুন খরিদ্দারটি আবার কে এলেন, শুনলেন কিছু?

তার নামধাম তো কিছু বলল না, কেবল বললে টাকার কথা—

বলছিলাম কি, একবার চলুন না আপনার বন্ধু কিরীটী রায়ের ওখান থেকে ঘুরে আসা যাক এখুনি!

আগে একবার ফোন করে দেখ তাহলে উনি আছেন কিনা?

বামদেবের নির্দেশে বিনয় ফোন করবার জন্য ফোনের কাছে গিয়ে মাউথপিসটা তুলে নিল।

প্রায় মিনিট দশেক চেষ্টার পর কানেকশন পাওয়া গেল।

মিঃ রায় আছেন?

কথা বলছি, বলুন!

ধরুন, মিঃ অধিকারী আপনার সঙ্গে কথা বলবেন।

বামদেব এসে ফোনটা ধরলেন, কে কিরীটী নাকি?

হ্যাঁ, বল!

আমি বামদেব কথা বলছি—

ওপাশ হতে মৃদু হাস্যধ্বনির সঙ্গে সঙ্গে প্রশ্ন এলো, কি ব্যাপার রত্নমঞ্জিলের আবার কোন নতুন offer এসেছে বুঝি অন্য কারো কাছ থেকে?

আশ্চর্য! ঠিক তাই, কিন্তু তুমি জানলে কি করে?

অনুমান! কিন্তু তোমার কাছে রাণার লোক যায়নি?

আশ্চর্য, তাও তো এসেছিল! তার চাইতেও একটা আশ্চর্য ব্যাপার হচ্ছে গতকাল একটা চিঠি পেয়েছি—

চিঠি! কার?

কোন নাম-স্বাক্ষর নেই, লেখা আছে জনৈক শুভাকাঙ্ক্ষী ব্যক্তি—

চিঠিতে কি লেখা আছে?

বাড়ি বিক্রি করতে নিষেধ করেছে। বিক্রি করলে নাকি ক্ষতিগ্রস্ত হব!

আমি জানতাম, জানতাম—I smelt it—অস্পষ্ট আত্মগতভাবেই যেন শেষের কথাগুলো উচ্চারণ করে কিরীটী।

অ্যাঁ, কি বললে!

দেখ, আমাদের একবার বহরমপুরে অবিলম্বে যাওয়া প্রয়োজন—

বহরমপুর?

হ্যাঁ। কালই চল, রওনা হওয়া যাক।

কিন্তু—

না, এর মধ্যে আর কোন কিন্তু নেই। প্রস্তুত থেকো—কালই।

বেশ।

তাহলে স্টেশনেই আমাদের দেখা হবে।

* * *

কালই বহরমপুর যাচ্ছি বিনয়—

আমিও আপনাদের সঙ্গে যাব মেসোমশাই।

তুমি! কিন্তু। তোমার অফিস?

ছুটি পাওনা আছে, ছুটি নিয়ে নেব।

সুজাতা বলে, তাহলে আমিও কিন্তু যাব বাবা তোমাদের সঙ্গে—

তুই! তুই কোথায় যাবি?

ঐ তো বললাম, বহরমপুর তোমাদের সঙ্গে—

দেখি তোর মাকে তাহলে গিয়ে বলি। বামদেব ভিতরে চলে গেলেন।

উঁহু, পথে নারী বিবর্জিতা—বিনয় বলে।

মুখ ভেংচে প্রত্যুত্তর দেয় সুজাতা, কি আমার নর রে! নাকেশ্বর, নাকানন্দ, **নাকসর্বস্ব!**

তবু কালোজিরে যাচ্ছেন না—

যাচ্ছি—যাব!

উঁহু।

যাবই।

নৈব নৈব চ।

হুঁ, if নাকু goes—I go!

তবে বল বিয়ে করবে আমায়?

নৈব নৈব চ। এ জীবনে নয়।

বহরমপুর যাওয়ার সময় সুজাতাও ওদের সঙ্গী হল।

কন্যার প্রতি দুর্বলতায় বামদেবের শেষ পর্যন্ত ইচ্ছা না থাকলেও মুখে না করতে পারলেন না। এবং যাবার সময় বিনয় মুখখানা গম্ভীর করে থাকলেও মনে মনে খুশি হল, মেয়েটা শেষ পর্যন্ত তার জিদ বজায় রেখেছে দেখে ও মেশোমশাই বামদেবেও কন্যার প্রতি দুর্বলতার খাতিরে সুজাতাকে সঙ্গে নিলেন দেখে।

যাহোক নির্বিবাদেই সকলে বহরমপুরে এসে পৌঁছল।

সারাটা দিন সুজাতা পুরাতন রত্নমঞ্জিলের সর্বত্র হৈচৈ করেই বেড়াল।

কলকাতার বদ্ধ জীবনের পর বহরমপুরের খোলা মুক্তির মধ্যে সুজাতা যেন নিজেকে নতুন করে আবিষ্কার করে এবং না হোক দশ-বারো বার বামদেবকে বললে, এই বাড়ি তুমি কেন বিক্রি করবে বাবা! এ-বাড়ি তুমি কিছুতেই বিক্রি করতে পারবে না।

কিন্তু বায়না যে নেওয়া হয়ে গিয়েছে মা—

তাতে কি, ফেরত দিয়ে দাও! বায়না নিয়েছ তো কি এমন মহাভারত অশুদ্ধ হয়ে গিয়েছে! বলবে ভেবেছিলাম বিক্রি করব কিন্তু ভেবে দেখলাম বিক্রি করতে পারছি না, ব্যাস!

বামদেব হাসলেন, পাগলী!

বারন্দায় একটা ইজিচেয়ারের উপর বসে বামদেব ও তাঁর মেয়ে সুজাতা রত্নমঞ্জিল সম্পর্কে যখন কথাবার্তা বলছিল, বিনয় সেই সময় একা একা ঘুরে ঘুরে বাড়ির চারপাশ

pathagar.net

দেখছিল।

কিছুদিন ধরে বাড়িটার বিক্রয়-ব্যাপার নিয়ে যে সব ঘটনাগুলো ঘটেছে, বিনয়কে সেটা বেশ খানিকটা উত্তেজিত করে তুলেছিল নিঃসন্দেহে এবং বহরমপুর পৌঁছে রত্নমঞ্জিলে পদার্পণ করবার পর থেকে কেমন যেন তার বার বার মনে হচ্ছিল, কোনক্রমেই এই রত্নমঞ্জিল বিক্রয় করা চলতে পারে না। টাকাই সব ক্ষেত্রে বড় কথা নয়, মানুষের সেন্টিমেন্টেরও একটা মূল্য আছে বৈকি।

পূর্ব ব্যবস্থামত ওদের সঙ্গে বহরমপুরে আসতে পারেনি কিরীটী। হঠাৎ শেষ মুহূর্তে বিশেষ একটা কাজে আটকা পড়ায় ওদের সঙ্গ নিতে পারেনি। তবে বলেছে দু-চারদিনের মধ্যেই আসছে।

এখানে আসবার পূর্বে বিনয় কিরীটীর সঙ্গে দেখা করেছিল সেই রাত্রেই। কিরীটী বলে দিয়েছে বিশেষ করে কয়েকটি কথা, তার মধ্যে প্রধান হচ্ছে—দিনে বা রাত্রে সর্বদা যেন তারা বিশেষ সাবধানে থাকে।

বিনয় শুধিয়েছিল, কেন বলুন তো? আপনি কি মনে করেন **আমাদের** আচম্‌কা কোন বিপদ-আপদ ঘটতে পারে সেখানে?

ঘটলে আশ্চর্য হবেন না বিনয়বাবু!

কিরীটীর সাবাধান-বাণী বিনয় তখন হেসেই উড়িয়ে দিয়েছিল।

কিন্তু এখানে পৌঁছাবার পর ও বাড়িটার চারপাশে ঘুরতে ঘুরতে **মনের মধ্যে তার ঠিক শঙ্কা** না হলেও কেমন একটা অসোয়াস্তি অনুভব করে যেন সে।

॥ আট ॥

পুরাতন নবাবী আমলের বাড়ি।

বাড়িটার গঠন-কৌশলের মধ্যেও সেই নবাব আমলের স্থাপত্যশিল্পের নিদর্শন পাওয়া যায় যেন। বহুদিনের সংস্কারের অভাবে বাড়িটা জীর্ণ হয়ে গেলেও, এর যা কাঠামো তাতে মনে হয় আরো ৬০-৭০ বৎসর অনায়াসেই এমনি দাঁড়িয়ে থাকবে। প্রায় চোদ্দ কাঠা জায়গার উপরে বাড়িটা। সামনে ও পিছনে যে জায়গা আছে তাও প্রায় বিঘাঘানেক তো হবেই। বাড়িটা দোতলা এবং সর্বসমেত তিনটি মহলে ভাগ করা যায়।

নবাব আমলে অধিকারী বংশ ধন, প্রতাপ, শৌর্য ও পদমর্যাদায় যখন জমজমাটি ছিল, এই রত্নমঞ্জিল হয়ত মানুষজনের কোলাহলে তখন গমগম করত।

এখানো রত্নমঞ্জিলের বহিরাংশে জীর্ণ জঙ্গলাকীর্ণ হাতীশালা, ঘোড়াশালা, নাটমন্দির, পাইক-পেয়াদাদের মহল একদা সেই অতীত শৌর্যেরই সাক্ষ্য দেয়।

বাইরের মহলেই ঘুরে বেড়াচ্ছিল বিনয়।

চারিদিকে জঙ্গল ও আগাছা। প্রকাণ্ড নাটমন্দিরটার প্রশস্ত চত্বরের চারিদিকে সুউচ্চ বড় বড় থাম, শীর্ষে শীর্ষে কারুকার্য। সুউচ্চ খিলানের মাথায় কবুতর বাসা বেঁধেছে, নির্বিবাদে বংশবৃদ্ধি করছে।

মধ্যাহ্নশেষের নিস্তব্ধ নির্জনতায় কবুতরের কুজন চলেছে। মেঝেতে ধরেছে দীর্ঘ সর্পিল ফাটল।

শীতের সূর্য প্রায় অস্তগমনোন্মুখ। শেষ আলোর ম্লান রশ্মি গম্বুজ-শীর্ষে-শীর্ষে অস্ত পরশটুকু বুলিয়ে যাচ্ছে।

নাটমন্দিরের পাশ দিয়ে একটু সরু পায়ে-চলা পথ, দু'পাশে আগাছা জন্মে পথটাকে প্রায় ঢেকে দেবার যোগাড় করেছে। সেই পথ ধরে বিনয় আরো পিছনে এগিয়ে যায়।

পথটা এসে শেষ হয়েছে একটা দিঘীর সামনে।

প্রশস্ত বাঁধানো রানা। কিন্তু তাতেও ফাটল ধরেছে, জন্মেছে আগাছা।

অতীতের ধ্বংসে জীর্ণ অবশেষ। ক্লান্ত বিনয় দিঘীর ভগ্ন রানার উপরেই বসে পড়ল।

দিঘীর চারপাশে অজস্র গাছপালা হুমড়ি খেয়ে যেন দিঘীর বুকের ওপরে পড়েছে, দিঘীর কালো জলে তারই ছায়া স্তূপ বেঁধে আছে।

দিঘীর নোংরা জল দেখলেই বোঝা যায় বহুদিন এদিকে মানুষের হাতের স্পর্শ পড়েনি অবহেলিত পরিত্যক্ত।

সর্বত্র যেন অযত্ন ও অবহেলা।

অন্যমনস্কভাবে বিনয় কতক্ষণ ভগ্ন রানার উপরে বসে ছিল মনে নেই, হঠাৎ একটা অস্পষ্ট খস খস শব্দে চমকে পাশে তাকাল।

রানার ওপরে বিনয় যেখানে বসে ছিল তার প্রায় হাত দশেক তফাতে দিঘীর ঢালু পাড় ও ঘন জঙ্গলের সামনে প্রদোষের ম্লান আলোয় দাঁড়িয়ে দীর্ঘকায় এক পুরুষ।

মাথায় ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া চুল, মুখভর্তি দাড়ি—পরিধানে ধুতি, গায়ে একটা ধূসর রঙের চাদর।

বড় বড় দুটো চোখের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি বিনয়ের প্রতি স্থিরনিবদ্ধ। চক্ষু তো নয়, যেন অন্তর্ভেদীদুটো জ্বলন্ত পাথর।

লোকটার সঙ্গে চোখাচোখি হতেই চক্ষের পলকে লোকটা পিছনের ঘন জঙ্গলের মধ্যে মিলিয়ে গেল। একটা দুঃস্পপ্ন যেন মিলিয়ে গেল।

বিনয় প্রথমটায় আশ্চর্য হয়ে গিয়েছিল। ব্যাপারটা সত্যি না তার দেখবারও ভুল বুঝে উঠতে পারেনি। কিন্তু লোকটা পশ্চাতের ঘন জঙ্গলের মধ্যে চকিতে অন্তর্হিত হলেও তখনও সেখানকার গাছপালাগুলো দুলছিল।

গাছপালাগুলোর মধ্যে একটা আলোড়ন জাগিয়ে যে লোকটা অন্তর্হিত হয়েছে ক্ষণপূর্বে, দোদুল্যমান গাছপালাগুলোই তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। স্বপ্ন নয়, দেখারও ভুল নয়।

বিনয় একবার ভাবলে এগিয়ে গিয়ে জায়গাটা অনুসন্ধান করে দেখে কিন্তু ঠিক সাহস হলো না, কারণ চারিদিকে তখন সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনিয়ে এসেছে।

একাকী এই অচেনা জায়গায় ঐ রকম একটা লোককে অনুসরণ করাটা মনে হল ঠিক বিবেচনার কাজ হবে না। বরং কাল সকালে কোন এক সময় দিনের আলোয় এসে ঐ জায়গাটা ভাল করে অনুসন্ধান করে দেখা যেতে পারে। এখন ফিরে যাওয়াই সমীচীন হবে।

বিনয় যে পথে এসেছিল সেই পথেই ফিরে চলল।

কিন্তু চকিতে দেখা ক্ষণপূর্বের সেই দাঁড়িগোঁফ-ভরা মুখখানা কেবলই মনের মধ্যে এসে উঁকি দিতে লাগল বারংবার যেন।

কে লোকটা?

এই নির্জন জঙ্গলাকীর্ণ দিঘীর ধারে কে লোকটা।

বিনয়কে দেখে হঠাৎ অমন করে অদৃশ্য হলই বা কেন? বিনয়কে হয় সে লক্ষ্য করছিল আড়ালে থেকে, হঠাৎ চোখচোখি হয়ে গিয়েছে।

বিনয় পথ চলে কিন্তু তার মনের মধ্যে অহেতুক একটা অসোয়াস্তি তাকে যেন পীড়ন করতে থাকে।

মাঝের মহলের দোতলায় খান-দুই ঘর ওদের থাকবার জন্য পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করে নেওয়া হয়েছিল। এবং মাঝের মহলে যেতে হলে 'কেয়ারটেকার' মনোহরের এলাকা পার হয়ে যেতে হয়।

সিঁড়ির কাছেই মনোহরের সঙ্গে দেখা হয়ে গেল বিনয়ের। মনোহর গোটা দুই হ্যারিকেন জ্বেলে উপর উঠছিলে।

বিনয়কে দেখে মনোহর প্রশ্ন করে, এই যে দাদাবাবু! কোথায় ছিলেন এতক্ষণ? বড়বাবু আপনাকে খুঁজছিলেন!

বড়বাবু, দিদিমণি এঁরা সব কোথায় মনোহর?

উপরের দালানে বসে চা খাচ্ছেন।

বিনয় মনোহরের আগে-আগেই অন্ধকারে সিঁড়ি দিয়ে দোতলায় উঠে গেল।

প্রকাণ্ড টানা বারান্দার একাংশে ছোট একটি বেতের টেবিলের দু'পাশে বসে সুজাতা ও বামদেব চা পান করছিলেন।

পাশেই আর একটা চেয়ার বোধ হয় বিনয়ের জন্যই খালি পড়ে ছিল। টেবিলের পাশেই একটা স্ট্যাণ্ডের উপরে একটি প্রজ্বলিত টেবিলল্যাম্প। জায়গাটায় একটা অস্পষ্ট আলো-ছায়া।

বিনয়ের পদশব্দে বামদেব ও সুজাতা দুজনেই এককসঙ্গে ফিরে তাকায়।

এই যে বিনয়, সারাদিন কোথায় ছিলে?

বিনয় খালি চেয়ারটার ওপরে গা ঢেলে দিয়ে বসতে বসতে বললে, আপনার রত্নমঞ্জিল সারভে করছিলাম মেসোমশাই।

সুজাতা কোন কথা না বলে ততক্ষণে বিনয়ের জন্য চায়ের কাপে চা ঢেলে চামচটা দিয়ে চিনি ও দুধ মেশাচ্ছিল। সে কেবল আড়চোখে বিনয়ের মুখের দিকে তাকাল।

বামদেব চায়ের কাপে চুমুক দিতে দিতে বললেন, এখানকার বনজঙ্গলে শুনছি নানা বিষধর সাপ আছে বিনয়। একটু সাবধানে চলাফেরা করো। বরং একা একা না ঘোরাফেরা করে মানোহরকে সঙ্গে নিও। এখানকার সব কিছু ও জানে।

মনোহর দু'হাতে দুটো জ্বলন্ত লণ্ঠন নিয়ে ততক্ষণে উপরে উঠে এসেছে।

বামদেবের কথাগুলো তার কানেও প্রবেশ করেছিল। সে বললে, হ্যাঁ দাদাবাবু, এখানে সাপের ভারি উপদ্রব।

বিনয় তৈরী চায়ের কাপটা হাত বাড়িয়ে তুলে নিয়ে গরম চায়ে একটা চুমুক দিয়ে আরামসূচক একটা শব্দ করে বললে, সাপের ভয় থাকুক আর যাই থাকুক মেসোমশাই— আপনার রত্নমঞ্জিলের উপরে কিন্তু ভারি একটা মায়া পড়ে গিয়েছে আমার।

বামদেব হাসতে হাসতে বললেন, কেন হে, এই পুরনো ভাঙা বাড়ির মধ্যে এমন কি পেলে?

আছে মেসোমশই আছে, আমার মন বলছে আছে, নচেৎ—

বল কি বলছিলে!

নচেৎ ঐ ঝানু গুজরাটী ব্যবসাদার এই ভাঙা বাড়িটা কিনবার জন্য অমন করে হন্যে হয়ে আপনার পেছনে ছুটে বেড়াত না।

কি জানি বাবা, আমার তো মনে হচ্ছে মিথ্যে এ-বাড়িটা নিয়ে একটা সোরগোল করা হচ্ছে। জবাব দেন বামদেব।

বেশ তাই যদি হবে, তাহলে ঐ চিঠিটারই বা কি অর্থ বলুন আর আপনার কলকাতার বাড়িতে অমন চোরের উপদ্রবই বা কেন ইদানীং হচ্ছিল?

বামদেব বললেন, চোরের উপদ্রবের চাইতেও ঐ চিঠিটাই গণ্ডগোলের সৃষ্টি করছে বেশী।

কিন্তু গণ্ডগোল কি কেবল ঐ বেনামা চিঠিটাই সৃষ্টি করেছে মেসোমশাই, আপনার পূর্বপুরুষের সেই সোনার কঙ্কন!

তুমি কি সত্যিই মনে কর বিনয়, এই রতত্নমঞ্জিলের সঙ্গে ঐ সোনার কঙ্কনের কোন যোগাযোগ আছে?

বিনয় এবারে হাসতে হাসতে জবাব দেয়, আমি কেন কিরীটীবাবুও তো সেই রকম সন্দেহ করছেন!

সুজাতা এবারে আলোচনার মাঝখানে বাধা দিল, কি হয়েছে তোমাদের বাবা বল তো? কেবল রত্নমঞ্জিল আর সুবর্ণ কঙ্কন! ঐ কথা ছাড়া কি তোমাদের আর কথা নেই?

বিনয় বুঝতে পারে সুজাতা চটেছে। তা চটবারই তো কথা। এখানে এসে পৌঁছনো অবধি সে রত্নমঞ্জিল নিয়েই ব্যস্ত সারাক্ষণ।

দুপুরে খাওয়াদাওয়ার পর যখন বের হচ্ছিল সুজাতা সামনে এসে দাঁড়িয়েছিল, কোথায় যাচ্ছ বিনয়, বলেছিল সুজাতা।

যেখানেই যাই না কেন, কালোজিরে যাচ্ছে না!

নাকুর সঙ্গে যাচ্ছে কে! যেতে হয় একা যাব।

তাই যেও।

যাবই তো। একশবার যাব। মুখ ঘুরিয়ে বলেছিল সুজাতা।

একা একা মজাসে সব জায়গায় ঘুরে বেড়াব, কোথাও কালোজিরেকে সঙ্গে নেবো না। বলেই বিনয় এগিয়ে যায়।—চললুম।

বিনয় বুঝতে পারে সেই দ্বিপ্রহরের জের এখন ফের শুরু হবে।

টেবিলের একপাশে ঐদিনকার সংবাদপত্রটা ছিল, সেটা হাতে করে বামদেব ঘরে চলে গেলেন।

বিনয় আর সুজাতা বসে রইল।

অন্য সময় হলে বিনয় এই সুযোগে সুজাতার অভিমান ভাঙাবার জন্য তৎপর হত, কিন্তু আজ তার মন ঐ মুহূর্তে অন্য চিন্তায় আচ্ছন্ন ছিল।

সে ভাবছিল দিঘীর ধারে ঘনায়মান বিকেলে আবছায়ায় দেখা সেই অদ্ভুত দাড়িগোঁফওলা লোকটার কথাই। লোকটা কে? হঠাৎ তার সঙ্গে চোখাচোখি হওয়ায় অমন করে পালিয়েই বা গেল কেন?

pathagar.net

ছট্টুলাল বহরমপুরে পরের দিনই এসে পৌঁছয়। যে কাজের ভার নিয়ে সে বহরমপুরে এসেছে সে-সব কাজে চিরদিনই সে পোক্ত। কারণ গত দশ বছর ধরে ঐ ধরনের কাজের দ্বারাই সে জীবিকানির্বাহ করে আসছে।

প্রথম একটা দিন ছট্টুলাল রত্নমঞ্জিলের আশেপাশে ঘুরে ঘুরে বেড়াল। কিন্তু বাইরে থেকে রত্নমঞ্জিল সম্পর্কে কোন ধারণা করা সম্ভবপর হল না তার পক্ষে।

চট্ করে রত্নমঞ্জিলের মধ্যে ঢুকতেও সাহস হয় না।

দূর থেকে রত্নমঞ্জিলের 'কেয়ারটেকার' মনোহরের ষণ্ডাগুণ্ডা চেহারা দেখেই বুঝতে পারে, লোকটা বিশেষ সুবিধের হবে না।

ছট্টুলাল তার আস্তানা নিয়েছিল স্টেশনের কাছে একটা হোটেল।

দ্বিতীয় দিন সন্ধ্যার দিকে ঘুরতে ঘুরতে ছট্টুলাল রত্নমঞ্জিলের পশ্চাৎদিকে গিয়ে হাজির হল।

অন্ধকারে বাড়িটা একটাকালো ছায়ার স্তূপ যেন।

আচম্‌কা কাঁধের ওপরে কার মৃদু স্পর্শ পেয়ে চমকে ফিরে তাকাল ছট্টু।

আবছা আলোছায়ায় দীর্ঘকায় একটা মূর্তি ঠিক তার পশ্চাতে দাঁড়িয়ে।

লোকটার মুখভর্তি দাড়িগোঁফ।

কে তুই, এখানে কি চাস? গম্ভীর চাপাকণ্ঠে লোকটা প্রশ্ন করে।

লোকটার আচম্‌কা আবির্ভাবে প্রথমে ছট্টু একটু হকচকিয়েই গিয়েছিল, কিন্তু মুহূর্তেই নিজেকে সে সামলে নেয়।

রুক্ষকণ্ঠে প্রতিবাদ জানায়, তোর তাতে দরকার? তুই কে শুনি?

সহসা লোকটা তার ডান হাতের লৌহকঠিন বাঁকানো শীর্ণ আঙুলগুলো দিয়ে ছট্টুর কাঁধটা একটু টিপে দিতেই নিজের অজ্ঞাতেই ছট্টু একটা যন্ত্রণা-কাতর শব্দ করে ওঠে এবং সঙ্গে সঙ্গে বুঝতে আর তার বাকি থাকে না লোকটা দেহে প্রচুর শক্তি রাখে।

সোজা কথায় জবাব না দিস তো গলা টিপে শেষ করে দেবো।

এবার আর ছট্টু প্রতিবাদ জানাবার চেষ্টা করে না।

শক্ত ঠাঁই। এখানে চালাকি চলবে না বুঝতে পেরেছিল সে।

বল্ কাল থেকে এখানে কি মতলবে ঘোরাফেরা করছিস?

কি আবার মতলব! এমনিই দেখছিলাম বাড়িটা।

এমনি দেখছিলে চাঁদু! বেটা চালাকি করবার জয়গা পাওনি?

সত্যি বলছি দোস্ত—

এই থাম্। দোস্ত! চোদ্দ পুরুষের দোস্ত আমার—খিঁচিয়ে ওঠে লোকটা।

শীর্ণ লোহার মত বাঁকানো ডান হাতের আঙুলগুলো দিয়ে লোকটা ছট্টুর ডান হাতের কব্জিটা চেপে ধরে, চল্ আমার সঙ্গে। সত্যি কথা বলবি তো ছেড়ে দেব—নইলে ছাড়ছি না।

টানতে টানতে অন্ধকারে বনজঙ্গলের মধ্যে দিয়ে লোকটা ছট্টুকে নিয়ে চলে। এতটুকু প্রতিবাদ করবারও সাহস পায় না ছট্টু! আট-দশ মিনিট প্রায় অন্ধকারে বনজঙ্গলের মধ্যে দিয়ে টানতে টানতে একটা ঘরের বদ্ধ দরজার সামনে এসে থামল।

দাঁড়া, পালাবার চেষ্টা করেছিস কি মরবি!

ঘরের দরজায় তালা দেওয়া ছিল। লোকটা কোমর থেকে চাবি বের করে দরজার তালাটা খুললে।

ছট্টু এদিক-ওদিক তাকাচ্ছে তখন।

ঘন অন্ধকার বনজঙ্গল, বিশেষ করে অপরিচিত জায়গা, ছুটে পালাবারও উপায় নেই।

ডান হাতের কব্জিটা ব্যথায় টনটন করছে। ঘরের এক কোণে একটা প্রদীপ জ্বলছে। লোকটা এবারে ফিরে দাঁড়িয়ে বললে, ভিতরে আয়।

অজগরের চোখের সামনে বন্য জন্তুর যে অবস্থা হয়, ছট্টুরও সেই অবস্থা। সুড়সুড় করে একান্ত বাধ্যের মত এক পা এক পা করে ছট্টু ঘরের মধ্যে গিয়ে ঢুকল।

বোস্।

॥ নয় ॥

সুজাতা ও বিনয় বসেছিল।

সামান্য ব্যবধান দুজনের মধ্যে। দুজনের মধ্যখানে মাত্র ছোট একটা বেতের টেবিল। টেবিলের ওপরে কাচের টিপটটার মধ্যে হয়ত খানিকটা ঠাণ্ডা চায়ের তলানি ও ভিজে নিংড়ানো কতকগুলো চায়ের পাতা। গোটাতিনেক চায়ের তলানি সমেত চায়ের কাপ। স্ট্যাণ্ডের ওপরে জ্বলছে ছোট টেবিলল্যাম্পটা।

রাগ করেছে সুজাতা। নিশ্চয়ই রাগ করেছে, যদিও সেই রাগের সঙ্গে মিশে আছে একটা উগ্র অভিমান। রাগ আর অভিমানের মেশামেশিতে মুখখানা একটু গম্ভীরই মনে হচ্ছে সুজাতার। ঠোঁটের কোণে বিনয়ের বঙ্কিম একটা চাপা হাসির নিঃশব্দ প্রকাশ।

রাগ আর অভিমান যাই হোক, বিনয় জানে সুজাতা এখন চট্ করে উঠে যাবে না।

মান ভাঙিয়ে কথা বলবার একটা অবকাশ দিচ্ছে সুজাতা বিনয়কে।

সত্যিই তো, সুজাতা যে ওদের সঙ্গে বহরমপুর এসেছে সে তো ওরই সঙ্গ-আকর্ষণে। বিনয়ের সান্নিধ্যকে একটু ঘনিষ্ঠ, আরো একটু নিবিড় করে পেতেই। নয় কি! সেই বিনয়ই যদি তাকে অবহেলা জানায়, রাগ-অভিমান হয় বৈকি। না, সুজাতার দোষ নেই।

বিনয় এবারে আপন মনেই সুস্পষ্টভাবে হাসল, তবে নিঃশব্দেই।

তারপর শ্রীমতী কোকিললাঞ্ছিতা!

কিন্তু নতুন নামকরণেও সুজাতা ফিরে তাকায় না। যেমন নিঃশব্দে বসে ছিল বসে রইল।

শ্রীমতী কৃষ্ণা—শোন শ্রীমতী কালোজিরে, রাগ করে যদি কথাই না বলো তো আজ দুপুরে যা সব অত্যাশ্চর্য ঘটনা ঘটেছে কিছুই শোনা হবে না কিন্তু!

কে শুনতে চায়! গোড়া কেটে আগায় জল না ঢাললেও চলবে।

তা চলবে না বটে, তবে ঐ যে বললাম অত্যাশ্চর্য ঘটনা শোনা হবে না!

এবার ঘুরে মুখোমুখি বসল সুজাতা। বোঝা গেল মুখে না বললেও মনে মনে সুজাতা বিনয়ের কথা শোনার জন্য উদ্‌গ্রীব ও কৌতূহলী হয়ে উঠেছে।

কি, বলব না বলব না।

কে বারণ করেছে বলতে!

শুনব বলেও তো কেউ সাড়া দিচ্ছে না!

ভণিতা না করে বলে ফেললেই তো হয়। কালা তো নই যে শুনতে পাব না।

তা নয় বটে, তবে কানের সঙ্গে মনের একটা যোগাযোগ আছে কিনা। কথাগুলো বলে একান্ত নিস্পৃহভাবে বিনয় সিগারেট-কেস থেকে একটা সিগারেট বের করে সেটায় অগ্নিসংযোগ করতে তৎপর হয়ে উঠে। বিনয় আবার হাসে।

এবারে সুজাতাই তাগাদা দেয়, কই বললে না কি বলবে বলছিলে!

বিনয় আর বিলম্ব না করে দ্বিপ্রহরের তার সমস্ত অভিযান-কাহিনী যতটা সম্ভব সংক্ষেপে বর্ণনা করে যায়। কোন কিছুই বাদ দেয় না।

লোকটা কে বলে তোমার মনে হয়! সুজাতা প্রশ্ন করে।

সেই থেকে তো সেই শ্মশ্রুগুম্ফমণ্ডিত মুখখানার কথাই ভাবছি। কে হতে পারেন তিনি! বুঝতে পারছি না এখনো।

বাবাকে বললে না তো কিছু?

না, বলিনি। ব্যাপারটা আগে ভাল করে খোঁজ না নিয়ে জানাজানি বা হৈচৈ করতে চাই না।

তোমার কোন কিছু সন্দেহ হয় নাকি?

নিঃসন্দেহই বা একেবারে হতে পারছি কই।

আচ্ছা কোন পাগল-টাগল নয় তো?

পাগল-টাগল হতে বাধা তো নেই, তবে অমন জায়গায় ঐ সময় হঠাৎই বা কেন অমনধারা এক পাগলের আবির্ভাব হল! আর হলই যদি, অমন করে হঠাৎ আমার সঙ্গে চোখাচোখি হতেই শ্রীমান পাগল নিজেকে অপসৃত করলেন কেন ভীতচকিত ভাবে?

তাই তো! তা হলে?

দাঁড়াও, ব্যস্ত হলে চলবে না। এটা রত্নমঞ্জিল—নবাবী আমলের ব্যাপার সব!

তার মানে? তুমি কি বলতে চাও বিনয়?

বলতে তো অনেক কিছুই চাই, তবে বলতে পারছি কই! সবই যে কেমন এলোমেলো হয়ে যাচ্ছে! সন্দেহ ও মিস্ট্রি যে ক্রমেই ঘনীভূত হয়ে উঠছে।

তুমি কি তাহলে বলতে চাও বিনয়, এ-বাড়ির সঙ্গে ঐ লোকটার কোন যোগাযোগ আছে?

আছে কিনা সত্যি জানি না, তবে থাকলে আশ্চর্য হব না! গোড়া থেকে এ বাড়ির সমস্ত ব্যাপারগুলো একবার ভেবে দেখ তো কালিন্দী। সেই সুবর্ণকঙ্কন, তোমাদের বাড়িতে চোরের উপর্যুপরি উপদ্রব। কঙ্কনের পূর্ব-ইতিহাস। তারপর এ-বাড়ি কেনবার জন্য রানার আবির্ভাব ও এ-বাড়ি ক্রয়ের ব্যাপারে তার জেদাজেদি। ওরই মধ্যে আর এক ক্রেতার আবির্ভাব। টাকার অঙ্কও বাড়ে। সবশেষ সেই উড়ো চিঠি। টুকরো টুকরো ঘটনাগুলোকে যদি একসূত্রে গাঁথি তবে কোথায় আমরা পৌঁছই ভাব তো একবার!

সত্যি, আজ কিন্তু সমস্ত ঘটনাগুলো খাপছাড়া যোগসূত্রহীন বলে সুজাতার মনে হয় না।

কিন্তু কি রহস্য থাকতে পারে এ সব কিছুর মধ্যে? সুজাতা প্রশ্ন করল!

আমিও তো সেটাই ভাবছি কালী। কিন্তু কিছুই এ পর্যন্ত ধরতে পারছি না। অথচ এ-বাড়ির ব্যাপারে ক্রমেই যেন বেশ একটা উত্তেজনা বোধ করছি। অবশ্য একটা ব্যাপারে আমি স্থিরনিশ্চিত হয়েছি—

কি?

রত্নমঞ্জিল বিক্রি করা হবে না—লক্ষ টাকার বিনিময়েও না। মেসোমশাইকে এই রত্নমঞ্জিল বিক্রি করতে কিছুতেই আমি দেব না। শেষের দিকে বিনয়ের কণ্ঠে অদ্ভুত একটা দৃঢ়তা স্পষ্ট হয়ে ওঠে যেন। সুজাতা বিনয়ের মুখের দিকে তাকাল। ল্যাম্পের আলোয় মুখখানা যেন কি এক চাপা উত্তেজনায় থমথম করছে, চোখের তারা দুটোয় একটা স্থির প্রতিজ্ঞার দীপ্তি ঝকঝক করছে যেন।

মুহূর্তের জন্য বোধ হয় বিনয় চুপ করেছিল, হঠাৎ কিসের একটা স্পষ্ট শব্দে চকিতে পিছন ফিরে অন্ধকার সিঁড়ির দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে প্রশ্ন করে, কে—কে ওখানে?

সিঁড়ির মুখে স্তূপীকৃত অন্ধকারের মধ্যে একটা অস্পষ্ট ছায়া যেন নড়ে ওঠে।

বিনয় ততক্ষণে উঠে দাঁড়িয়েছে।—কে ওখানে? বলতে বলতে এগিয়ে যায় বিনয়। সুজাতাও উঠে দাঁড়ায় কৌতূহলে, উত্তেজনায়।

আজ্ঞে আমি মনোহর দাদাবাবু—দ্বিধাজড়িত স্খলিত কণ্ঠে অন্ধকার হতে জবাবটা এল।

কে, মনোহর! অন্ধকারে ওখানে দাঁড়িয়ে কি করছ?

আজ্ঞে—

এদিকে এস।

বিনয়ের ডাকে মনোহর পায়ে পায়ে ওদের সামনে এসে দাঁড়াল।

কি করছিলে ওখানে অন্ধকারে দাঁড়িয়ে মনোহর? বিনয়ের মনের মধ্যে সন্দেহ থাকলেও কিন্তু কণ্ঠস্বরে সেটা প্রকাশ পায় না।

আজ্ঞে নীচে ছিলাম, যেন আপনারা ডাকছেন শুনে উপরে আসছিলাম—

কোনমতে ঢোক গিলে একটা জবাবদিহি দেবার চেষ্টা করে যেন মনোহর। বিনয়ের ওর কথাগুলো শুনে ও বলবার ভঙ্গি দেখে তাই-ই মনে হয়।

বিনয় মনোহরের কথা শুনতে শুনতে তার মুখের দিকে তাকিয়ে দেখছিল। কিন্তু মনোহরের মুখটা যেন পাথরে খোদাই করা। কোনরূপ বৈলক্ষণ্যই তাতে যেন নেই। বোকা-বোকা নিরীহ সরলতা যেন সমস্ত মুখখানা ব্যেপে রয়েছে। চোখের তারায়ও অনুৎসাহিত সরল দৃষ্টি।

কিন্তু আমরা তো কেউ তোমাকে ডাকিনি মনোহর!

আজ্ঞে আমার যেন মনে হল, উপরে থেকে আপনারা আমায় ডাকলেন—

না ডাকিনি, তুমি নীচে যাও।

মনোহর আর দ্বিতীয় বাক্যব্যয় না করে নিঃশব্দে নীচের সিঁড়ির দিকে অগ্রসর হল।

ক্রমে মনোহরের পদশব্দ সিঁড়িতে অন্ধকারে হারিয়ে গেল।

নির্বাক বিস্ময়ে সুজাতা এতক্ষণ সমস্ত ব্যাপারটা শুনছিল।

মনোহরের কৈফিয়ত শুনে সুজাতা স্পষ্টই বুঝেছিল মনোহর মিথ্যা বলছে, কারণ চারদিকে একটা স্তব্ধতা, তার মধ্যে তারা কেউ ডাকলে স্পষ্টই শোনা যেত। তাছাড়া উপরের ডাক নীচে পৌঁছনোর কথা নয়। তাই মনে হল তার, বিনয়ের কথার জবাবে সম্পূর্ণ সে মিথ্যা বানিয়ে একটা জবাব দিয়ে গেল। সুজাতা বললে দেখ আমার যেন মনে হচ্ছে, লোকটা আমাদের কথা শোনার জন্যই উপরে এসেছিল, ধরা পড়ে গিয়েছে।

বুঝতে পেরেছি বৈকি সেটা। বিনয় বলে।

বললে না কেন মুখের ওপরে লোকটাকে?

উহুঁ। এতে করে একপক্ষে আমাদের ভালই হল। এক ঢিলে দুই পাখি মারা হল।

মানে?

যদি সত্যিই লোকটার মধ্যে সন্দেহের কিছু থাকে, তাহলে প্রথমতঃ মিথ্যা দিয়ে লোকটা জানিয়ে দিয়ে গেল সে কি চরিত্রের লোক! দ্বিতীয়তঃ ওকে যে অবিশ্বাস করলাম এটা ওকে না জানিয়ে বুঝিয়ে দিলাম ওকে আমরা সন্দেহ করিনি? তাতে করে যদি সত্যিই লোকটার মনে কোন দুরভিসন্ধি থাকে তো নিঃসন্দেহে ও ওর পথে এগিয়ে যাবে।

কিন্তু—

না, ভয় নেই সুজাতা, আমরা ওকে চিনলাম এবং ওর ওপরে নজরও রাখতে পারব এবার থেকে। যদি তেমন কিছু থাকে—

তাহলে এ ব্যাপারের পরেও ওকে এ বাড়িতে রাখা যুক্তিযুক্ত হবে কি! বাবাকে—

উহুঁ। চট্ করে ছাড়িয়ে কোন লাভ হবে তো নয়ই, বিবেচনার কাজও হবে না। আরো কিছুদিন ওর ওপরে লক্ষ্য রাখতে হবে। দেখতে হবে সত্যিই ওর মনে কোন দুরভিসন্ধি আছে কিনা। শুধু তাই নয়, বহুদিন ধরে এ-বাড়ির 'কেয়ারটেকার' হিসাবে এ ওখানে আছে, ওকে খুব বিবেচনার সঙ্গে নাড়াচাড়া করতে হবে।

কিন্তু তোমার এ যুক্তি মানতে পারছি না বিনয়!

ব্যস্ত হয়ো না। এতদিনের একটা বিশ্বাসী লোককে হঠাৎ সন্দেহ করে তাকে অবিশ্বাস করাটাই বরং যুক্তির ব্যাপার হবে না। তোমার বাবাকেও এ সম্পর্কে কিছু বলো না আপাতত।

দেখ একটা কথা বলি, লোকটাকে আমার কেন যেন প্রথম থেকেই ভাল লাগেনি—

বিনয় হেসে সান্ত্বনা দেয় ভয় নেই, আমি সতর্ক থাকব।

আহারাদির পর বিনয় নিজের নির্দিষ্ট ঘরে শয্যার ওপরে এসে যখন গা ঢেলে দিল, চিন্তার ঘূর্ণাবর্তটা মন থেকে সরে গেল না, অবিশ্রাম পাক খেয়ে খেয়ে ফিরতে লাগল চিন্তাটা।

অন্ধকার রাত্রি। চাঁদ উঠবে সেই রাতের শেষ প্রহরে। শিয়রের ধারে খোলা জানালাপথে এক টুকরো স্বপ্নের মতো রাতের কালো আকাশের একটা খণ্ডাংশ ও কয়েকটি অনুজ্জ্বল তারা চোখে পড়ে।

নীচের বাগানের অন্ধকারের স্রোত পার হয়ে একটানা একটা ঝিঁঝির শব্দ কানে আসছে। নিষুতি রাতের একতারা যেন বেজেই চলেছে ঝিঁ ঝিঁ রবে।

মনোহরের ব্যবহারটা বিনয়কে কেবল বিস্মিত করেনি ভাবিতও করে তুলেছে। সুজাতার সন্দেহ মিথ্যা নয়, সত্যিই মনোহর সিঁড়ির মাথায় অন্ধকারেও আত্মগোপন করে ওদের কথাবার্তা শোনবারই চেষ্টা করকছিল।

কিন্তু কেন?

এ-বাড়িতে অনেকদিনের লোক ঐ মনোহর। পাকানো বাঁশের মত পেটানো মজবুত শরীর। শরীরের কোথাও এতটুকু খুঁত নেই নির্ভেজাল। বলতে গেলে বাড়ির মালিকের অনুপস্থিতিতে মনোহরই দীর্ঘদিন ধরে হয়ে ছিল এ-বাড়ির সর্বেসর্বা। বামদেব কচিত

কালেভদ্রে এখানে এলেও এ-বাড়ি সম্পর্কে এতকাল তার কোনই আগ্রহ ছিল না। পিতৃপুরুষের নবাবী আমলের পুরাতান এই ভাঙা বাড়িটার ওপরে তার কোনরূপ আকর্ষণই ছিল না। এবং এ-বাড়ি এইভাবেই হয়ত পড়ে থাকত, যদি আচম্‌কা গুজরাটী ব্যবসাদার রানা এই বাড়ি কেনবার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করত।

কিন্তু হঠাৎ রানাই বা এ-বাড়িটা কেনবার জন্য এত আগ্রাহন্বিত হয়ে উঠল কেন?

খাগড়াই বাসনের ফ্যাক্টরি খুলবে স্রেফ একটা বাজে কথা। এ-বাড়ি কেনবার পিছনে আসল উদ্দেশ্য যে তার অন্য, সেটা বুঝতে বিনয়ের অন্তত কষ্ট হয়নি।

বাড়িটা সে কিনতে ইচ্ছুকই শুধু নয়, বিশেষভাবেই ইচ্ছুক। উদ্দেশ্যটাই বা কি?

বিশেষ একটা উদ্দেশ্য আছে নিশ্চয়ই। নচেৎ বাড়ির মূল্য বাবদ এই ভাঙা সেকেলে একটা বাড়ির পিছনে নিছক খেয়ালের বশে আজকালকার দিনে কেউই অতগুলো টাকা ঢালতে এগিয়ে আসবে না। বিশেষ করে রানার মত একজন ঝানু ব্যবসাদার। যারা প্রতি টাকার পিছনে অঙ্ক কষে লাভটা বুঝে চলে এবং শুধু রানাই নয়, আরো একজন খরিদ্দার এগিয়ে এসেছে বাড়িটার জন্য।

এতএব এর পশ্চাতে একটা যে রহস্য আছে সেটা বঝুতে কষ্ট হয় না।

সেদিন রাত্রে কিরীটীর সঙ্গে কথা বলেও সেই রকমই মনে হয়েছে বিনয়ের।

॥ দশ ॥

একটু তন্দ্রামতও যদি আসত! চোখের পাতা থেকে ঘুম যেন আজ একেবারে লোপ পেয়েছে!

সত্যি, আজ রাতে ঘুম আসবেই না নাকি! মাথার বালিশের তলায় হাত ঢুকিয়ে হাতঘড়িটা বের করে চোখের সামনে তুলে ধরল বিনয়।

অন্ধকারেও রেডিয়াম ডায়ালের সময়-সঙ্কেতের অক্ষরগুলো জোনাকির আলোর মত জ্বলজ্বল করছে।

আশ্চর্য, রাত দশটা বেজে দশ মিনিট মাত্র!

শয্যা হতে উঠে পড়ল বিনয়। চোখেমুখে একটু জল দিলে। যদি ঘুম আসে!

ঘরের কোণে মাটির সরাইয়ে ঠাণ্ডা জল ছিল, সেই জল হাতে ঢেলে বেশ করে চোখে মুখে ঘাড়ে ঝাপটা দিয়ে ভিজিয়ে দিল।

রাত্রি জাগরণের ক্লান্তি যেন অনেকটা প্রশমিত হয়।

এগিয়ে এসে একটা সিগারেট ধরিয়ে বিনয় শিয়রের ধারে খোলা জানালাটার সামনে দাঁড়ায়।

রাত্রির ঝিরঝিরে ঠাণ্ডা হাওয়া সিক্ত চোখেমুখে একটা স্নিগ্ধ পরশ দেয়।

নীচের বাগানে অন্ধকারে গাছপালাগুলো এখানে ওখানে খণ্ড খণ্ড ভাবে যেন স্তূপ বেঁধে আছে।

অন্ধকার যেন জায়গায় জায়গায় একটু বেশী ঘন হয়ে উঠেছে। একটু বেশী স্পষ্ট।

এই বাগান অতিক্রম করেই নাটমন্দির এবং তার পশ্চাতে সেই মজা দিঘিটা।

অন্যমনস্ক বিনয় সিগারেটটায় মৃদু টান দিচ্ছিল, সামনের অন্ধকার বাগানের দিকে তাকিয়ে

হঠাৎ তার দৃষ্টি আকর্ষিত হয়। অনেক দূরে গাঢ় অন্ধকারের বুকে হঠাৎ একটা রক্তচক্ষুর মত লাল আলো দেখা যাচ্ছে যেন। আলোটা মাটি থেকে হাত-চার-পাঁচ উপরেই হবে বলে মনে হচ্ছে। বিস্মত বিনয় একদৃষ্টে লাল আলোটার দিকে তাকিয়ে থাকে।

হঠাৎ তার মনে হল, আলোটা এদিক ওদিক দুলছে না! হ্যাঁ, তাই তো। দুলছেই বটে। জমাট-বাঁধা গাঢ় অন্ধকারের মধ্যে একটা রক্তপদ্ম যেন ঢেউয়ে ঢউয়ে এদিক-ওদিক দুলছে।

দু মিনিট সময় প্রায় লাল আলোটা শূন্যে অন্ধকারের মধ্যে এদিক-ওদিক দুলে দপ করে একসময় আবার নিভে গেল।

কয়েকটা মুহূর্ত বিনয় বোবা বিস্ময়ে জানালার সামনে দাঁড়িয়ে থাকে ইতিমধ্যে জ্বলন্ত সিগারেটটায় পুড়ে পুড়ে নিঃশেষিতপ্রায় হয়ে তর্জনী ও মধ্যমার বন্ধনীকে প্রায় স্পর্শ করে। তর্জনী ও মধ্যমায় একটা তাপ অনুভুত হয়।

হঠাৎ চমকে উঠে নিঃশেষিতপ্রায় দগ্ধ সিগারেটের শেষ জ্বলন্ত প্রান্তটুকু মাটিতে ফেলে দিয়ে পা দিয়ে মাড়িয়ে ঘষে নিভিয়ে দিল বিনয়।

দূরে হলেও লাল আলোটা নীচের বাগানের দক্ষিণ প্রান্ত থেকেই দেখা গিয়েছিল। দক্ষিণ প্রান্তে প্রাচীর। প্রায় একমানুষ সমান উঁচু প্রাচীর। আজই তো দ্বিপ্রহরে বিনয় ঘুরে ঘুরে দেখেছে ওখানে যাতায়াতের কোন পথ নেই।

শেষ সীমানায় প্রাচীর।

মন স্থির করে ফেলে বিনয় এবার আর কালক্ষেপ করে না।

বালিশের তলা থেকে পাঁচ-সেলের হান্টিং টর্চটা হাতে নিয়ে গায়ে একটা শার্ট চড়িয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে পড়ল বিনয়।

নিঃশব্দে সিঁড়ি দিয়ে নেমে নীচে চলে এল। নীচের সদর দরজাটা হাঁ হাঁ করছেখোলা, নজরে পড়ল তার। কোন কিছু ভাববার সময় আর নেই তখন। খোলা দরজাপথেই বের হয়ে গেল বিনয়। দ্রুতপায়ে ঘুরে বাড়ির পশ্চাতে বাগানে এল। অনুমানে যেদিকটা হতে অন্ধকারে লাল আলোটা ক্ষণপূর্বে দেখা গিয়েছিল সেই দিকেই অগ্রসর হল সন্তর্পণে।

বিশেষ সাবধানতার সঙ্গে মধ্যে মধ্যে হস্তধৃত টর্চের আলোর সাহায্যে এদিক-ওদিক খর অনুসন্ধানী দৃষ্টিতে দেখতে দেখতে এগিয়ে চলল বিনয়।

হঠাৎ মাটির আগাছার ওপরে একটা বস্তু ওর দৃষ্টিকে আকর্ষণ করে। একটি বর্মা চুরুটের জ্বলন্ত শেষাংশটুকু।

একটা সূক্ষ্ম ধোঁয়ার রেখা জ্বলন্ত চুরুটের প্রায়-ভস্মাবশেষ থেকে তখনও সর্পিল গতিতে এঁকেবেঁকে উপরের দিকে উঠছে এবং আশেপাশে দগ্ধ চুরুটের একটা উগ্র কটু গন্ধ বাতাসে ভেসে বেড়াচ্ছে তখনো।

তাহলে এখানে ক্ষণপূর্বে নিশ্চয়ই কেউ ছিল। ঐ জ্বলন্ত চুরুটের শেষাংশটুকুই তার অবিসংবাদিত প্রমান। কেউ ছিল এখানে এবং যে ছিল সে চুরুট-সেবনে অভ্যস্ত।

পোড়া চুরুটের জ্বলন্ত শেষাংশ মাটিতে ঘষে নিভিয়ে পকেটে ভরে নিয়ে বিনয় আবার এগিয়ে চলে। কিন্ত আর কিছুই চোখে পড়ে না।

অন্ধকারে ঘুরতে ঘুরতে অন্যমনা হয়ে অবশেষে বিনয় একসময় একটা জায়গায় এসে পড়ে যার আশেপাশে বেশ গভীর জঙ্গল। খেয়াল হতে আর পথ চিনে উঠতে পারে না বিনয়। সর্বনাশ! এ কোথায় ঘুরতে ঘুরতে এসে পড়ল সে? যেদিকে পা বাড়াতে যায় আগাছা

ও কাঁটাঝোপে বাধা পড়ে এগুতে পারে না। এত ঘন কাঁটাজঙ্গল যে তার মধ্যে দিয়ে পথ করে নেওয়াই দুঃসাধ্য। বুনো লতায় পা জড়িয়ে জড়িয়ে ধরেছে ক্লেদাক্ত সরীসৃপের মত।

বিনয় যেন গলদঘর্ম হয়ে ওঠে। এ কি ফ্যাসাদেই পড়ল সে!

এ কি গোলকধাঁধা? কোথায় নির্গমনের পথ? মাথা তুলে চারিদিকে তাকিয়ে রত্নমঞ্জিলেরও হদিস পায় না। ঘন আগাছা ও বুনো গাছপালায় দৃষ্টি ব্যাহত হয়।

হঠাৎ একটা সুমিষ্ট মেয়েলী হাসির খিলখিল শব্দে চমকে ওঠে। হাসির রেশটা অন্ধকারের বুকে একটা শব্দতরঙ্গ তুলে গেল যেন।

বিস্মিত হতচকিত বিনয় এদিক-ওদিক তাকায় অন্ধকার। কে? কে হাসলে অমন করে? কে?

আবার সেই মিষ্টি খিলখিল হাসির তরঙ্গ বয়ে গেল।

কে—কে হাসছ? চিৎকার করে বলে বিনয় যেন মরীয়া হয়ে, কিন্তু চিৎকার করলেও শব্দটা যেন গলা দিয়ে স্পষ্টভাবে উচ্চারিত হয় না।

প্রত্যুত্তরে আবার সেই হাসি শোনা যায়।

কে? কে?

আমি। মেয়েলী কণ্ঠে প্রত্যুত্তর এল এবারে।

তুমি কে?

আমি রাত্রি।

রাত্রি!

হ্যাঁ, পথ হারিয়ে ফেলেছেন তো?

বিনয়ের মনে হয় যেন খুব কাছ থেকেই কণ্ঠস্বর ভেসে এল। এদিক-ওদিক তাকিয়েও কিন্তু বিনয় কাউকে দেখতে পেলে না।

কোথায় তুমি?

কাছেই আছি। পথ হারিয়ে ফেলেছেন তো! থাকুন এখন বাকি রাতটুকু, পথ খুঁজে পাবেন না। মাথা খুঁড়ে মরলেও না।—কৌতুকে যেন উচ্ছ্বসিত কণ্ঠ।

পথ খুঁজে পাব না!

না। পথ জানলে তো পথ খুঁজে পাবেন। শুধু জঙ্গলই নয়, এটা হচ্ছে মা মনসার স্থান। ভীষণ সাপ ওই জায়গাটায়।

সাপ!

হ্যাঁ। আর বেশীক্ষণ পথ খুঁজতে হবে না, ওরা এলো বলে।

কারা?

কালসাপ সব। মা-মনসার চেলারা!

তুমিও তো আছ!

আমাকে ওরা চেনে, আমায় ছোবল দেবে না।

বিনয় অতঃপর কিছুক্ষণ চুপ করে থাকে। মেয়েটির কণ্ঠস্বরও আর শোনা যায় না।

একসময় বিনয়ই আবার প্রশ্ন করে, আছ না চলে গেলে?

যাইনি, আছি। কিন্তু কেন বলুন তো? জবাব এল।

আমাকে একটু পথটা দেখিয়ে দাও না!

pathagar.net

বা রে আব্দার! আমি পথ দেখাতে যাব কেন?

পথটা খুঁজে পাচ্ছি না যে—

উঁহু। দেবো না।

দেবে না?

না ঠিক আছে, একটা শর্তে পথ দেখিয়ে দিতে পারি—

কি শর্তে?

রত্নমঞ্জিল ছেড়ে চলে যাবে বল! কথা দাও, তাহলেই পথ দেখিয়েদেবো! রাজী আছ আমার ঐ শর্তে?

না।

তবে থাকো। ভাবছ দিনের বেলায় পথ খুঁজে পাবে! তা হচ্ছে না, তার আগেই তোমার মৃতদেহ রাণীদিঘির পাঁকের তলায় পুঁতে ফেলবে।

কে—কে পুঁতে ফেলবে?

কেন, দুর্বাসা মুনি!

দুর্বাসা মুনি? সে আবার কে?

এসে যখন ঘাড় টিপে ধরবে তখনই জানতে পারবে দুর্বসা মুনি কে! তার চাইতে যাও না কলকাতায় ফিরে। কেন মিথ্যে প্রাণ দেবে!

প্রাণের ভয় আমি করি না।

প্রাণের ভয় করো না!

না!

আবার কিছুক্ষণ স্তব্ধতা। কোন পক্ষেরই কোন সাড়া নেই। হঠাৎ আবার মেয়েটির কণ্ঠস্বর শোনা গেল, এবারে একেবারে পাশে, এস, আমার হাত ধর।

আশ্চর্য!

চকিত কণ্ঠস্বর শুনে বিনয় ফিরে তাকিয়েছে। সামানেই অন্ধকারে গুণ্ঠনবতী এক নারীমূর্তি। প্রসারিত হাত।

হাত ধর! গুণ্ঠনবতী নারী আবার আহ্বান জানাল।

সে যেন হঠাৎ মাটি ফুঁড়ে উঠেছে একটা চকিত বিস্ময়ের মত।

চল আর দেরি করো না, টের পেলে বিপদে পড়বে।

মন্ত্রমুগ্ধের মত বিনয় হাতটি তার বাড়িয়ে দিল। একটি কোমল হাত তার মণিবন্ধ চেপে ধরল। স্পর্শ তো নয়, একটা পুলক-কোমল শিহরণ! রহস্যময়ী পথ-প্রদর্শিকার এই পথ যে অত্যন্ত সুপরিচিত, চলতে চলতে বিনয় খুব ভাল ভাবেই সেটা বুঝতে পারছিল।

ফণীমনসা ও কাঁটাঝোপের মধ্যে দিয়ে অন্যথায় এই অন্ধকারে অক্লেশে সহজ গতিতে ঐভাবে কারো পক্ষেই এগিয়ে যাওয়া সম্ভব নয়।

নিঃশব্দেই দুজনে অন্ধকারে কাঁটাঝোপের মধ্যে দিয়ে এগিয়ে চলছিল। এবং ঠিক ঐ মুহূর্তটিতে বিনয়ের সমস্ত মন জুড়ে একটিমাত্র স্পর্শের অনুভূতিই তার সমগ্র চেতনাকে যেন একটি মিষ্টি-স্নিগ্ধ সৌরভের মতই আমোদিত করে রেখেছিল, যে কোমল পেলব মণিবন্ধটি সে পরম বিশ্বাসে ও আশ্বাসে নিবিড় করে ধরেছিল তারই স্পর্শটুকু।

মিনিট-পাঁচ-সাত ঐভাবে চলবার পর হঠাৎ পথ-প্রদর্শিকা বলে উঠল, উঃ, হাতটা যে

গেল আমার! কি শক্ত হাতের মুঠো আপনার!

লজ্জায় তাড়াতাড়ি বিনয় তার মুষ্টি ছেড়ে দিল। সত্যি, আমি দুঃখিত।

আচ্ছা এবার আমি বিদায় নোব। ঐ যে দেখুন সামনে রত্নমঞ্জিল। এবারে নিশ্চয়ই চিনে যেতে পারবেন!

বিনয় তাকিয়ে দেখল, এ সেই জায়গা উদ্যানের মধ্যে আজ রাত্রে যেখানে দোতলায় নিজের শোবার ঘরের জানালা থেকে সেই লাল আলোর নিশানা চোখে পড়েছিল। হ্যাঁ, এবারে সে চিনে রত্নমঞ্জিলে যেতে পারবে। পথ হারাবার ভয় নেই একটু এগিয়ে গেলেই সেই নাটমন্দির। তারপর তো সব তার চেনাই।

হ্যাঁ, পারব। ধনবাদ আপনাকে—কথাটা বিনয়ের শেষ হল না, বিস্ময়ে তখন সে এদিকে-ওদিকে তাকাচ্ছে।

আশেপাশে তার কোথাও সেই ক্ষণপূর্বের রহস্যময়ী পথ-প্রদর্শিকা নেই। যাদুর মতই অন্ধকারে কোথায় মিলিয়ে গিয়েছে। তথাপি বৃথাই এদিক-ওদিক দু-চার পা অগ্রসর হয়ে অনুসন্ধিৎসু কণ্ঠে ডাকতে লাগল, কোথায় গেলেন? শুনছেন? কোথায় গেলেন?

কারো কোন সাড়া নেই। অকস্মাৎ সে স্বপ্নের মতই যেন মিলিয়ে গেল অন্ধকারে। কেবল হাতের পাতায় ক্ষণপূর্বের সেই কোমল স্পর্শানুভূতিটুকু লেগে আছে অবশিষ্ট তখনো।

এদিকে রাতও প্রায় শেষ হয়ে এল।

রাত্রিশেষের হাওয়ায় কেমন একটা আলতো ঠাণ্ডা-ঠাণ্ডা ভাব। আকাশের তারাগুলোও যেন সারাটা রাত জেগে থেকে এখন ঝিমিয়ে এসেছে। তাদের চোখেও বুঝি ঘুম লেগেছে।

বিনয় এক পা এক পা করে এগিয়ে চলল। সদর দরজাটা হাঁ-হাঁ করছে খোলা।

নীচের এই সদর দরজাটা তো বন্ধ থাকার কথা। খোলা আছে কেন?

এখন মনে পড়লো, যাবার সময়ও দরজাটা এমনিই খোলা ছিল। দরজাটা বন্ধ করতে যাবে বিনয়, বাইরে কার মৃদু পদশব্দ পাওয়া গেল। থমকে দাঁড়াল সে?

মনোহর।

এত রাত্রে মনোহর বাড়ির বাইরে কোথায় গিয়েছিল?

মনোহর! ডাকে বিনয়।

মনোহরও বোধ হয় বিনয়কে দরজার গোড়ায় দেখবে প্রত্যাশা করেনি ঐ সময়। বিনয়কে দরজার সামনে দেখে মনোহরও থমকে দাঁড়িয়েছিল।

দাদাবাবু আপনি!

হ্যাঁ, কিন্তু তুমি! তুমি এত রাত্রে কোথায় গিয়েছিলে মনোহর?

মনোহর তখন তার গায়ের চাদরের নীচে একটা কি যেন লুকোতে ব্যস্ত।

বিনয়ের সে ব্যাপারটা নজর এড়ায় না।

আজ্ঞে, এই একটু বাইরে গিয়েছিলাম।

কখন গিয়েছিলে?

এই তো কিছুক্ষণ আগে।

কিছুক্ষণ আগে মানে ঘণ্টা দু-তিন আগে বল?

আজ্ঞে না। এই তো মিনিট দশেক হবে।

কিন্তু এভাবে রাত্রে সদর খুলে রেখে গিয়েছিলে, যদি চোর-টোর ঢুকত!

মনোহর হেসে ফেলে, চোর এখানে আসবে কোথা থেকে বাবু! মনোহর দাশের লাঠিকে ভয় করে না এ তল্লাটে এমন কেউ নেই বাবু।

বিনয় বুঝতে পারে, আর কথা বাড়িয়ে লাভ নেই। দোতলার সিঁড়ির দিকে পা বাড়াল। সিঁড়ি অতিক্রম করে নিজের নির্দিষ্ট কক্ষে এসে প্রবেশ করল। হাতঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখল, রাত প্রায় পৌনে-পাঁচটা। আর ঘুমোবার চেষ্টা করেও কোন লাভ নেই। একটা সিগারেটে অগ্নিসংযোগ করে বিনয় খোলা জানালাটার সামনে এসে দাঁড়াল।

শেষরাতের হাওয়া ঝিরঝির করে একটা স্নিগ্ধ পরশ দিচ্ছে। বার বার মনের মধ্যে এসে উদয় হচ্ছে ক্ষণপূর্বের সেই রহস্যময়ী কৌতুকপ্রিয় পথ-প্রদর্শিকার কথাই—কণ্ঠস্বরে ও সামান্য কিছুক্ষণের মৃদু কোমল একটি স্পর্শের মধ্যে দিয়ে যে তার অপূর্ব একটি ক্ষণ-পরিচয় মাত্র রেখে গিয়েছে।

সমগ্র ব্যাপারটা যেন এখনো বিশ্বাস করতে মন চাইছে না। ঐ জঙ্গলের মধ্যে কোথা থেকে এলো ঐ মেয়েটি! আর সে জানলেই বা কি করে যে, বিনয় কাঁটাঝোপের মধ্যে পথ হারিয়ে ফেলেছিল! তবে কি আগে হতেই মেয়েটি তাকে অলক্ষ্যে থেকে অনুসরণ করছিল!

ওই জঙ্গলের মধ্যে সব কিছুই যেন মনে হলো মেয়েটির সবিশেষ পরিচিত।

মেয়েটি বলেছিল দুর্বাসা মুনির কথা। কে সে দুর্বসা মুণি! মেয়েটি তাকেও ভয় করে। কিই বা সম্পর্ক দুর্বাসার সঙ্গে মেয়েটির!

সিগারেটটা শেষ হয়ে এসেছিল প্রায়। নিঃশেষিত-প্রায় সিগারেটটি জানলাপথে নীচে ফেলে দিয়ে বিনয় শয্যার উপরে এসে গা এলিয়ে দিল।

॥ এগার ॥

অজগরের চোখের সম্মোহনে যেমন শিকার সামনের দিকে পায়ে পায়ে এগিয়ে আসে, ঠিক তেমনি করেই ছট্টুলাল এগিয়ে গিয়ে মাটিতেই বসে পড়লো।

হাত বাড়িয়ে লোকটা ঘরের কোণে প্রজ্বলিত প্রদীপের শিখাটা একটু উস্‌কে দিল।

আলোর তাতে করে বিশেষ উনিশ-বিশ হল বলে মনে হয় না, তবে প্রদীপের সেই আলোয় এবার ছট্টুলাল যেন নিজের অজ্ঞাতেই লোকটার মুখের দিকে তাকাল। অনেকটা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে লোকটার চেহারা।

মুখভর্তি কাঁচা-পাকা দাড়িগোঁফ। বয়েস হলেও লোকটার শরীরের বাঁধুনি যেন এখনও অটুটই আছে। পরিধানে একটা লাল রংয়ের কাপড়। খালি গা। গলায় একটা রুদ্রাক্ষের মালা। দেহের সমস্ত পেশী এখনও সজাগ ও স্পষ্ট। লোকটা দৈর্ঘ্যে প্রায় ছ ফুটের কাছাকাছি হবে। চওড়া বক্ষপট। উন্নত সুদৃঢ় স্কন্ধ। কিন্তু চোখ দুটো হিংস্র জন্তুর মত যেন ঝকঝকে করে জ্বলছে দু খণ্ড জ্বলন্ত অঙ্গারের মত।

সে চোখের দিকে বেশীক্ষণ তাকিয়ে থাকা যায় না।

ছট্টুলাল দৃষ্টি ঘুরিয়ে ঘরের চারপাশে একবার তাকাল। ঘরের মধ্যে আসবাব বিশেষ কিছু নেই। এক কোণে একটা টিনের রং-ওঠা সুটকেস। একটা মলিন সতরঞ্চি জড়ানো বিছানা। একটা মাটির কুঁজো ও গোটা দুই অ্যালুমিনিয়ামের গ্লাস ও থালা।

হঠাৎ ছট্টুলাল পুনরায় লোকটার ভারী গলার প্রশ্নে চমকে উঠল, **তোর নাম কি?**

ছট্টুলাল যেন প্রশ্নটা শোনেনি এমনি ভাব দেখাবার চেষ্টা করল।

এই শুনছিস, তোর নাম কি?

আমার!

তোর নয় তো কি আমার?

আমার নাম গোবিন্দলাল।

মুহূর্তে হাত বাড়িয়ে বজ্রমুষ্টিতে ছট্টুলালের সামনেকার চুলের ঝুঁটি চেপে ধরে প্রবলভাবে দুটো ঝাঁকুনি দিল লোকটা।

সেই ঝাঁকুনির চোটে ছট্টুর মনে হল তার মাথাটাই বুঝি দেহ থেকে আলগা হয়ে এল। দু চোখের তারায় যেন একরাশ সর্ষের ফুল ঝিকমিক করে উঠল।

ধাপ্পা দেওয়ার আর জায়গা পাসনি বেটা! তোর নাম আমি জানতে পারব না ভেবেছিস!

আমার নাম তো গোবিন্দলালই। তবু পুনরাবৃত্তি করে ছট্টুলাল।

নাম তোর আমি ঠিক জেনে নেব। রত্নমঞ্জিলের চারপাশে ক'দিন ধরে ঘুরঘুর করছিস কেন বল্!

ঘুরঘুর তো আমি করিনি।

ফের মিথ্যে কথা! আর একটা ধমক দিয়ে ওঠে লোকটা।

মিথ্যে কথা বলব কেন?

মিথ্যে কথা বলবি কেন! হুঁ, তোর চেহারা দেখেই মালুম হচ্ছে তুই জীবনে কটা সত্যি বলেছিস! শোন, সত্যি কথা বলিস তো তোকে ছেড়ে দেব। আর যদি মিথ্যে ধাপ্পা দেবার চেষ্টা করিস, খুন করে তোকে রত্নমঞ্জিলের ঐ রাণীদিঘির পাঁকের তলে পুঁতে রাখব। বল্ এখনো সত্যি কথা!

ছট্টুলাল সত্যি এবারে রীতিমতই ভাবিত হয়ে ওঠে।

লোকটার চেহারা ও কথাবার্তাতেই মালুম হচ্ছে লোকটা মোটেই সুবিধার নয়।

মুখে যা বলছে কাজে করতেও হয়ত ওর বাধবে না। কিন্তু ছট্টুলালও জাত সাপ। যার কাজের ভার নিয়ে ছট্টুলাল এখানে এসেছে সেই রতনলাল রানাও খুব সহজ ব্যক্তি নয়।

তার সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করলে সেও ছেড়ে কথা বলবে না। বিশেষ করে তার অনুচর পিয়ারী একেবারে সাক্ষাৎ শয়তান বললেও অত্যুক্তি হবে না। পিয়ারীর অসাধ্য কিছুই নেই।

রতনলালের সামান্য ইঙ্গিতেই তার হাতের গুপ্ত ছোরা ঝিকমিকিয়ে উঠবে এবং নির্ভুলভাবেই ছট্টুর কলিজাটা ফাঁসিয়ে দেবে।

জলে বাঘ, ডাঙায় কুমীর।

তাছাড়া রতনলালকে এই জব্বর খবরটা দিতে পারলে মোটামত কিছু বকশিশও মিলত। তা সেও তো এখন সুদূরপরাহত। এই দুশমনটার হাত থেকে আপাততঃ কোন মুক্তির পথও ছট্টু ভেবেই পাচ্ছে না। চকিতে একটার পর একটা চিন্তাগুলো ছট্টুর মাথার মধ্যে খেলে যায়।

কিন্তু রতনলালের কথা পরে ভাবলেও চলবে, আপাততঃ এই দিকটা সামলতে হবে।

কিন্তু ছট্টুলাল ভেবে পাচ্ছে না, ঠিক্ কোন্ পথে এগুলে বর্তমানের এই সঙ্কটকে সে কাটিয়ে উঠতে পারে।

BanglaBook.org

শক্তির প্রথম পরিচয়েই ছট্টুলাল বুঝতে পেরেছে, গায়ের শক্তিতে এই লোকটার সঙ্গে ছট্টু পেরে উঠবে না।

কি রে, জবাব দিচ্ছিস না কেন?

ছট্টুলাল জবাব দেবে কি, তখনও ভাবছে। সে চুপ করেই থাকে। লোকটাও বুঝতে পারে সহজে ছট্টুর মুখ থেকে জবাব বের করা যাবে না।

সেও এতক্ষণে মনে মনে অন্য উপায়ই ভাবছিল। ঘরের কোণে একটা মোটা দড়ি পড়ে ছিল, উঠে গিয়ে সেই দড়িটা যেমন লোকটা আনতে যাবে ছট্টু দেখল এই সুযোগ, চক্ষের পলকে সে দাঁড়িয়ে উঠেই এক লাফে ঘরের বাইরে চলে এল এবং অন্ধকারে জঙ্গলের ভিতর দিয়ে ছুট দিল।

অন্ধকারে কাঁটাঝোপে শরীর ও হাত-পা ক্ষতবিক্ষত হয়ে যেতে লাগল ছট্টুর, কিছুতেই খেয়াল নেই। যেমন করে হোক পালাতে হবে। সে প্রাণ-পণে ছুটতে লাগল।

ঘরের মধ্যে সেই দাড়িগোঁফওয়ালা লোকটা কল্পনাও করতে পারেনি যে ছট্টু হঠাৎ উঠে পালাতে সাহস পাবে।

ছট্টু হঠাৎ উঠে লাফিয়ে ঘরের বাইরে যেতে সেই লোকটাও সঙ্গে সঙ্গে লাফিয়ে ঘরের বাইরে এল, কিন্তু অন্ধকারে ঠিক ঠাহর করে উঠতে পারল না কোন্ দিকে ছট্টু ছুটে পালিয়েছে।

তথাপি আন্দাজের উপর নির্ভর করে কিছুদূর এগিয়ে গেল, কিন্তু পলাতক ছট্টুর সন্ধান করতে পারলে না অন্ধকার জঙ্গলের মধ্যে।

ঐ ঘটনার দিন-দুই বাদে সন্ধ্যার দিকে রতনলালের অফিসে আবার ছট্টুলালকে দেখা গেল। রতনলাল চেয়ারে বসে, থমথম করছে তার মুখটা। সামনে দাঁড়িয়ে ছট্টুলাল।

রতনলালের পাশেই অন্য একটা চেয়ারে উপবিষ্ট পিয়ারী নিঃশব্দে একটা সিগারেট টেনে চলেছে। হাতে ধরা একটা মার্কোভিচের টিন।

ছট্টুর মুখে সবই শুনেছে রতনলাল। বামদেব বিনয় প্রভৃতির রত্নমঞ্জিলে যাওয়াটার মধ্যে রতনলাল তেমন বেশী গুরুত্ব দেয়নি। চিন্তিত বিশেষভাবেই হয়ে উঠেছে সে কোন এক তৃতীয় দাড়িগোঁফওয়ালা শক্তিশালী লোকের সংবাদটা পেয়ে।

লোকটা কে? কেনই বা সেখানে গিয়ে আড্ডা নিয়েছে? ঐ লোকটাও কি তবে ঐ রত্নমঞ্জিলের আশা নিয়েই ওখানে গিয়ে আড্ডা নিয়েছে, না ঐ লোকটাই সেই দু'নম্বর পার্টি যে বেশী টাকার লোভ দেখিয়ে তার হাত থেকে রত্নমঞ্জিল ছিনিয়ে নিতে চায়!

পিয়ারীর দিকে তাকাল রতনলাল। পিয়ারী বুঝতে পারে রতনলাল তার সঙ্গে একটা কিছু পরামর্শ করেতে চায়। গুজরাটি বুদ্ধিতে আর কুলোচ্ছে না।

পিয়ারী ছট্টুর দিকে তাকিয়ে বললে, আচ্ছা ছট্টু তুই এখন যা। কাল এই সময় একবার দেখা করিস।

ছট্টু সেলাম দিল, যাচ্ছি কিন্তু বহরমপুরে আর যেতে পারব না। শালা একেবারে সাক্ষৎ দুশমন।

ছট্টু চলে গেল।

কিছুক্ষণ অতঃপর দুজনেই চুপচাপ বসে থাকে। কারো মুখেই কোন কথা নেই।

রতনলালই প্রথমে স্তব্ধতা ভঙ্গ করলে, পিয়ারী, তোমার কি মনে হচ্ছে?

দাঁড়াও, একটু ভাবতে দাও। ক্রমেই সব জটিল হয়ে যাচ্ছে বলে মনে হচ্ছে?

যত জটিলই হোক—একটা কথা, যেমন করে যে উপায়ে হোক আমার কিন্তু পিয়ারী ঐ রত্নমঞ্জিল চাই-ই। শালা জান কবুল তবু ঐ রত্নমঞ্জিল আমি কাউকে নিতে দেব না।

তা যেন হল, কিন্তু মাঝখান থেকে ঐ বেটা দাড়ি কোথা থেকে এল তাই তো ভাবছি।

চল না পিয়ারী, একবার বহরমপুর ঘুরে আসা যাক।

উঁহু। সেখানে গিয়ে ভিড় করে কোন লাভ হবে না। তার চাইতে আমি বলি কি, এ গোলমালে কাজ কি বাবা! দাও না বাড়িটা ছেড়ে।

ছেড়ে দেব! কভি না। বললাম তো জান কবুল, শেষ পর্যন্ত দেখব।

শোন রতনলাল, এসব ব্যাপারে জলের মত টাকা খরচ করতে হবে। পারবে? রাজী আছ?

নিশ্চয়ই।

কিন্তু শেষ পর্যন্ত বাড়িটা উদ্ধার করে যদি দেখা যায়, ওসব গুপ্তধন-টন স্রেফ সব ধাপ্পা, কিছুই নেই, তখন সে টাকার শোক সামলাতে পারবে তো বন্ধু!

মরদবাচ্চা আমি। টাকা বহু কামিয়েছি জীবনে পিয়ারী—এক দু লাখ যদিই যায় তো পরোয়া করি না। মোদ্দা কথা রত্নমঞ্জিল আমার চাই—

ঠিক?

ঠিক। রানা সজোরে টেবিলের উপরে একটা ঘুষি বসাল।

হুঁ, তাহলে শোন রানা। এসব ব্যাপারে টাকা তো খরচ করতেই হবে, কৌশলেরও দরকার, ওসব ছট্টুলালদের দ্বারা হবে না। আমি নিজে যাব বহরমপুর। সেখানে গিয়ে আগে সব ব্যাপারটা ভাল করে বুঝে দেখি, তারপর—

কবে যাবে?

যত তাড়াতাড়ি পারি যাব। কিছু টাকা দাও।

টেবিলের টানা চাবি দিয়ে খুলে একমুঠো নোট বের করে পিয়ারীর সামনে রাখলে রানা।

একান্ত নির্বিকারভাবেই পিয়ারী নোটগুলো নিয়ে পকেটে রাখল।

পিয়ারী রানার বহুদিনকার পরিচিত।

পিয়ারীর ক্ষমতার উপরেও রানার যথেষ্ট আস্থা আছে।

যুদ্ধের সময়ে ব্যবসার একটা অংশ যখন চোরাপথে বাঁকাভাবে চলছিল, সেই বাঁকাপথেই পিয়ারীর সঙ্গে আলাপ হয় রতনলাল রানার এবং সেই আলাপ ক্রমে ঘনিষ্ঠতায় পরিণত হয়।

পিয়ারীর পদবী কি এবং কোথায় তার দেশ, কি তার জাত, কি মাতৃভাষা—কেউ কোনদিন জানতে পারেনি।

উর্দু, হিন্দি, বাংলা ও ইংরাজী চার-চারটে ভাষায় পিয়ারী এত সহজভাবে কথাবার্তা চালাতে পারে যে ওর মধ্যে কোনটা তার মাতৃভাষা বোঝাই দুষ্কর।

অত্যন্ত ঢ্যাঙা, রোগা। পরিধানে কখনো থাকে দামী স্যুট। প্রত্যেকটা ক্রিজ তার স্পষ্ট। আবার কখনো থাকে পায়জামা-পাঞ্জাবি, সেরওয়ানি অথবা ধুতি-পাঞ্জাবি ও তার উপরে জহরকোট। হাতে সর্বদা একটি মার্কোভিচের টিন ও সিগারেট-লাইটার।

BanglaBook.org

কথাবর্তা বলে খুব কম। এমন একটা কঠিন গাম্ভীর্যের আবরণ দিয়ে সর্বদা নিজেকে আবৃত রাখে যে আপনা হতেই তাকে যেন এড়িয়ে চলবার ইচ্ছা হয় সকলের।

পিয়ারী বা মিঃ পিয়ারী নামেই সে সর্বত্র পরিচিত।

পিয়ারীকে বিশ্বাস করবার রতনলালের কারণও ছিল, যেহেতু দু-তিনবার অত্যন্ত দুরূহ জটিল ব্যাপারে পিয়ারী তাকে উদ্ধার করে দিয়েছে।

তবে পিয়ারীর পলিসি হচ্ছে ফেল কড়ি মাখ তেল!

সেই পিয়ারী যখন স্বেচ্ছায় রত্নমঞ্জিলের ব্যাপারটা নিজহাতে তুলে নিল, রতনলাল সত্যিই অনেকটা আশ্বস্ত বোধ করল।

অর্থব্যয় হবে ঠিক, কিন্তু যাহোক একটা ফয়সালা পিয়ারী করে দেবেই শেষ পর্যন্ত একটা কিছু।

রতনলালের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে পিয়ারী তার অফিস-কামরা হতে বের হয়ে এল। সিঁড়ির সামনে এসে তার সর্বোচ্চ ধাপের ওপরে দাঁড়িয়ে হাতের টিন থেকে একটা সিগারেট বের করল।

ওষ্ঠপ্রান্তে সিগারেটটা চেপে ধরে তাতে অগ্নিসংযোগ করল লাইটারের সাহায্যে। তারপর ধীরমন্থর পদে সিঁড়ি দিয়ে নামতে লাগল।

এতদিন রানার রত্নমঞ্জিলের ব্যাপারটা তার মাথার মধ্যে ভাল করে থিতোয়নি।

রানার মুখে দু-চারবার শুনেছে মাত্র। অবশ্য রত্নমঞ্জিলের মোটামুটি ইতিহাস তার অজ্ঞাত নয়।

রত্নমঞ্জিল সম্পর্কে এতদিন সে বেশী মাথা ঘামায়নি, কারণ ওই ব্যাপারে তার এতদিন ততটা ইন্টারেস্ট ছিল না। কিন্তু এবারে তাকে ভাবতেই হবে।

রত্নমঞ্জিলের ব্যাপারে খণ্ড খণ্ড ভাবে এতদিন যা সে শুনেছে এখন সেগুলো সব একত্রে গ্রথিত করে অখণ্ডভাবে চিন্তা করবার চেষ্টা করে। এ পর্যন্ত রত্নমঞ্জিল সম্পর্কে যা জানা গিয়েছে সে সব কিছু একত্রে দেখলে দাঁড়াচ্ছে, যে কোন কারণেই হোক ঐ পুরনো বাড়ি রত্নমঞ্জিলের একটা সিক্রেট বা রহস্য আছে। এবং সেই কারণেই রতনলাল ছাড়াও রত্নমঞ্জিলের দ্বিতীয় খরিদ্দার মাথা তুলেছে।

এই দ্বিতীয় খরিদ্দারটি কে?

তবে এও ঠিক লোকটা যে সম্পদশালী তা বোঝাই যাচ্ছে, নচেৎ রানার সঙ্গে টেক্কা দেবার সাহস হত না। এই হচ্ছে প্রথম কথা।

দ্বিতীয়তঃ বামদেব অধিকারী হঠাৎ ববহমপুরে গেলেন কেন?

তৃতীয়তঃ শ্রীমান দাড়িটি কে?

একটা দিন ও রাত পুরো নিজের মনে মনে চিন্তা করল পিয়ারী এবং নিজের কার্যপদ্ধতিও ছকে ফেলল একটা।

॥ বারো ॥

সুজাতা বা বামদেব কাউকেই ঘুণাক্ষরেও সেরাত্রের অভিযানের কথা বিনয় ইচ্ছা করেই জানাল না এবং তারপর পর পর দুটো দিন সারাটা দুপুর বিনয় একা একা বাড়ির পিছনে জঙ্গলের মধ্যে ঘুরে ঘুরে বেড়াল।

কিন্তু সেরাত্রের সেই কাঁটাঝোপের কোন হদিসই পেল না। কোথায় গিয়ে যে সে পথ হারিয়েছিল বুঝতেই পারল না। জঙ্গলের মধ্যে কিছুটা অগ্রসর হবার পর ফণীমনসা ও নানা জাতীয় বন্যগুল্ম কাঁটাঝোপ এমন দুর্ভেদ্য প্রাচীর তুলে দাড়িয়ে আছে যে তার মধ্যেই প্রবেশ করা একপ্রকার দুঃসাধ্য।

শুধু তাই নয়, রত্নমঞ্জিলের একটা ভগ্নাংশ যেটা গত ভূমিকম্পের সময় ধ্বসে গিয়েছিল, সেটাও ঐ জঙ্গলের মধ্যেই যেন ঢাকা পড়ে গিয়েছে। ভগ্ন দালান ও জঙ্গল দুটোতে মিলে জায়গাটা অগম্য ভয়াবহ করে রেখেছে। যত বিষধর সাপের আড্ডা সেখানে এখন।

যাই হোক বার বার ব্যর্থ হলেও বিনয় দমল না। অফিস থেকে কয়েক দিনের ছুটি নিয়ে এল পরের দিন কলকাতায় গিয়ে। তারপর ঐ জঙ্গল ও ভগ্ন ধ্বংসাবশেষ দালানের আশেপাশে সে ঘুরে বেড়াতে লাগল। যেমন করে যে উপায়েই হোক সেই রাত্রের রহস্যময়ী নারীকে খুঁজে বের করতেই হবে।

সেই মজা জঙ্গলাকীর্ণ দিঘিটার আশেপাশেও কম ঘোরাঘুরি করেনি বিনয়। সেই দাড়িগোঁফ শোভিত মুখখানার দেখাও আর মেলেনি যেমন তেমনি মেলেনি সেই তেমনি দেখা রহস্যময়ীর।

এদিকে দিনসাতেক হয়ে গেল কিরীটী রায়ের দেখা মিলল না।

এমনি করে আরো দুটো দিন কেটে গেল।

সেদিন সকালে সবে দোতলার বারান্দায় চায়ের আড্ডাটা জমে উঠেছে, এমন সময় মনোহর এসে বললে কে একজন ভদ্রলোক দেখা করতে চান কর্তাবাবুর সঙ্গে। বিশেষ জরুরী প্রয়োজন, ভদ্রলোক নাকি কলকাতা থেকে আসছেন।

বামদেব বিস্মিত হলেন। কলকাতা থেকে এত দূরে কে আবার তাঁর সঙ্গে দেখা করতে এল!

বললেন, যা, উপরেই পাঠিয়ে দে।

মনোহর চলে গেল এবং কিছুক্ষণ পরেই সিঁড়িতে জুতোর শব্দ শোনা গেল।

আর কেউ নয়। আগন্তুক স্বয়ং পিয়ারী।

পরিধানে দামী মুগার স্যুট। মাথার চুল থেকে পায়ের দামী গ্লেসকীডের জুতোটি পর্যন্ত চকচকে ঝকঝকে পালিস করা হাতে মার্কোভিচের টিন।

মুখে একটা আলগোছে ধরা জ্বলন্ত সিগারেট।

যদি আমার ভুল না হয়ে থাকে আপনিই—বোধ হয় মিঃ অধিকারী?

হ্যাঁ। আপনি?

গুড মর্নিং!

গুড মর্নিং! স্বাগত সম্ভাষণ জানালেন বামদেব পিয়ারীকে, যদিচ তাকে চিনতে পারলেন না।

বামদেব যে পিয়ারীকে চিনতে পারবেন না সে তো জানা কথাই, কারণ ইতিপূর্বে কখনো তো তাকে তিনি দেখেননি।

বিনা আহ্বানেই একটা খালি চেয়ার টেনে বসতে বসতে পিয়ারী বললে, আমি আপনার পরিচিত নই মিঃ অধিকারী, আপনি আমাকে তাই চিনতে পারছেন না।

না—

আমি আসছি কলকাতা থেকে বিশেষ একটা কাজে আপনার কাছে। আমার নাম পিয়ারীলাল দেশমুখ। পিয়ারী বলেই লোকে আমায় জানে।

কিন্তু কাজটা কি বলুন তো?

এই রত্নমঞ্জিল আপনার কাছ থেকে আমি কিনতে চাই।

বামদেব সত্যিই এবারে চমকে উঠলেন।

আবার রত্নমঞ্জিলের নতুন ক্রেতা!

বিনয়ও বিস্মিত দৃষ্টি তুলে নতুন করে আবার পিয়ারীর দিকে তাকাল। আবার একজন ক্রেতা!

কিন্তু বাড়ি তো ইতিপূর্বেই বায়না নেওয়া হয়ে গিয়েছে মিঃ পিয়ারী! বললেন বামদেব।

মৃদু হাসলে পিয়ারী।

বায়না নেওয়া হয়ে গেছে? তা যাক না!

কি বলছেন আপনি?

ঠিকই বলছি। বায়না অমন হয়ই। নাকচ করতে কতক্ষণ লাগবে মশাই!

বিনয়ও অবাক হয়েছে যেন কথাটা শুনে।

নাকচ করব?

হ্যাঁ, সব সংবাদই আমি নিয়ে এসেছি। পঞ্চান্ন হাজার টাকা দর হয়েছে তো। আশি হাজার টাকা দাম আপনাকে আমি দেব। ঐ সঙ্গে বায়নার টাকাও দেব। বলুন, isn't a fair offer!

বক্তব্যের শেষে বিশেষ করে ঐ শেষ কটি কথার ওপর জোর দিয়ে পিয়ারী বামদেবের মুখের দিকে তাকিয়ে হাতের অর্ধনিঃশেষিত জ্বলন্ত সিগারেটটা তর্জনী মধ্যমা ও বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠের সাহায্যে বারান্দার বাইরে নিক্ষেপ করে টিন হতে আর একটি সিগারেট বের করে অগ্নিসংযোগ করল।

বামদেব ভাবছিলেন, পঞ্চান্ন হাজার থেকে একেবারে আশি হাজার!

লোভনীয় টোপ বটে নিঃসন্দেহে।

ভেবে দেখুন মিঃ অধিকারী, আপনি যদি আমার terms-এ agree করেন তো এখুনি বায়না বাবদ ষাট হাজার আমি অগ্রিম দিতে প্রস্তুত। বলতে বলতে পিয়ারী আলতোভাবে ধীরে ধীরে মুখের ধোঁয়া ছাড়তে লাগল।

টাকাটা যেন পিয়ারীর কাছে কিছুই নয়।

বামদেব নিশ্চুপ।

পিয়ারীই আবার কথা বলে, আমি অত্যন্ত সোজা এবং এক কথার মানুষ। বিজনেস যা করি তার মধ্যেও গোলমাল রাখতে ভালবাসি না।

পার্শ্বে উপবিষ্ট বিনয় বুঝতে পেরেছিল বামদেবের কোথায় দ্বিধা হচ্ছে। লোভনীয় টাকার পরিমাণে শুধু বামদেব কেন, যে কোন মানুষের পক্ষেই এক্ষেত্রে লোভ সামলানো দুষ্কর।

বিশেষ করে এই জীর্ণ বাড়িটার—যার ন্যায্য দাম পঁচিশ-ত্রিশ হাজারের কখনই বেশী হতেই পারে না। সেক্ষেত্রে আশি হাজার টাকা একটা স্বপ্নাতীত ব্যাপার। শুধু তাই নয়, এ বাড়ির দাম আশি হাজার দিতে যে উদ্যত তার কাছ হতে এক লক্ষ টাকা পাওয়াও দুঃসাধ্য হবে না।

তাছাড়া আশি হাজার টাকা যখন বাড়িটার দাম উঠেছে, এর আসল মূল্যও নিশ্চয়ই তার

চেয়ে বেশীই হবে। নচেৎ এই জীর্ণ একটা বাড়ির জন্য কোন পাগলও এত টাকা দিতে যেত না।

কিন্তু মিঃ পিয়ারী, তা তো হবার নয়! পরিষ্কার কণ্ঠে এবারে বিনয়ই জবাব দিল।

বিনয়ের কথা শুনে বঙ্কিম দৃষ্টিতে তাকাল পিয়ারী এবারে বিনয়ের মুখের দিকে।

আপনি?

আমার আত্মীয়। জবাব দিলেন বামদেব।

ওঃ, কিন্তু কেন সম্ভব নয় বলুন তো?

শুনলেন তো একটু আগেই মেসোমশাইয়ের কাছে, এ বাড়ি বিক্রয়ের জন্য বায়না নেওয়া হয়ে গিয়েছে!

বললাম তো সে আর এমন একটা কঠিন ব্যাপার কি! ছেড়ে দিন না ব্যাপারটা আমার হাতেই, আমিই সব settle করে নেব। বাকি যা সামলাবার আমিই সামলাব

না, তা আর হয় না মিঃ পিয়ারী। আমরা অত্যন্ত দুঃখিত, ক্ষমা করবেন। জবাব দিল আবার বিনয়ই।

অতঃপর পিয়ারী নিঃশব্দে কিছুক্ষণ ধূমপান করে।

তাহলে আমার অফারটা আপনারা নিচ্ছেন না!

দুঃখিত। বললে বিনয়।

মিঃ অধিকারী, আপনারও কি তাই মত? পিয়ারী বামদেবের দিকে তাকিয়ে এবারে প্রশ্ন করে।

হ্যাঁ মিঃ পিয়ারী, ক্ষমা করবেন।

আচ্ছা তাহলে চলি। তবে একটা কথা যাবার আগে বলে যাই, আমার offerটা accept করলে ভালই করতেন।

পিয়ারী ততক্ষণে উঠে দাঁড়িয়েছে চেয়ার ছেড়ে।

পিয়ারীর কথার সুরটাই যেন বিনয়ের ভাল লাগল না। সেও অনুরূপ কণ্ঠস্বরে বলে ওঠে, কেন বলুন তো!

না, তাই বললাম—

আপনি যেন মনে হচ্ছে, আমাদের একটু থ্রেটেন করছেন মিঃ পিয়ারী!

যদি তাই মনে করেন মিস্টার তাই!

তাহলে আপনি জেনে যান দশ লক্ষ টাকা দিলেও এ বাড়ি আপনি পাবেন না।

তাই বুঝি! আচ্ছা—সোজা হয়ে দাঁড়ায় পিয়ারী।

হ্যাঁ, আপনি যেতে পারেন।

পিয়ারীর চোখের তারা দুটো বিনয়ের চোখের ওপরে স্থিরনিবদ্ধ। এবং সে দৃষ্টিতে কৌতুক ও ব্যঙ্গ যেন অত্যন্ত স্পষ্ট হয়ে ফুটে উঠেছে।

তাহলে দশ লক্ষ পেলেও দেবেন না?

না।

তাহলে আপনিও শুনে রাখুন, আমিও পিয়ারীলাল। নামটার সঙ্গে হয়তো আপনাদের সঠিক পরিচয় নেই। Wel, I accept your challenge! হয় এ বাড়ি আমার হবে, আশি হাজারে নয় পঞ্চান্ন হাজারেই, অন্যথায় এ বাড়ি কেউ পাবে না। আপনাদেরও ভোগে

আসবে না এ বাড়ি।

এই মুহূর্তে আপনি এখান হতে চলে যান!

বিনয়ের সমস্ত শরীর রাগে কাঁপছে তখন।

যাব বৈকি—আচ্ছা bye bye, আবার দেখা হবে। বলে দ্বিতীয় কোন বাক্যব্যয় না করে পিয়ারী জুতোর মচমচ শব্দ তুলে সিঁড়ির দরজার দিকে এগিয়ে গেল। এবং পিয়ারীর ক্রমঅপস্রিয়মাণ দেহটা সিঁড়ির পথে মিলিয়ে গেল।

বামদেব বিনয়ের দিকে তাকিয়ে বললেন, আচ্ছা ঝামেলায় পড়া গেল দেখছি এই এক বাড়ি নিয়ে! মিথ্যে তুমি লোকটাকে চটাতে গেলে কেন বিনয়!

কি বলছেন আপনি মেসোমশাই, কোথাকার কে না কে, আমাদের বাড়িতে এসে চোখ রাঙিয়ে যাবে!

চটাচটি না করলেই হত। উপকার না করে করুক, অপকার করতে কতক্ষণ?

আপনি দেখছি ভয় পেয়ে গিয়েছেন মেসোমশাই!

ভয় নয় বিনয়, মিথ্যে ঝামেলায় লাভ কি?

তাই বলে ভয় দেখিয়ে যাবে?

কিন্তু বাবা এখানে আর নয়, চল আজই কলকাতায় **ফিরে যাওয়া যাক!**

না মেসোমশাই, এখন কলকাতায় যাওয়া হবে না।

কেন?

তবে শুনুন অনেক কথা আছে আমার বলবার।

আবার কি কথা!

শুনুন। এ কদিন আমি চুপ করে বসে থাকিনি।

অতঃপর সংক্ষেপে গত দ্বিপ্রহর ও রাত্রির সমস্ত কাহিনী একে একে বলে গেল বিনয়।

বামদেব সব কথা শুনে তো নির্বাক।

ইতিমধ্যে পিয়ারীর সঙ্গে যখন বিনয়ের কথাবার্তা হয়, বিনয়ের কণ্ঠস্বরে আকৃষ্ট হয়ে সুজাতাও একসময় সকলের পশ্চাতে এসে দাঁড়িয়েছিল। সেও সমস্ত কথা শুনে বিস্ময়ে একেবারে স্তব্ধ হয়ে যায়।

বিনয় বলে, নিশ্চয়ই এ বাড়ির পিছনে কোন জটিল রহস্য আছে, এখন তো বুঝতে পারছেন। এবং অন্যেও জানতে পেরেছে, তাই এ বাড়ি নিয়ে হাঙ্গামা শুরু হয়েছে। নচেৎ আপনিই বলুন না, এমন কেউ কি পাগল আছে যে এ বাড়ি আশি হাজার টাকা দিয়ে কিনতে চাইবে! নিশ্চয়ই এর মূল্য অনেক বেশী। কাজেই সমস্ত ব্যাপারটা ভালভাবে না জেনে এ বাড়ি কিছুতেই হাতছাড়া করা চলবে না। এবং সব ব্যাপারের একটা মীমাংসা না হওয়া পর্যন্ত এ স্থানও আমাদের ত্যাগ করা উচিতও হবে না।

বামদেব কিছুক্ষণ গুম হয়ে রইলেন।

অবশেষে বললেন, এ যে বড় চিন্তার কথা হল বিনয়!

চিন্তার কথা তো নিশ্চয়ই, কিন্তু বিচলিত হবার কি আছে! দেখাই যাক না কোথাকার জল কোথায় গিয়ে দাঁড়ায়!

বিনয় ঠিকই বলেছে বাবা, এ বাড়ি আমাদের কিছুতেই বিক্রি করা চলবে না।

সুজাতার কথায় বিনয় ও বামদেব দুজনেই একসঙ্গে ফিরে তাকাল।

সুজাতা আবার বলে, বেটাকে গলাধাক্কা দিয়ে হাঁকিয়ে দিলে না কেন বিনয়! বেটার কি সাহস!

না মা না, ওসব কী চরিত্রের লোক কে জানে!

বাবা, তুমি দেখছি ভয়েই গেলে। যার যা খুশি তাই করলেই হল! দেশে আইন নেই আদালত নেই! প্রতিবাদ জানায় সুজাতা।

আপনি মিথ্যে ভাবছেন মেসোমশাই। এই ধরনের কুকুর সায়েস্তা করবার জন্য আমারও মুগুর জানা আছে। আবার যদি এখানে ও পা দেয়, সেই ব্যবস্থাই করব।

বিনয় আশ্বাস দেবার চেষ্টা করে বামদেবকে, কিন্তু বুঝতে পারে বামদেবের মনের চিন্তা তাতে দূর হয়নি, তিনি প্রত্যুত্তরে কোন কথাই বলেন না।

নিঃশব্দে উঠে বামদেব তাঁর ঘরের দিকে চলে যান।

বিনয় নিজেও চিন্তিত হয়নি তা নয়। কিন্তু তার চিন্তাধারাটা অন্য পথে। সে ভাবছিল এই রত্নমঞ্জিলকে কেন্দ্র করে ক্রমে যে একটা রহস্য ঘনিয়ে উঠছে তারই কথা।

সেই ঝাঁকড়া চুলদাড়িগোঁফওয়ালা লোকটা, চকিতে দিঘির ধারে দেখা দিয়েই যে জঙ্গলের মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গেল, কে সে লোকটা!

আর কেই বা সেই রাত্রের মধুকণ্ঠী পথ-প্রদর্শিকা! কেন সে তার পরিচয় দিল না? আর কেই বা সেই দুর্বাসা মুনি যার কথায় সেই মেয়েটিকেও শঙ্কিত বলে মনে হল! সেরাত্রে জানালা হতে দেখা সেই লাল আলো, সর্বশেষে এ বাড়ির পুরাতন ভৃত্য মনোহরের সন্দিগ্ধ আচরণ—সব কিছু যেন জট পাকিয়ে যাচ্ছে। এই রত্নমঞ্জিলের সঙ্গে সব কিছুর নিশ্চয়ই একটা সম্পর্ক আছে।

সম্পর্কই যদি না থাকবে তো ওরা—ঐ বিচিত্রের দল এখানে এসে ভিড় জমিয়েছে কেন? কেনই বা রহস্যজনক ওদের গতিবিধি? আর বিশেষ করে রত্নঞ্জিলের সঙ্গে যদি ওদের কোন সম্পর্কই না থাকবে তো এখানেই বা ওরা কেন?

তারপর এই পিয়ারী!

কোথা হতে ঘটল এর আবির্ভাব? এ কি কোন সম্পূর্ণ তৃতীয় পক্ষ, না পূর্বের দলেরই কোন একজন?

আশি হাজার টাকা। আশি হাজার টাকায় লোকটা এই রত্নমঞ্জিল কিনতে চায়!

কি ভাবছ বিনয়?

সুজাতার প্রশ্নে বিনয়ের চিন্তাসূত্র ছিন্ন হয়ে গেল।

অ্যাঁ! কিছু বলছিলে সুজাতা?

বলছিলাম মুখ বুজে বসে আছ কেন?

এক কাপ চা হলে ভাল হত।

তা না হয় আনছি, কিন্তু—

ভয় নেই সুজাতা। ইচ্ছায় হোক অনিচ্ছায় হোক, এ ব্যাপারে যখন একবার জড়িয়েছি নিজেকে, এর শেষ না দেখে ছাড়ছি না।

কিন্তু যাই বল, ব্যাপারটা বেশ ইন্টারেস্টিং হয়ে উঠল দেখছি। সকৌতুকে বলে সুজাতা কথাটা।

হুঁ? গম্ভীর কণ্ঠে জবাব দেয় বিনয় মাত্র একটি শব্দে।

কিন্তু তোমার কি মনে হয় বল তো বিনয়? বাড়িটার মধ্যে কোন গুপ্তধনটন নেই তো?

ব্যাপার দেখে সেই রকমই তো মনে হয় সুজাতা।

ভারী মজা হয়, না? যদি এই বাড়ির কোথাও ঘড়া ঘড়া যখের ধন পাওয়া যায়!

যখের ধন থাক আর না থাক, মজা তো শুরু হয়েই গিয়েছে। কিন্তু চা কই!

আনছি। আবার হঠাৎ উধাও হয়ো না কিন্তু। তোমার সঙ্গে আমার অনেক কথা আছে বিনয়।

ভয় নেই, চা পান না করে পাদমেকং ন গচ্ছামি! নির্ভয়ে চা তৈরী করে আন।

লঘুপদে সুজাতা চলে গেল।

ব্যাপারটা যেমন আকস্মিক তেমনি অতর্কিতভাবেই ঘটে গেল। লোকটা যে আচম্‌কা অমনি করে হঠাৎ উঠে ছুটে পালিয়ে যাবে আদপেই তা সে ভাবেনি, ভাবতে পারেনি।

ছট্টুলাল হঠাৎ উঠে এক দৌড়ে বাইরের অন্ধকারে অদৃশ্য হওয়ায় প্রথমটায় একটু হক্‌চকিয়ে যায়নি যে তা নয়, কিন্তু পরিস্থিতিটা হৃদয়ঙ্গম করে ছট্টুলালের পিছু পিছু বাইরে ছুটে আসতেও সে দেরি করে না।

কিন্তু ঘনান্ধকারে জঙ্গলের মধ্যে কোন্ পথে যে সে পালাল বুঝতে পারা গেল না।

এই কুটীরে আসবার পথ তিন-চারটে আছে অবশ্য জঙ্গলের ভিতর দিয়ে দিয়ে কিন্তু সেও এক গোলকধাঁধার ব্যাপার।

ভাল করে না জানা থাকলে জঙ্গলের মধ্যে পথভ্রান্ত হওয়া কিছুই বিচিত্র নয়। সেই ভেবেই সে অগ্রসর হল ছট্টুলালের খোঁজে।

জঙ্গলের মধ্যে পূর্বে কোন রাস্তাই ছিল না। কষ্টেসৃষ্টে চলবার মত পথ সে নিজেই করে নিয়েছিল এবং সেই পথ ধরে চলাচল করলেও তাকে ঠিক পথ বলা চলে না। এবং পূর্ব হতে না জানা থাকলে সে পথ ধরে যে যাতাযাত করা চলতে পারে কারুরই বিশ্বাস হবে না।

অন্ধকারে শ্বাপদের চোখের মত যেন লোকটার অনুসন্ধানী চোখের তারা দুটো জ্বলছে। হাতের নিশ্চিন্ত মুঠোর মধ্যে এসে সে পালিয়ে গেল।

তার এখানে গোপন অবস্থিতি সম্পর্কে একবার জানাজানি হয়ে গেলে এখানে তার আর আত্মগোপন করে থাকা সুবিধে হবে না। লোকটার আসল পরিচয় জানা হল না।

কে এবং কোন্ দলের লোক তাই বা কে জানে? কি উদ্দেশ্যে যে রত্নমঞ্জিলের আশেপাশে আজ ক'দিন ধরে চোরের মত উঁকিঝুঁকি দিয়ে বেড়াচ্ছিল তাই বা কে জানে!

না, লোকটা সম্পর্কে অমন শৈথিল্য প্রকাশ করা আদপেই উচিত হয়নি।

ঐ শৈথিল্যের সুযোগেই ও পালাতে পারল।

আপসোসে নিজের হাত নিজেরই যেন চিবোতে ইচ্ছে করে। কিন্তু তীর তূণ থেকে বের হয়ে গিয়েছে, আর উপায় নেই।

হঠাৎ একটা খসখস শব্দ শুনে ও থমকে দাঁড়ায়।

শ্বাস বন্ধ করে অন্ধকারে দাঁড়িয়ে থাকে।

অন্ধকারে ও বুঝতে পারে অস্পষ্ট একটা ছায়ামূর্তি এগিয়ে আসছে।

কাছাকাছি আসতেই বাঘের মত ঝাঁপিয়ে পড়ে ছায়ামূর্তিকে জাপটে ধরতেই নারীকণ্ঠে

ভয়চকিত সাড়া এল, কে?

আক্রমণকারীর বজ্রবন্ধনও সঙ্গে সঙ্গে শিথিল হয়ে যায়। বিস্ময়-বিহ্বল কণ্ঠে বলে ওঠে, কে, বাণী!

হ্যাঁ।

এত রাত্রে এই জঙ্গলের মধ্যে তুমি কি করছিলে? ঘুমোওনি?

না, বাবা। ঘুম আসছিল না দেখে বাইরে একটু—

কতবার না তোমায় নিষেধ করে দিয়েছি বাণী, একা একা এমনি করে অন্ধকার জঙ্গলের মধ্যে বের হবে না!

দিনরাত ঐ খুপরির মধ্যে কোন মানুষ বন্দী থাকতে পারে নাকি? বাণীর কণ্ঠে সুস্পষ্ট একটা অভিমানের সুর।

খুব পারবে। যাও ঘরে যাও।

বাণী কিন্তু নড়ে না। চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকে।

কই গেলে না? যাও!

বাণী তথাপি নিরুত্তর এবং নিশ্চল।

বজ্রকণ্ঠে এবার ডাক এল, বাণী!

তারপরই এগিয়ে এসে বাণীর একখানা হাত বজ্রমুষ্টিতে চেপে ধরে ও হিড়হিড় করে টেনে নিয়ে চলে।—অবাধ্য মেয়ে! চল হাত-পা বেঁধে তোমাকে এরপর থেকে আমি ঘরের মধ্যে আটকে রেখে দেব!

॥ তের ॥

রতনলাল উঠে দরজাটা খুলে দিল।

মিহি শান্তিপুরের সুরু কালোপাড় ধুতি, মুগার পাঞ্জাবি ও পায়ে চকচকে নিউকাট জুতো মাঝারি দোহারা চেহারার একজন মধ্যবয়সী সুপুরুষ কক্ষমধ্যে প্রবেশ করল। হাতে মলাক্কা বেতের সুদৃশ্য একটা ছড়ি।

এ কি যোগানন্দ যে! হঠাৎ কি মনে করে? রতনলালই আগন্তুককে প্রশ্ন করে।

আগন্তুক যোগানন্দ কিন্তু বিনা বাক্যব্যয়ে কক্ষের মধে খালি দ্বিতীয় চেয়ারটা টেনে নিয়ে বসে নির্বিকার কণ্ঠে কেবল বললে, একটা পাত্রে কিছু ঢাল দেখি আগে বাবা, গলাটা একটু ভিজিয়ে নিই।

রানা ড্রয়ার থেকে আর একটা কাঁচের গ্লাস বের করে বোতল থেকে খানিকটা তরল পদার্থ জলে ঢেলে মিশিয়ে এগিয়ে দিল যোগানন্দের দিকে।

দীর্ঘ এক চুমুকে কাঁচের পাত্রটি নিঃশেষ করে যোগানন্দ বললে, তারপর? তোমার রত্নমঞ্জিল কেনবার ব্যাপারটা কতদূর এগুলো বল?

ব্যাপারটা যে ক্রমেই একটু একটু করে ঘোরালো হয়ে উঠল হে যোগানন্দ!

এর মধ্যে আবার ঘোরালো হয়ে উঠবার কি হল? বায়না পরশু তো হয়ে গিয়েছে?

তা তো হয়েই গিয়েছে। এই কিছুক্ষণ আগে দত্ত-সাহার ওখান থেকে আসছি। শালা রাঘব একটা নূতন প্যাঁচ কষবার মতলবে আছে।

কি রকম! মিটমিট করে তাকায় যোগানন্দ রানার মুখের দিকে।

হ্যাঁ, বলছে বাড়িটা ছেড়ে দাও, মোটা টাকা খেসারত দেব—অন্য কে এক পার্টি আছে—

বটে! তা তুমি কি বললে?

আমিও রতনলাল রানা! বললাম আরো দু-পাঁচ হাজার বেশী ছাড়তে হয় আমিই ছাড়ব। ওসব মতলব ছেড়ে দাও তো যাদু।

হুঁ, তা কত বেশী দিতে চায়?

ঠিক জানি না, তবে দশ-বিশ হাজার তো মিলবেই।

বল কি! তবে ছেড়েই দাও না, মুফৎসে দশ-বিশ হাজার যদি অমনি করে এসেই যায় তবে আর ক্ষতি কি? ঘরের টাকা ঘরে এসে গেল, সঙ্গে আবার ফাউ!

কি বলছ তুমি যোগেন? তুমিই না লোভ দেখিয়ে আমাকে এ ব্যাপারে নামিয়েছ! এখন বলছ ছেড়ে দিতে!

হ্যাঁ, তা বলেছিলাম বটে। কিন্তু ভেবে দেখতে গেলে আগাগোড়া সব কিছুই তো একটা অনিশ্চিতের ওপরে নির্ভর করছে। কিছুই একেবারে নাও তো মিলতে পারে। এতগুলো টাকা ঢেলে তখন স্রেফ বোকা বনে যেতে হবে,—কথাটা ভেবে দেখ!

উহুঁ, হাত একবার বাড়িয়েছি, ওর শেষ না দেখে ফিরছি না। ভাগ্যে যদি কেবল মাটিই ওঠে উঠবে।

কিন্তু ভেবে দেখ, পঞ্চান্ন হাজার টাকা—

লোটা কম্বল নিয়ে বাপ আমার এসেছিল এ মলুকে—ফের না হয় রাম সেই শুরু করব। শালা পুরুষের ভাগ্য ডুবতেও যতক্ষণ উঠতেও ততক্ষণ!

যোগানন্দ রানার সঙ্গে কথা বলছিল আর মধ্যে মধ্যে কাচের পাত্র পূর্ণ করে গলাধঃকরণ করছিল। বোতলটা প্রায় সে খালি করে আনে।

হঠাৎ বোতলের দিকে নজর পড়ায় রানা বলে, এই যোগেন, কত খাচ্ছিস!

ভয় নেই—যোগানন্দ মাতাল হয় না। মৃদু হেসে যোগানন্দ জবাব দেয়।

সত্যি যোগানন্দকে তার পরিচিতেরা কখনও যাকে বলে মদ খেয়ে মাতাল হতে দেখেনি। মদ খেয়ে মদ হজম করবার অদ্ভুত শক্তি আছে যোগানন্দের। বন্ধুবান্ধবমহলে কেউই যোগানন্দের আসল ও সত্যিকারের পরিচয়টা জানত না এমন কি তার পদবীটাও জানে না। কেউ জানে না কোথায় সে থাকে—কোন্ বাড়িতে বা কোন্ পাড়ায়! সংসারে কে তার আছে বা কিভাবে তার চলে!

পরিচিতজনদের আড্ডায় সে নিয়মিত হাজিরা দেয়। মদ্যপান করে হৈ হৈ করে অধিক রাত পর্যন্ত। তারপর একসময় দিব্যি আকণ্ঠ মদ্যপান করে (সর্বক্ষেত্রেই প্রায় পরের পয়সায়) এবং এতটুকু না টলে বের হয়ে যায় শিস দিয়ে সুর ভাঁজতে ভাঁজতে। কারোর সাহায্যের প্রয়োজন হয় না।

বন্ধুবান্ধবরাও যোগানন্দকে খুশিমনে মদ খাওয়ায়, বিশেষ করে ব্যবসায়ীমহল। ব্যবসায়ীমহলেই যোগানন্দের আনাগোনা এবং খাতিরও তার প্রচুর। যোগানন্দকে খাতির করবার প্রধান কারণই ছিল, সকলের খুঁটিনাটি, সমস্ত ব্যবসার বাজারদরটা সর্বদা থাকত যোগানন্দের ঠোঁটের আগায় এবং বাজারদরের ওঠানামা সম্পর্কে আগে থাকতেই মতমত দেবার একটা অদ্ভুত দক্ষতা দূরদৃষ্টি ছিল যোগানন্দের। তার কথার উপরে নির্ভর করে বড়

একটা কাউকেই ব্যবসায়ীমহলে তেমন ঠকতে হত না।

ঐ দালালী করাটা ছিল তার প্রধান জীবিকা। অথচ ব্যবসায়ীমহলে ঐ শ্রেণীর লোকেরা দালাল বলে সাধারণতঃ যে ব্যবহার পায়, যোগানন্দ কারো কাছ হতে সে ধরনের ব্যবহার পায়নি। বরং সে পেয়ে এসেছে সকলের কাছ হতেই একটা বিশিষ্ট সম্মানের ও প্রীতির আসন। এবং সেই কারণেই হয়ত তাকে সকলেই প্রায় সানন্দে মদ খাওয়াত। যোগানন্দের বিশেষ মদ্য প্রীতিটা কারো কাছেই অজ্ঞাত ছিল না।

যোগানন্দই রতনলালকে 'রত্নমঞ্জিল'টা কেনবার জন্য উৎসাহিত করে তোলে। রতনলাল মিথ্যা বলেনি। এবং খুব সম্ভবত যোগানন্দের উৎসাহ না পেলে শেঠ রতনলাল এতদূর অগ্রসর হতো কিনা সন্দেহ।

রানার অফিসঘরের ওয়াল-ক্লকটায় রাত্রি আটটা ঢং ঢং করে ঘোষণা করল।

যোগানন্দ উঠে দাঁড়ায়, তবে চললাম হে শেঠ!

এর মধ্যেই? বস না—আর একটা বোতল খুলি! রানা বলে।

না। একটা কাজ আছে। এক জায়গায় যেতে হবে। যোগানন্দ মাথা নেড়ে বলে।

বল কি হে যোগানন্দ এত শীঘ্র অমৃতে অরুচি! সবে তো শুরু করলে!

না হে, কাজ আছে। চলি—

সত্যি-সত্যিই যোগানন্দ ঘর থেকে বের হয়ে গেল। সিঁড়িপথে একটা টিমটিমে কম পাওয়ারের বাল্‌ব জ্বলছে। স্বল্পালোকে সমস্ত সিঁড়িপথটা একটা আধো আলোছায়া, বিশ্রী স্তব্ধতায় যেন থমথম করছে।

যোগানন্দ বাইরের রাস্তায় নেমে একবার সতর্ক দৃষ্টিতে রাস্তার এ-মাথা থেকে ও-মাথা পর্যন্ত যতদূর দৃষ্টি চলে দেখে নিল। এ রাস্তাটা ঐ সময় সাধারণতঃ একটু নির্জনই হয়ে পড়ে। ফুটপাত ধরেই যোগানন্দ এগিয়ে চলল। শ্লথমন্থর পদবিক্ষেপে। রানার কাছে রত্নমঞ্জিল সম্পর্কে প্রাপ্ত সংবাদটা সত্যিই যোগানন্দকে যেন একটু চিন্তিত করে তুলেছে।

যে টোপ সে ফেলেছিল মাছ সে টোপ গিললেও বঁড়শীটা ঠিক মাছের গলায় গেঁথেছে কিনা বোঝা যাচ্ছে না। টেনে তুলতে গেলে যদি ফসকে যায়। আশপাশে আবার এদিকে অন্য মাছ ঘাই দিচ্ছে, খবর পেয়েছে সে।

অনিলেরও বহুদিন দেখাসাক্ষাৎ নেই। গত এক মাস ধরে হঠাৎ কোথায় যে সে ডুব দিল, একেবারে কোন পাত্তাই নেই।

ঘটনাটা যে কোন্ দিকে গড়াচ্ছে ঠিক যেন বোঝা যাচ্ছে না।

হাঁটতে হাঁটতে যোগানন্দ বৌবাজারে এল। শিয়ালদার দিকে বৌবাজার স্ট্রীট ধরে কিছুটা পথ এগিয়ে ডান দিককার একটা অপরিসর গলির মধ্যে একসময় ঢুকে পড়ল। গলিটা এত সরু যে দুজন লোকের স্বচ্ছন্দে রাত্রির অন্ধকারে পাশাপাশি হাঁটাই কষ্টকর। গলিটা ব্লাইন্ড। একটা মাত্র করপোরেশনের গ্যাসবাতি সমস্ত গলিপথটার জন্য। তাই আলোর চাইতে মনে হয় অন্ধকার যেন বেশী। স্যাঁতসেঁতে নোংরা। হাওয়াটা বন্ধ হওয়ায় একটু ভ্যাপসা ভাব।

যোগানন্দ গলিটার মধ্যে প্রবেশ করে দ্রুতপদে এগিয়ে গিয়ে বাঁ-হাতি একটা তিনতলা পুরাতন বাড়ির বন্ধ কবাটের কড়াটা ধরে বার-দুই নাড়া দিতেই ভিতর থেকে নারীকণ্ঠে সাড়া এল, কে?

যোগানন্দর ডাকে কোনরূপ সাড়া না দিয়ে আবারও দরজার কড়াটা ধরে বার-দুই নাড়া

দিল এবং এবারে সঙ্গে-সঙ্গেই দরজাটা খুলে গেল।

বয়স বোধ করি ত্রিশ-পঁয়ত্রিশ হবে, একটি মহিলা দরজা খুলে দিতে এসেছিলেন। পরিধানে সাধারণ কালোপাড় একটি মিলের শাড়ি, হাতে একগাছি করে শাঁখা। রোগাটে একহারা দেহের গড়ন। সিঁথিতে সিন্দুর ও কপালে একটি গোলাকার সিন্দুরের টিপ।

ভদ্রমহিলার চেহারা এমনিতে কুশ্রী নয়, কিন্তু দারিদ্র্য যেন সমস্ত সৌন্দর্য ও শ্রীকে লেহন করে নিয়েছে। শুধু দারিদ্রই নয়, সেই সঙ্গে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে চোখে মুখে একটা ক্লান্তি! মহিলার হাতে একটি হ্যারিকেন বাতি ছিল। তিনি আগে আগে চললেন। যোগানন্দ তাঁকে অনুসরণ করে।

মহাবীর কোথায়? তাকে দেখছি না! যোগানন্দ প্রশ্ন করে।

বাজারে গিয়েছে। মহিলা জবাব দিলেন।

আর নারাণী?

নারাণী তো আজ চারদিন হল কাউকে না বলে চলে গিয়েছে কোথায়—

আমারই অন্যায় হয়েছে দিদি। কাজের ঝঞ্ঝাটে কদিন এদিকে আসতে পারি নি। একা একা ঐ বাড়িতে মহাবীরকে নিয়ে নিশ্চয়ই আপনার খুব কষ্ট হয়েছে!

না ভাই, কষ্ট আর কি—

ভয় করেনি?

ভয়! মহিলা মৃদু হাসলেন, তারপর মৃদুকণ্ঠে বললেন, না, ভয় কি! সারাদিন ধরে টিনের ফ্যাক্টরীতে কাজ চলে—ঠং ঠং শব্দ। বরং সন্ধ্যার পর ফ্যাক্টরী বন্ধ হলে একটু আরামই পাওয়া যায়। তাছাড়া মহাবীর তো আছেই।

ইতমধ্যে কথা বলতে বলতে দুজনে একটা ঘরের মধ্যে এসে ঢুকলেন। বহু পুরাতন আমলের বাড়ির নিচের তলার ঘর। ছোট ছোট জানালা। অন্ধকার চাপা তাই আলো-বাতাসের অভাবে কেমন যেন! ঘরের মধ্যে আসবাবপত্রের বাহুল্যও তেমন নেই। একধারে একটি চৌকির ওপরে সাধারণ একটি শয্যা বিছানো। আর এক কোণে একটি ছোট আকারের স্টীলের ট্যাঙ্ক।

একটি মাদুর পেতে দিয়ে মহিলা বললেন, বস।

পরিধানে স্যুট থাকায় কোনমতে কষ্টেসৃষ্টে পা গুটিয়েই যোগানন্দ মদুরের ওপরে বসে পড়ল।

এই দারিদ্র্যের মধ্যে তুমি আস—আমারই লজ্জা করে যোগেন!

ওকথা ভাবেন কেন দিদি? ভাই আসবে দিদির বাড়িতে, সেখানে দারিদ্র্য যদি কিছু থাকেই তাতে লজ্জার আবার কি! ওরকম ভাবলে কিন্তু আমার আর আসাই হবে না। কিন্তু মহাবীরটারও তো আচ্ছা আক্কেল! কতক্ষণ গিয়েছে?

তা আধ ঘণ্টা তো হবেই—

একা আপনি বাড়িতে আছেন, সে খেয়ালও নেই নাকি?

না, ওর কোন দোষ নেই। ওর নিজের কি কাজ আছে, তাই বলে দিয়েছি একেবারে কাজ সেরে আসতে।

মহাবীরকে বলেননি কেন দিদি একটা ঝি খুঁজে আনতে?

কি হবে! একা মানুষ কাজকর্মও বিশেষ কিছু নেই। আবার একটা ঝি দিয়ে কি হবে?

ঠিক সেজন্য নয় দিদি। মহাবীর পুরুষমানুষ, আর একা আপনি এখানে স্ত্রীলোক—অন্য একজন স্ত্রীলোকের থাকা খুবই প্রয়োজন।

চিরকাল তো এইভাবেই কাটিয়েছি বাণী আর আমি। তোমার দাদা কালেভদ্রে কখনও ক্বচিৎ আসতেন—

দাদার আমলে যা হয়েছে হয়েছে—

কিন্তু থাক সেকথা। তাদের কোন সন্ধান পেলে?

না, এখনো কোন সন্ধানই পাইনি। তবে আপনি ভাববেন না, তারা ফিরে আসবেই। তারপর একটু থেমে বলে, চলুন না দিদি, আপনি আমার ওখানে গিয়ে থাকবেন।

না ভাই, তা হয় না।

কেন হয় না? একা একা এখানে পড়ে থাকেন—মহাবীর তো এখানে রইলই, তারা ফিরে এলে মহাবীরই তো আমাদের সংবাদ দিতে পারে। আপনি আমার ওখানে থাকলে আমিও নিশ্চিত থাকতে পারি।

তুমি আমার জন্যে চিন্তা করো না ভাই।

বাইরের দরজার কড়া নড়ে উঠল।—মহাবীর ফিরে এল বোধ হয়! সবিতা বললেন।

আমি যচ্ছি, দরজা খুলে দিয়ে আসছি। যোগানন্দ ওঠবার চেষ্টা করে। কিন্তু মহিলা বাধা দেন, না না, অন্ধকারে তুমি পথ ঠিক করতে পারবে না। তুমি বসো, আমি দরজা খুলে দিয়ে আসছি। সবিতা অন্ধকারেই দ্রুতপদে অদৃশ্য হয়ে গেলেন।

একটু পরেই মহাবীরের জুতোর শব্দ দরজার বাইরে শোনা গেল।

তোমার বাবু এসেছেন মহাবীর! শোনা গেল মহিলার কণ্ঠস্বর।

মহাবীরের বয়স হয়েছে। পঞ্চাশের উর্ধ্বে। কিন্তু দেহের গঠন এখনও অটুট আছে।

॥ চোদ্দ ॥

মহাবীরের গলার শব্দ পেয়ে যোগানন্দ বাইরে এসে দাঁড়ায়, একলা মাইজীকে রেখে এতক্ষণ তুমি বাইরে ছিলে মহাবীর!

আমি তো যেতে চেয়েছিলাম না হুজুর। কিন্তু মাইজী বললেন—

নারায়ণী চলে গেছে। একটা ঝি তো খুঁজে আনতে পারতে মহাবীর!

আমি তো বলেছিলাম, মাইজী বারণ করলেন।

কালই একটা ঝি খুঁজে আনবে।

মহাবীর ঘাড় নেড়ে সম্মতি জানাল।

ইতিমধ্যে ঘরের মধ্যে স্টোভ জ্বালিয়ে সবিতা চায়ের জল চাপিয়ে দিয়েছিলেন কেতলিতে।

ঘরে ঢুকে যোগানন্দ তাই দেখে বললে, এখন আবার চায়ের জল চাপালেন দিদি!

তা হোক, তুমি তো চা ভালবাস।

যোগানন্দ জানে, প্রতিবাদ জানালে দিদি মনে ব্যাথা পাবেন, তাই আর কোনরূপ প্রতিবাদ জানল না।

জুতো খুলে হাঁটু মুড়ে আবার মাদুরের ওপরে বসল।

সমস্ত পৃথিবীর মধ্যে এই গৃহকোণটি সম্পর্কে যোগানন্দের কি যেন দুর্বলতা—তার উচ্ছৃঙ্খল নিয়মকানুনহীন জীবনের এই গৃহকোণটি যে কতখানি অধিকার করে আছে, ভাবতে গেলে নিজেরই তার বিস্ময়ের অবধি থাকে না। যেদিন হতে এই গৃহকোণটি সে চিনেছে, সেইদিন হতেই যেন সে এক অদৃশ্য বাঁধনে বাঁধা পড়েছে এখানে। ভালবাসা, স্নেহমমতা কোনদিনই এসবের কোন স্থান ছিল না যোগানন্দের জীবনে। জন্মের সঙ্গে-সঙ্গেই মাকে হারিয়েছিল। সতের বছর বয়সের সময় বাপকেও হারায়। এমন কিছু সঞ্চয় বাপ রেখে যাননি যোগানন্দের জন্য বা এমন কিছু শিক্ষাও দিয়ে যেতে পারেননি, যাতে করে সহজ স্বাভাবিক পথে জীবনটাকে যোগানন্দ কাটিয়ে দিতে পারত। অথচ তীক্ষ্ণ বুদ্ধি ছিল যোগানন্দের।

পিতার মৃত্যুর পর যোগানন্দ মামার বাড়িতে এসে ওঠে। কিন্তু দু'দিনেই বুঝতে পারল সেখানে স্থান তো হবেই না এবং কোনরূপ সাহায্যও মিলবে না।

যোগানন্দ কলকাতায় চলে এল। হাতে সামান্য যা ছিল তারই উপরে নির্ভর করে একটা মেসবাড়িতে এসে উঠল। পনের টাকায় খাওয়া থাকা। সেই মেস বাড়িতেই আলাপ হয় যোগানন্দের শেয়ার মার্কেটের দালাল যতীন মিত্রের সঙ্গে। যতীন মিত্রের পরামর্শেই যোগানন্দ বাজারে ঘোরাফেরা শুরু করল। মাস ছয়েক বাজারে ঘোরাফেরা করে শেয়ার সম্পর্কে বাজারদর ও তার ওঠানামা সম্পর্কে একটা মোটামুটি জ্ঞানলাভ করল এবং খুব অল্পদিনের মধ্যেই যোগানন্দ দালালী করে বেশ দু' পয়সা উপার্জন করতে শুরু করে।

বছর দশেকের মধ্যে যোগানন্দ তার নিজের বিশিষ্ট আসনটি কায়েম করে নিল। যথেষ্ট অর্থাগম হতে লাগল। এবং অর্থাগমের সঙ্গে সঙ্গে আর একটি বিশেষ বস্তুর ওপরে তার আসক্তি জন্মাল। সুরা। কিন্তু সুরা তাকে ধ্বংস করতে পারেনি।

চা তৈরি করে সবিতা চায়ের কাপটা এগিয়ে দিলেন যোগানন্দের দিকে। চায়ের কাপে চুমুক দিতে দিতে যোগানন্দ বলে, আচ্ছা দিদি, বলতে পারেন চা তো আপনি বিশেষ খান না কিন্তু এমন চা তৈরী করেন কি করে?

সবিতা যোগানন্দের কথায় হাসেন।

নেহাৎ কাজের ঝঞ্ঝাটে রোজ আসতে পারি না, নচেৎ ইচ্ছা করে রোজ এসে আপনার হাতের তৈরী চা খেয়ে যাই—

তা বেশ তো, এলেই তো হয়।

দাঁড়ান, এখন আপনাকে জোর করছি না বটে, সব ঝামেলা মিটে যাক, তারপর আপনাকে আমার বাড়িতে যে নিয়ে যাব আর ছাড়াছাড়ি নেই। কিন্তু রাত হল, এবারে আমাকে উঠতে হবে। বলতে বলতে যোগানন্দ উঠে দাঁড়াল।

হঠাৎ দরজার গোড়া পর্যন্ত এগিয়ে গিয়ে আবার দাঁড়ায়, তার পর পকেটে হাত দিয়ে কয়েকটা নোট বের করে বলে, টাকা আপনার নিশ্চয়ই শেষ হয়ে গিয়েছে দিদি—এই টাকা কটা রাখুন।

না না, গত মাসে যে টাকা তুমি আমাকে দিয়েছিলে সেই টাকাই তো এখনও শেষ হয়নি!

বলেন কি দিদি! মাত্র তো একশটা টাকা দিয়েছিলাম। সে টাকা এখনো আছে মানে!

খরচ আর কি, দুজন মাত্র তো লোক—

আজকালকার দিনে একজনেরই খেতে তো একশ টাকা লাগে। নিন রাখুন টাকাটা—

না, ভাই। এখন থাক। প্রয়োজন হলে আমিই চেয়ে নেব তোমার কাছ থেকে।

সে আপনি যা চাইবেন তা আমার জানা আছে। নিন ধরুন তো টাকাটা!

যোগানন্দ টাকা কটা একপ্রকার জোর করেই সবিতা দেবীর হাতে গুজে দিয়ে ঘর থেকে বের হয়ে এল।

অন্ধকার গলিপথটা অতিক্রম করে বড় রাস্তায় যখন এসে পড়ল রাত তখন প্রায় সাড়ে নটা বেজে গিয়েছে। ট্রাম বাস প্রাইভেট কার ও জনপ্রবাহে আলো-ঝলকিত কলকাতা শহর তখনও প্রাণপ্রাচুর্যে ঝলমল করছে। ফুটপাত ধরে হাঁটতে হাঁটতে চলে যোগানন্দ।

সবিতাদির স্বামী ও কন্যা বাণীকে খুঁজে বের করতেই হবে। যেমন করেই হোক তাদের খুঁজে বের করে সবিতাদিকে সুখী করতেই হবে। সবিতাদির মুখের দিকে যেন আর চাওয়া যায় না।

আশ্চর্য চরিত্র অনিলবাবুর!

সাবিতাদির মত স্ত্রী পেয়েও তিনি সংসার বেঁধে সুখী হতে পারলেন না। অথচ সাবিতাদির মত স্ত্রী সংসারে কজনের ভাগ্যে লাভ হয়! আর ওদের বিবাহটাও নাকি হয়েছিল পরস্পরে পরস্পরকে ভালবেসে।

প্রফেসার বাপের শিক্ষিত মেয়ে, অনিলবাবু নিজেও উচ্চশিক্ষিত, তবু যে কেন সব এমনি হয়ে গেল!

সুখের সংসারই দুজনে পেতেছিলেন, মফস্বল শহরে এক বেসরকারী কলেজে অধ্যাপকের কাজ নিয়ে গিয়ে। দুটো বছর আনন্দেই কেটেছিল। তারপরই লাগল আগুন।

একটি ছাত্রীকে পড়াতেন, হঠাৎ একদিন সেই ছাত্রীকে নিয়ে হলেন পলাতক অনিলবাবু।

সবিতাদি তখন পাঁচ মাস অন্তঃসত্ত্বা। ছোট মফস্বল শহরে একেবারে ঢি ঢি পড়ে গেল ব্যাপারটা নিয়ে।

লজ্জায় অপমানে সবিতা পালিয়ে এলেন কলকাতায় বাপের কাছে। বাপ শশাঙ্কমোহন সব শুনে স্তম্ভিত হয়ে গেলেন। কেবল বললেন, যাক ভালই করেছিস। রাস্কেল! হাতের কাছে পেলে চাবুক মেরে পিঠের ছাল তুলে নিতাম। আজ থেকে জানবি তোর বিয়েই হয়নি।

কিন্তু বাবা, তার সন্তান যে আমার গর্ভে! দু হাতে মুখ ঢাকলেন সবিতা।

শশাঙ্কমোহন যেন একেবারে স্তম্ভিত হয়ে গেলেন কথাটা শুনে!

তাঁর গলা দিয়ে কয়েকটা মুহূর্ত কোন শব্দই বের হয় না।

তারপর একসময় ধীরে ধীরে বললেন, ঠিক আছে, ঐ তার সন্তান—যে আসছে তাকে নিয়েই তুই বেঁচে থাক। ঐ অপদার্থটার কথা ভুলে যা—ভুলে যা সব কথা।

যাই হোক, সবিতা পিতা শশাঙ্কমোহনের কাছেই থেকে গেলেন। ঐ একমাত্র মেয়ে শশাঙ্কমোহনের। স্ত্রীর আগেই মৃত্যু হয়েছিল। বড় আদরের মেয়ে। কন্যা বাণী জন্মাল।

দশ বছর অনিলের আর কোন সংবাদই পাওয়া গেল না।

সবিতা নিজেও জেনেছিলেন আর হয়তো জীবনে কোনদিনই তার সন্ধান পাওয়া যাবে না।

এমন সময় হঠাৎ একদিন শীতের মধ্যরাত্রে প্রাচীর টপকে অনিল শশাঙ্কমোহনের বাড়িতে এসে প্রবেশ করলেন।

পরিচিত গৃহ।

স্ত্রীর শয়নকক্ষটা চিনে নিতে তাঁর কষ্ট হয়নি। সবিতা একাই তাঁর ঘরে শুয়েছিলেন। পাশের ঘরে দাদুর সঙ্গে ঘুমিয়েছিল বালিকা বাণী, অনিলের মেয়ে।

সবিতার গাতে হাত দিয়ে ঠেলে তুললেন অনিল তাঁকে ঘুম থেকে।

কে!

চুপ। চেঁচিও না—আমি অনিল।

তুমি। বিস্ময়ে যেন বোবা হয়ে গেছেন সবিতা।

হ্যাঁ, আমি। আমি আবার ফিরে এসেছি সবিতা।

তুমি ফিরে এসেছ!

ডায়বিটিসের রোগী শশাঙ্কমোহন। রাত্রে ভাল করে ঘুম হয় না।

তিনি যে ইতিমধ্যে পাশের ঘরে আলো জ্বলা ও চাপা কথাবার্তার আওয়াজে উঠে দরজার সামনে এসে দাঁড়িয়েছেন, দুজনের একজনও তা টের পাননি।

কে রে সাবি? বলতে বলতে শশাঙ্কমোহন ঘরের মধ্যে এসে একেবারে সোজা আচম্‌কা প্রবেশ করেন।

বাবা! একটা আর্ত শব্দ বের হয়ে আসে সবিতার কণ্ঠ হতে।

জামাই অনিলকে চিনতে শশাঙ্কমোহনের কষ্ট হয় না।

রুক্ষস্বরে প্রশ্ন করেন, এ বাড়িতে তুমি কোন্ সাহসে আবার ঢুকেছ? স্কাউন্‌ড্রেল! এখুনি বের হয়ে যাও—

বাবা! আর্তকণ্ঠে ডেকে ওঠেন সবিতা।

না। চরিত্রহীন লম্পটের আমার বাড়িতে কোন প্রবেশাধিকার নেই। যাও বেরিয়ে যাও!

আপনার বাড়িতে থাকতে আমি আসিনি। আমি এসেছি আমার স্ত্রীকে নিয়ে যেতে। ঘুরে দাঁড়িয়ে অনিল বলেন।

তোমার স্ত্রী! কে তোমার স্ত্রী? সবিতার তুমি কেউ নও। তোমার সঙ্গে তার কোন সম্পর্ক নেই।

সম্পর্ক আছে কি না আছে সেটা আপনার বিচারে সাব্যস্ত হবে না!

নিশ্চয়ই—একশ বার হবে। যাও বেরিয়ে যাও।

বেশ তো, সবিতারও যদি সেই মত হয়, নিশ্চয়ই বের হয়ে যাব—সে-ই বলুক।

সবিতা আবার কি বলবে! আমিই বলছি—

বলবার যদি কারো অধিকার থাকে তো একমাত্র আছে সবিতারই। আপনি বলবার কে!

লজ্জা করছে না তোমার? নির্লজ্জ বেহায়া—

সবিতা!

সবিতা কিন্তু নিরুত্তর। পাথরের মতই যেন জমাট বেঁধে গিয়েছে। স্থির বোবা।

সবিতা তোমারও কি তাই মত? তাই যদি হয় তো বল, আমি চলে যাচ্ছি!

তবু সবিতার কোন সাড়া নেই।

বেশ তবে চললাম।

অনিল দরজা পর্যন্ত এগিয়ে যেতেই সবিতা ডাকলেন, দাঁড়াও আসছি। বাণী ঐ ঘরে ঘুমিয়ে আছে, তাকে নিয়ে আসি।

সবিতা! তীক্ষ্ণ কণ্ঠে চিৎকার করে ওঠেন শশাঙ্কমোহন।

ক্ষমা করো বাবা, ওঁর অবাধ্য তো হতে পারব না—

সবিতা, তোর সঙ্গে যে নীচ জঘন্য ব্যবহার করেছে, তার পরেও—

কি করব বাবা, হিন্দুর মেয়ে—স্বামী তাদের যাই হোক না কেন স্ত্রীর তো তাকে ছাড়া অন্য পরিচয় নেই। তাছাড়া ওঁর ভুলকে যদি আমি ক্ষমা না করি, তবে উনি কোথায় দাঁড়াবেন? আমাকে যাবার অনুমতি দাও বাবা—

সবিতা, তুই কি ভুলে গেলি কি জঘন্য অপমান ঐ লোকটা তোকে করেছে, তবু তুই ওর সঙ্গে যাবি?

বাবা!

বেশ যা, কিন্তু এও জেনে যা আজ থেকে এ বাড়ির দরজাও তোর বন্ধ হয়ে গেল। আজ থেকে জানব সবিতা বলে কোন মেয়ে আমার ছিল না।

আজ তুমি আমাকে হয়তো ক্ষমা করতে পারছ না বাবা, কিন্তু একদিন যখন জানবে কতখানি নিরুপায় হয়েই আমাকে আজ তোমার অবাধ্য হয়ে তোমার মনে আঘাত দিয়ে যেতে হল সেদিন হয়তো আমাকে তুমি ক্ষমা করতে পারবে।

শশাঙ্কমোহন আর একটি কথাও না বলে ঘর থেকে বের হয়ে গেলেন।

সবিতা চিত্রার্পিতের মতই দাঁড়িয়েছিলেন।

অনিলও চুপচাপ দাঁড়িয়ে।

সমস্ত ব্যাপারটা যে হঠাৎ ঐভাবে ঘুরে যাবে এ কথা তিনি আদপেই ভাবেননি। ঝোঁকের মাথায়ই তিনি সবিতাকে তাঁর সঙ্গে চলে যাবার জন্য আহ্বান জানিয়েছিলেন। নচেৎ সবিতাকে সঙ্গে করে নিয়ে যাবার কোন মতলবই ছিল না।

তিনি এত রাত্রে সবিতার সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলেন সম্পূর্ণ অন্য কারণে। তিনি এসেছিলেন সবিতাকে ভুলিয়ে ভালিয়ে কিছু টাকাকড়ি চেয়ে নিয়ে আপাততঃ চলে যাবেন মনে করে, কিন্তু ঘটনা দাঁড়িয়ে গেল অন্যরকম।

একটা দীর্ঘশ্বাস রোধ করে সবিতাই কথা বললেন, একটু দাঁড়াও, বাণীকে নিয়ে আসি।

বাণী!

হ্যাঁ, আমাদের মেয়ে।

একটু পরেই ঘুম হতে তুলে বাণীর হাত ধরে সবিতা এ ঘরে ফিরে এসে স্বামীর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে বললেন, চল।

তিনজনে সেই মধ্যরাত্রে জনহীন রাস্তার উপরে এসে দাঁড়ালেন।

॥ পনের ॥

শীতের রাত—নির্জন রাস্তা। শুধু রাস্তার দুধারে ইলেকট্রিকের আলোগুলো নিঃসঙ্গ রাতে যেন এক চোখ মেলে বোবাদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে।

তিনজন হাঁটতে শুরু করে।

মেয়ে বাণী শুধায়, আমরা কোথায় যাচ্ছি মা?

ঘুরিয়ে মেয়ের প্রশ্নের জবাবটা দেন সবিতা, বাবার সঙ্গে যাচ্ছি মা।

বাবা!
হ্যাঁ উনিই তোমার বাবা।
বাণী ঘুরে দাঁড়ায় অনিলের দিকে, সত্যি তুমি **আমার বাবা!**
হ্যাঁ, মা।
তবে তুমি এতদিন আসোনি কেন বাবা?
কাজ ছিল যে মা।

শেষ পর্যন্ত বৌবাজারের ঐ পুরাতন বাড়ির একতলায় এনে অনিল স্ত্রী ও কন্যাকে তুললেন।

ধনী পিতার একমাত্র আদরিণী কন্যা। চিরদিন সুখৈশ্বর্যের মধ্যে পালিতা, তবু একটি কথা বলেননি সবিতা। মুখ বুজে সব কিছুকে স্বীকার করে নিয়েছিলেন।

শুধু যে ঐ জঘন্য পারিপার্শ্বিকের মধ্যেই এনে অনিল ফেলেছিলেন স্ত্রী ও কন্যাকে তাই নয়—সেই সঙ্গে চালিয়েছেন তাঁর অত্যাচার।

এক এক করে সবিতার গায়ের সমস্ত সোনার গহনাগুলো বিক্রি করে সেগুলো নষ্ট করেছেন। এবং যতদিন সবিতার গায়ে গহনা ছিল দু বেলা আহার জুটেছে কিন্তু গহনা শেষ হয়ে যাবার সঙ্গে সঙ্গেই দেখা দিল চরম দারিদ্র্য ও অনাহার।

আর তখন থেকেই মধ্যে মধ্যে অনিল বাড়িতে দীর্ঘদিন ধরে অনুপস্থিত হতে লাগলেন। স্ত্রী ও কন্যার কোন খোঁজই রাখতেন না। অনন্যোপায় হয়ে সবিতা দু-চারটি টিউশনি যোগাড় করে কায়ক্লেশে নিজের ও মেয়ের জীবন চালাতে লাগলেন।

তাতেও বাদ সাধেন অনিল। মাঝে মাঝে ধূমকেতুর মত এসে আবির্ভূত হয়ে সবিতার সামান্য পুঁজি ও সম্বলের ওপরে রাহাজানি করে চলে যান।

নিজের জীবনের কথা ভেবে সবিতা মেয়েকে আর স্কুলে দেননি। বাড়িতে নিজেই লেখাপড়া শেখাতেন।

বাণী ক্রমে বড় হবার সঙ্গে সঙ্গে মা'র কষ্টটা দেখে সর্বদাই মা'র কাছাকাছি থাকত মাকে সুখী করবার জন্য। এবং তার বাপের প্রতি মা'র যে ক্ষমা সেটা তাকে বরাবরই পীড়ন করত।

মা যে বাবার যথেচ্ছচার সহ্য করে নির্বিবাদে শান্ত হয়ে, বাণীর মনে হত সেটাই তার বাপের উচ্ছৃঙ্খলতাকে যেন আরও প্রশ্রয় দিচ্ছে। কিন্তু মা'র মুখের দিকে তাকিয়ে বাপের বিরুদ্ধে দাঁড়াবার মত মনের মধ্যে কোথাও এতটুকু জোর পেত না বাণী।

মায়ের সঙ্গে সঙ্গে নিজেকেও সে বাপের যথেচ্ছাচারিতার সঙ্গে খাপ খাইয়ে নেবার চেষ্টা করত। কিন্তু তা সত্ত্বেও মাঝে মাঝে মন তার বিদ্রোহী হয়ে উঠতে চাইত তার সহজ মনের রুচিবোধের সংঘাতে।

সবিতার জীবনে যোগানন্দের আবির্ভাবটা দৈব যোগাযোগ ছাড়া কিছুই নয়।

বাসায় ফিরতে যোগানন্দের প্রায়ই গভীর রাত হত।

বছর দেড়েক আগে এক শীতের রাত্রে যোগানন্দ পায়ে হেঁটে ফুটপাথ ধরে বাসায় ফিরছিল।

সেরাত্রে একটু বেশী মাত্রাতেই যোগানন্দ মদ্যপান করেছিল। সমস্ত শরীরটা তো হাল্কা

বোধ করছিলই, মাথার মধ্যেও কেমন শূন্যতা বোধ করছিল।

শীতের মধ্যরাত্রি জনহীন রাস্তা। একটা কুকুর পর্যন্ত কোথাও জেগে নেই।

বৌবাজারের কাছাকাছি এসে একটা তিনতলা বাড়ির ঝুল-বারান্দার নিচে আধো আধো অন্ধকারের মধ্যে একটি পুরুষ ও একটি নারীকণ্ঠের কথাবার্তার কিয়দংশ তার কানে যেতেই আপনা হতেই যোগানন্দ থেমে গিয়েছিল।

নারীকণ্ঠে করুণ মিনতির সুর, রাগ করো না, ফিরে চল।

আঃ, কেন বিরক্ত করছ সবিতা! একশবার তো বলছি, যাব না। এখানে এই ফুটপাতেই আমি শুয়ে থাকব। বিরক্তিপূর্ণ খনখনে পুরুষকণ্ঠ।

আর কতকাল এমনি করে আমাকে জ্বালাবে বলতে পার! এখনো কি বুঝতে পারছ না, কোন্ সর্বনাশের পথে তুমি ছুটে চলেছ!

আবার প্যানপ্যানানি শুরু করলে তো?

মেয়ে বড় হয়েছে এখন, সে-ই বা কি ভাববে বল তো! এইজন্যই কি তুমি সে রাত্রে বাবার আশ্রয় থেকে টেনে নিয়ে এসেছিলে?

যাও না—বাপের ঘরে ফিরে গেলেই তো পার। তোমার পায়ে তো আমি শিকল দিয়ে রাখিনি।

ফিরে যাবার মুখ কি তুমি রেখেছ?

কেন, পরপুরুষের সঙ্গে তো আর গৃহত্যাগ করোনি। তবে লজ্জাটা কিসের?

তা যদি তুমি বুঝতে—

থাক থাক, যথেষ্ট হয়েছে। এখানে আর দাঁড়িয়ে থেকে অ্যাকটিং না করে বাসায় ফিরে যাও।

না, তোমাকে আমি না নিয়ে যাব না।

আহা, কি কথাই বললে! এঁদো অন্ধকার ঘর মানুষ সেখানে থাকে! তার চাইতে এই রাস্তা ঢের ভালো।

ঠিক হয়ে উপার্জন করবার চেষ্টা কর, দেখবে সব আবার ঠিক হয়ে যাবে। চেষ্টা করলেই তুমি সব পারবে। আবার তোমার সব হবে।

সে আর হয়না। এ শকুনির পাশা, দান আর ওল্টাবে না।

হবে—সব হবে, মনকে একটু শক্ত কর।

পুরুষকণ্ঠ একেবারে চুপ করে থাকে কিছুক্ষণ।

আবার অনুনয় শোনা যায়, চল!

যাও তুমি—আমি আসছি।

না, আমার সঙ্গে চল। আর বাইরে থেকো না। দেখছ না কি ঠান্ডা বাইরে!

যাও না তুমি, আসছি।

যোগানন্দ এতক্ষণ একটা দোকানের কোলাপ্‌সিবল গেটের পাশে নিজেকে একটু আড়াল করে দাঁড়িয়েছিল, হঠাৎ দেখল অতঃপর নারীমূর্তি পাশের একটা গলিপথে অদৃশ্য হয়ে গেল।

যোগানন্দ এবার এগিয়ে গেল।

যোগানন্দের পায়ের জুতোর রবার সোল থাকায় তার জুতোর শব্দ শোনা যায়নি।

সে সোজা গিয়ে একেবারে উপবিষ্ট পুরুষটির সামনে দাঁড়াল, শুনছেন?

কে! চম্‌কে উপবিষ্ট পুরুষটি উঠে দাঁড়ায়।

ভয় নেই চোরডাকাত নই। একটু মদ্যপান করেছি বটে তবে মাতাল হইনি—অতএব মাতালও নই।

তা এখানে কি চাও?

বিশেষ কিছু না। ঘটনাচক্রে হঠাৎ আপনাদের স্বামী-স্ত্রীর আলাপটা আমি শুনে ফেলেছি।

শুনেছো তো বেশ করেছ। এখন এখান থেকে সরে পড় দেখি।

আহা চটছেন কেন, শুনুনই না। হঠাৎ সংসারের প্রতি অমন বীতশ্রদ্ধ হয়ে উঠলেন কেন?

কে তুমি জানতে পারি? কি মতলব বল তো?

অধীনের নাম যোগানন্দ। আর মতলব সেটা এখনো ভেবেচিন্তে ঠিক করে উঠতে পারিনি। ধরুন—মনে হচ্ছে আপনার যদি কোন কাজে লাগতে পারি তাহলে ব্যাপারটা কেমন হয়?

রসিকতা করছ নাকি!

আদপেই না। কারণ ওটা আমার ধাতে আদপেই সয় না। কিন্তু সেকথা যাক। এইভাবে রাত্রে ঠাণ্ডার মধ্যে এই ফুটপাতে বসে থেকে লাভ কি! যান না ঘরে ফিরে।

না।

আরে বাবা রাগ করছেন কার ওপর বলুন তো? ঐ নিরীহ ভদ্রমহিলাটির ওপরে! বেচারী হয়তো এখনো আপনার আশাপথ চেয়ে দরজা খুলে দাঁড়িয়ে আছেন। যান—বাড়ি যান—

খুব তো উপদেশ দিচ্ছ! জান বাড়ির অবস্থা?

সে কতকটা অনুমানই করে নিয়েছি না জানলেও সঠিক। অভাব অভিযোগ এই তো! আমি আপনাকে না হয় কিছু টাকা ধার দিচ্ছি—পরে সময়মত শোধ দিয়ে দেবেন।

তুমি! তুমি আমাকে টাকা ধাব দেবে?

বিস্ময়ের একটা সীমা আছে, অনিল বিস্ময়ে একেবারে বোবা বনে যায়। এমন কথা তো কেউ গল্প-কাহিনীতেও শোনেনি। একটা অচেনা অজানা লোক—

খুব আশ্চর্য লাগছে কথাটা শুনে, না? তা হবারই কথা। আমি নিজেও মাঝে মাঝে আশ্চর্য হয়ে যে যাই না তা নয়। রাতের বেলার আমিটাকে দিনের বেলার আমিটাই চিনতে পারে না তা পরে তো—যাকগে সে কথা, আপাতত কত দিলে আপনার বর্তমান Crisis টা কাটিয়ে উঠতে পারেন বলুন তো! কি নাম?

আমার নাম অনিল—

অনিল অর্থাৎ বায়ু—বাতাস! তা বেশ নাম। হ্যাঁ বলুন তো অনিলবাবু, আপাতত, কত হলে চলে? তবে হ্যাঁ, একটা অসম্ভব চাইলেও আমি দেব না। ঠিক যতটুকু আপনার বর্তমান পরিচয়ে পাওয়া উচিত তাই দেব। কারণ ফুটো কলসীতে জল ঢালা মানেই অপব্যয়।

লোকটার কথাবার্তায় অনিল উত্তরোত্তর বিস্মিত হচ্ছিল। এবং কৌতুকও বোধ যে করছিল না তা নয়।

অনেক প্রকার লোকই জীবনে অনিল দেখেছে কিন্তু এরকম লোক বড় একটা তার চোখে পড়েনি, যে অচেনা অজানা পথের একটা লোককে অযাচিতভাবে এমনি করে টাকা ধার দিতে পারে সেধে!

কি ভাবছেন? বিশ্বাস হচ্ছে না বুঝি? তা বিশ্বাস করাটাও একটু শক্ত বৈকি।

একশ টাকা দিতে পার?

নিশ্চয়ই। দাঁড়ান। যোগানন্দ পার্স বের করে।

ঠিক এমনি সময় পশ্চাৎ হতে পূর্ব নারীকণ্ঠ প্রতিবাদ জানল, না—টাকা দেবেন না।

নারী সবিতা। সবিতা যায়নি, গলির মাথাতেই দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করতে করতে উভয়ের সব কথা শুনছিল।

সবিতা!

না—টাকা তুমি নিতে পারবে না।

আঃ আপনি আবার এর মধ্যে এলেন কেন? যোগানন্দ বাধা দেয়।

চলে এস তুমি। সবিতা স্বামীর দিকে তাকিয়ে বলে যোগানন্দর কথার কোন জবাব না দিয়ে।

বেশ, চলুন অনিলবাবু আপনাদের বাড়িতেই যাওয়া যাক। অনেক রাত হয়ে গিয়েছে, রাস্তায় থাকা আর উচিত হবে না। হঠাৎ কোন লাল পাগড়ীর উদয় হয় তো আমাদের তিনজনের কাউকে সে বিশ্বাস করবে না!

তাই চল। অনিল বলে।

কি জানি কেন সবিতা আর কোন প্রতিবাদ জানায় না। তিনজনে এসে অন্ধকার বাড়ির মধ্যে প্রবেশ করে।

॥ ষোল ॥

হ্যারিকেনের ম্লান আলোয় সবিতার মুখের দিকে তাকিয়ে যোগানন্দ যেন মুগ্ধ হয়ে যায়। যদিও নেশাটা তখনও মস্তিষ্কের স্নায়ুকোষে চনচন করছে।

যোগানন্দ ঘরে ঢুকতেই সবিতা মদের গন্ধ পেয়ে একটু গম্ভীর হয়ে গিয়েছিল।

কিন্তু যোগানন্দর কথায় সেটা কেটে গেল।

দিদি! কেন যেন আপনাকে দিদি বলতেই ইচ্ছে করছে। আপনি নিশ্চয়ই মদের গন্ধ পেয়েছেন। মদ আমি খেয়েছি দিদি, অস্বীকার করব না। কিন্তু বিশ্বাস করতে পারেন আপনার সঙ্গে আজ রাত্রে দেখা হবে জানলে মদ নিশ্চয়ই আমি খেতাম না। তবে মদ খেলেও জানবেন মাতলামি আমি করি না।

কি জানি কেন, সবিতারও প্রথম হতেই যোগানন্দকে ভাল লাগে। তার সমস্ত অনুভূতি যেন বলে, লোকটা আর যাই হোক শয়তান বা দুষ্ট প্রকৃতির নয়। তাই আলাপ জমতে দেরি হয় না। যোগানন্দ সহজেই দু'দণ্ডে সবিতার মনে একটি স্থায়ী আসন করে নয়।

সে রাত্রে আর যোগানন্দর বিদায় নেওয়া হয় না।

রাত্রি ভোর হলে চা খেয়ে সে বিদায় নেয়। এবং যাবার সময় সবিতার অনিচ্ছা সত্ত্বেও অনিলের হাতে সত্যিই শ'খানেক টাকা গুঁজে দিয়ে যায়।

কিন্তু যে উচ্ছৃঙ্খলতার বীজ অনিলের রক্তের মধ্যে বাসা বেঁধেছিল সেই উচ্ছৃঙ্খলতার পথেই সেই একশত টাকা উবে যেতে পাঁচ দিনও লাগল না।

তারপর যে অভাব সেই অভাব।

আবার নেয় টাকা অনিল যোগানন্দর কাছ থেকে এবং আবার তা ফুরিয়ে যায় একদিনে। ঐভাবে দু'তিনবার চলে।

উপন্যাসের কল্পিত এক কাহিনীর মতই যেন যোগানন্দর আবির্ভাব সবিতা ও অনিলের জীবনে।

সেবারে কিছু দিন পরে আবার যখন এক রাত্রে ঘটল যোগানন্দর আবির্ভাব, অনিল বাসায় ছিল না।

সবিতাই যোগানন্দকে বসতে বললে বসুন, এসেছেন যখন যাবেন কেন?

তা বসছি। কিন্তু ঐ সম্বোধন, আপনি আজ্ঞেটা ছাড়তে হবে। দিদি বলে যখন ডেকেছি সে দাবিটা এই অধম জনের রাখতে হবে এবং শুধু রাখাই নয়, সেই সঙ্গে বড় বোন ছোট ভাইকে যেমন তুমি বলে ডাকে তেমনি বলবে তুমি এবার থেকে।

সবিতা হেসে বলে, তাই হবে।

তাই হবে না, বলুন তুমি!

বেশ বলব।

আঃ সত্যি কি যে আনন্দ পেলাম দিদি। আর বুঝতে পারলাম ভগবান এখনো এই হতভাগ্যটাকে একবারে ভোলেননি।

বোস, চা করে আনি।

চা নিশ্চয়ই হবে, আপনার হাতের চা না খেয়ে নড়ছিই না। কিন্তু অনিলবাবুকে দেখছি না কোথায়ও, বেরিয়েছেন বুঝি?

সবিতা চুপ করে থাকে।

দিদি!

সে নেই।

নেই?

দশ দিন বাড়িতে আসেন না।

সে কি!

ও আর এমন কি! সবিতা হাসে।

তাই তো—তাহলে—যোগানন্দ বলে।

কি ভাই?

একা একা আছেন—

অভ্যাস হয়ে গিয়েছে।

তা যেন হল কিন্তু আপনাদের চলছে কি করে? কিছু মনে করবেন না দিদি—

যেমন করে আগে চলছিল। দুটো টিউশনি করি।

কিন্তু দুজন স্ত্রীলোক একা একা এই বাড়িতে ভয় করে না তো দিদি?

এমন সময় হঠাৎ অনিল ফিরে এল, হাতে একটা পোঁটলা।

এই যে যোগানন্দ! কতক্ষণ? অনিল প্রশ্ন করে।

এই কিছুক্ষণ। কিন্তু এ দশ দিন ডুব দিয়েছিলে কোথায়? যোগানন্দ বলে।

বর্ধমানে দেশের বাড়িতে গিয়েছিলাম। অনিল বললে।

হঠাৎ বর্ধমানে দেশের বাড়িতে? প্রশ্ন করে এবারে সবিতা।

BanglaBook.org

হ্যাঁ, অনেক দিন যাইনি তাই দেখতে গিয়েছিলাম একবার। যা দেখলাম, বাড়িঘর অবশ্য ভেঙে গিয়েছে, কাঁচা টিনের বাড়ি—একটা পাকা ঘর ছিল, সেইটা কোনমতে টিকে আছে।

তাহলে এ বাড়ি ছেড়ে সেখানে গিয়ে থাকলেই তো হয়! কিন্তু ঐ বাড়ির কথা তো কোন দিনও তুমি আমাকে বলনি? সবিতা বলে।

বলবার মত নয় বলেই বলিনি। সে যে এ বাড়ির থেকেও এক ডিগ্রী—

তা হোক, তবু তো নিজের ভিটে—পরের ভাঙা বাড়িতে ভাড়া টানার চাইতে নিজের পড়ো ভাঙা ভিটেও ঢের সুখের, ঢের সম্মানের। চল আমরা কালই সেখানে যাব—

তাই যাও না অনিল—যোগানন্দ বলে।

ক্ষেপেছ তুমি যোগনন্দ! সেখানে কোথায় যাবে? কথাটা শুরুতেই চাপা দিয়ে দেয় অনিল।

কেন, একটা ঘর তো আছে বলছিলে! সবিতা বলে।

থাকাটাই তো কেবল সব নয়, সেখানকার ম্যালেরিয়া—

তা হোক—

না না, ওখানে যাওয়া হবে না। অনিল বলে ওঠে।

যোগানন্দ উঠে দাঁড়ায় ঐ সময়, অনিল তার সঙ্গে সঙ্গে বাইরে যায় এবং যোগানন্দর কাছ থেকে কিছু টাকা চেয়ে নেয়।

যোগানন্দ টাকা দিতে গিয়ে এবারে বলে, এমনি করে বার বার পরের জমি থেকে মাটি কেটে এনে নিজের ঘরের গর্ত তো ভরাট করতে পারবে না অনিল। যা হোক একটা কিছু করো না।

ঘাবড়াও মাৎ ভায়া! তোমার দেনা এবার বোধ হয় শিগগিরি শোধ করে দিতে পারব আর সব অভাবও ঘুচবে।

কি রকম?

দেখ না অভাব বাধ হয় এবার সত্যিই ঘুচল!

ভাল। যোগানন্দ মৃদুকণ্ঠে বলে।

ভাল নয় হে, সত্যিই দেখো কেমন বরাতের চাকাটা ঘুরে যায়।

অনিলের চোখেমুখে একটা আনন্দোজ্জ্বল দীপ্তি ঝলমল করে।

যোগানন্দ একটু বেশ বিস্ময়ই অনুভব করে। বলে, ব্যাপার কি বল তো সত্যি করে! লটারিতে টাকা পাচ্ছ, না কোন গুপ্তধনটন আবিষ্কার করে ফেলেছে?

সে যাই হোক, সময়ে সবই জানবে।

সবিতাকে লুকিয়ে অনিল সে রাত্রে যোগানন্দর কাছ হতে টাকা নিলেও সবিতার নজর এড়ায়নি। যোগানন্দ যাবার পর সবিতা স্বামীকে বলে, আবার টাকা নিলে যোগানন্দর কাছ হতে?

ভয় নেই, ভয় নেই—এবারে সব শোধ করে দেব এক কিস্তিতে।

সব এক কিস্তিতে শোধ করে দেবে?

হ্যাঁ।

কেমন করে শুনি?

দেখই না! অনিল রহস্যপূর্ণ হাসি হাসতে থাকে।

BanglaBook.org

এর পর কয়েকটা দিন অনিল আর কোথাও বের হয় না। এবং কোথাও বের হলেও ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই আবার ফিরে আসে। দিবারাত্র ঘরেই থাকে আর মধ্যে মধ্যে একটা লাল-মলাট-বাঁধানো জীর্ণ খাতার পাতা উল্টে পাল্টে পড়ে গভীর মনোযোগ সহকারে।

সবিতার কৌতূহল হল ব্যাপারটা কি জানবার জন্য কিন্তু সুযোগ পায় না।

সর্বদা যেন যখের ধনের মতই অনিল লাল মলাটওয়ালা খাতাটা ও পোঁটলাটা আগলে রেখেছে।

শুধু সবিতাই নয়, এবারে বাণীও বাপের ওপরে সদাসতর্ক দৃষ্টি রাখে।

সে এবারে ঠিক করেছে বাপকে কিছুতেই নজরছাড়া করবেনা, কারণ তারও মনে একটা সন্দেহ জেগেছে। নিশ্চয়ই আবার তার বাপের মাথায় কোন দুরভিসন্ধি বাসা বেঁধেছে!

হঠাৎ একদিন অনিলের অনুপস্থিতির সুযোগে সবিতা পোঁটলা খুলে দেখে তার মধ্যে নেকড়া জড়ানো আছে একটি সোনার কঙ্কন, কিন্তু ব্যাপারটা ভাল করে বুঝবার আগেই হঠাৎ আবার অনিল ফিরে আসায় পোঁটলাটা যথাস্থানে রেখে দিতে বাধ্য হয় সবিতা। এবং পরদিনই প্রাতে ঘুম থেকে উঠে সবিতা দেখল তার স্বামী ও বাণী দুজনের একজনও ঘরে নেই।

প্রথমটায় সবিতা ভেবেছিল তারা বোধ হয় দুজনে কোথাও বের হয়েছে, কিন্তু দুপুর গড়িয়ে সন্ধ্যা হল তখনও দুজনের একজনও ফিরল না দেখে সবিতা রীতিমত চিন্তিত হয়ে ওঠে। ঠিক ঐ সময় হঠাৎ তার রামায়ণটার ভিতরে বাণীর একটা চিঠি আবিষ্কার করে।

মা, বাবার সঙ্গে সঙ্গে চললাম—বাণী।

বুঝল সবিতা, দুজনেই একসঙ্গে গিয়েছে।

অন্যান্য বারের চাইতে এবারে সবিতার চিন্তা হল বেশী, কারণ সঙ্গে বয়স্থা মেয়ে বাণী। এবং বাণী তার পিতার প্রতি বিশেষ সন্তুষ্ট নয়, জানে সবিতা।

দুর্ভাবনায় দুশ্চিন্তায় দু'রাত্রি কেটে গেল। তৃতীয় দিন সন্ধ্যায় এল যোগানন্দ।

সবিতা একাকী ঘরের মধ্যে চুপটি করে আলো জ্বেলে বসে ছিল।

যোগানন্দ সবিতাকে ঐ অবস্থায় দেখে শুধাল কি ব্যাপার দিদি, চুপটি করে একা বসে যে! মেয়ে কোথায়? অনিলবাবু বুঝি আবার চলে গেছেন?

এস যোগেন। সবিতা যোগানন্দকে আহ্বান জানাল। এবং ধীরে ধীরে সব বৃত্তান্ত খুলে বলল।

তাই তো! মেয়েও তার বাপের সঙ্গে গেল? তা মেয়ে যখন তার বাপের সঙ্গেই গিয়েছে—

নিশ্চিন্ত থাকতে পারতাম, কিন্তু আমার তা মনে হয় না ভাই। ওকে তো আমি চিনি—আর মেয়ে বাপের প্রতি কোনদিনই প্রসন্ন নয়।

ভাবছেন কেন, হয়তো একপ্রকার ভালই হল!

না যোগেন, সে যদি স্বেচ্ছায় মেয়েকে সঙ্গে নিয়ে যেত ভাবতাম না কিন্তু এ তো তা নয়, তাহলে তো—

কিন্তু আমারও মনে হয় আপনার এই চিন্তার কিছু নেই।

চিন্তার নেই!

না।

সবিতা চুপ করে থাকে।

সে যাক, এভাবে এখন তো আর একা একা এখানে আপনার থাকা চলতে পারে না দিদি।

তা ছাড়া আর উপায় কি বল? যাব কোথায়?

যদি আপত্তি না থাকে তো আমার ওখানে চলুন না দিদি!

তা হয় না যোগানন্দ।

কেন?

সে তুমি বুঝবে না। তা ছাড়া এমনিতেই তো তোমার ঋণ এ জীবনে কোনদিন আমরা শোধ করতে পারব না। তার উপর আর ঋণ বাড়াতে চাই না।

ও কথা বলে আর লজ্জা দেবেন না দিদি। আজকের দিনে সংসারে পরস্পরের মধ্যে প্রীতির সম্পর্ক বলে কোন বস্তুই নেই, এমনিভাবে আমরা সমাজের মধ্যে পরস্পর হতে পরস্পর পাশাপাশি থেকেও বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছি। জ্ঞান হওয়া অবধি সংসারে বা সমাজের মধ্যে একটি মাত্র সম্পর্কই সকলের মধ্যে দেখে আসছি—স্বার্থের সম্পর্ক। আমাদের সম্পর্কের মধ্যেও সেই সম্পর্কটা টেনে এনে সেটাকে ছোট করে দেবেন না, এই আমার অনুরোধ।

যোগানন্দর মুখে কথাগুলো শুনে সবিতা মুগ্ধ হয়ে যায়।

কদিনেরই বা পরিচয় ঐ যুবকটির সঙ্গে তাদের।

সম্পূর্ণ অপরিচিত, পথের লোক—নিজে যে সবিতা একটু বিব্রতও বোধ করে না তা নয়।

না না—দুঃখ করো না ভাই। তোমাকে আমি অন্তত সেরকম কখনো ভাবিনি। সবিতা বললে, তোমার সঙ্গে পরিচয়টা জীবনে অক্ষয়ই হয়ে থাক, ধূলোর ওপর টেনে এনে তাকে আমি তো ছোট করতে পারব না ভাই। আজকের দিনে তুমিই তো আমার একমাত্র ভরসা। কিন্তু সেজন্য নয়, এখন হতে অন্য কোথায়ও যাবার আমার সত্যিই বাধা আছে—

বেশ, তবে আর কি বলব বলুন।

পরের দিনই সকালে যোগানন্দ তার দারোয়ান প্রৌঢ় মহাবীর ও একজন রাতদিনের ঝি সবিতাকে সর্বদা রক্ষণাবেক্ষণের জন্য পাঠিয়ে দিল। এবং নিজেও মধ্যে মধ্যে এসে সবিতার খোঁজ নিয়ে যেতে লাগল।

॥ সতের ॥

বাণীর হাত ধরে টানতে টানতে কক্ষের মধ্যে নিয়ে এল অনিল।

মাসখানেক একেবারে ক্ষৌরকর্ম না করায় একমুখ দাড়িগোঁফ গজিয়েছে আজ অনিলের মুখে। তাকে আজ আর চেনবার সত্যিই উপায় নেই।

ঘরের কোণে প্রদীপটা জ্বলছে মিটমিট করে।

প্রদীপের স্বল্প আলোছায়া অপরিসর ছোট ইট-বের করা ঘরের জীর্ণ দেওয়ালে যেন রহস্যের আলপনা বুনে চলেছে।

হতচ্ছাড়া মেয়ে, তোকে ইচ্ছে করছে গলা টিপে শেষ করে ফেলি! রাগতকণ্ঠে অনিল বলে।

বাণী বাপের কথায় কোন প্রতিবাদ জানায় না। চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকে।

বাণীকে নীরব থাকতে দেখে কি জানি কেন অনিলের রাগটা বোধ হয় নরম হয়ে আসে। মৃদু চাপাকণ্ঠে এবারে বলে, কতবার না বলেছি ঝোপজঙ্গল সাপে ভর্তি, যখন তখন অমন করে ঘরের বাইরে যাস না!

তুমি তো সারাটা দিন জঙ্গলের মধ্যে ঘুরে বেড়াও! তোমাকে বুঝি সাপে কাটতে পারে না?

আমার আর তোর কথা এক হল!

কেন এক নয়? তার চেয়ে চল না বাবা, কি হবে মিথ্যে অমন করে আর মাটি খুঁড়ে? আমরা ফিরে যাই।

ফিরে যাব? কখনোই না। জানিস তুই, কেন আমি এখানে এসেছি?

সবটা না বুঝলেও কিছু কিছু বুঝতে পেরেছি বৈকি। স্মিতকণ্ঠে জবাব দেয় বাণী।

তুই কিছু জানিস না। জানিস যেজন্য এসেছি তা যদি পাই তাহলে এ জীবনে আমাদের আর কোন অভাবই থাকবেনা! রাজার হালে পায়ের উপর পা দিয়ে বসে-বসেই বাকি জীবনটা কাটিয়ে দিতে পারব!

ঐসব কথায় তুমি বিশ্বাস কর বাবা? পুরানো রাজবাড়ি জমিদারবাড়ি সম্পর্কে ওরকম অনেক কথাই রটে! যখের ধন সত্যি কখনও থাকে! ও গল্পই!

হ্যাঁ, তুই তো সব জেনে একেবারে বসে আছিস। খিঁচিয়ে উঠল অনিল।

এই এক মাস ধরে তো তুমি কম খুঁজলে না, পেলে কিছুর সন্ধান? বল?

পাইনি এখনো ঠিক, তবে পাবই। নিশ্চয়ই আমি খুঁজে বের করব। আর খুঁজে না পাওয়া পর্যন্ত এখান থেকে এক পা আমি নড়ছি না। খুঁজে আমকে বের করতেই হবে।

সত্যি, বাপের জন্য দুঃখ হয় বাণীর।

মানুষের সমস্ত শিক্ষা ও রুচিকে কি ভাবে যে এক এক সময় তার দুর্ভাগ্য আচ্ছন্ন করে ভাবতেও বিস্ময় লাগে। নইলে তার শিক্ষিত বাপ দুর্ভাগ্যের টানে কোথায় এসে দাঁড়িয়েছে আজ!

বাণী মুখে স্বীকার না করলেও তার মনের কোণার তার উচ্ছৃঙ্খল পথভ্রষ্ট বাপের জন্য যে একটা দর্বলতা ছিল, সেটাই সে বুঝতে পারত না।

দশ বৎসর বয়সের সময় সে তার বাপকে প্রথম দেখে।

মায়ের সঙ্গে তার সর্বপ্রকার আলোচনাই হত, একমাত্র বাপের সম্পর্কে কখনো কোন আলোচনা হত না।

মা যে কতকটা ইচ্ছা করেই একান্তভাবে তার বাপের প্রসঙ্গ এড়িয়ে যেত, ঐ অল্প বয়সেও বাণী সেটা বুঝতে পেরেছিল। কারণ সাধারণের চাইতে ঐ অল্প বয়সেই বাণীর বুদ্ধিটা ছিল একটু বেশ প্রখরই।

এবং মা তার বাপের প্রসঙ্গ উথাপন করলেও মার মনের কোণে যে তার স্বামী সম্পর্কে একটা বিশেষ দর্বলতা আছে, সেটাও কিন্তু বুঝতে বাণীর কষ্ট হয়নি।

কতদিন তার চোখে পড়েছে মা তার নিভৃতে স্বামীর ফটোখানির দিকে নিশ্চল দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে।

তারপর বাপের সঙ্গে যখন এসে সেই বৌবাজারের ভাঙা অন্ধকার বাড়িতে ওরা উঠল

একদিন তার হাত ধরে, তখন থেকেই কেন না-জানি ঐ বিচিত্র চরিত্রের লোকটির ওপরে এক অজ্ঞাত আকর্ষণ অনুভব করেছে সে।

একে একে তার চোখের সামনেই দেখেছে মায়ের গায়ের গহনাগুলো বেচে বাপ তার নষ্ট করেছে, তা সত্ত্বেও মায়ের নির্বিকার ক্ষমা মধ্যে মধ্যে বাণীকে বাপের প্রতি বিদ্রোহী করে তুললেও সেই সঙ্গে লোকটার প্রতি জেগেছে মনের কোথায় যেন একটা সহানুভূতি, অনুকম্পা।

মধ্যে মধ্যে বাপ তাকে পড়িয়েছে, সেই সময় বাণী দেখেছে লোকটির জ্ঞান কত গভীর, কত জানাশোনা!

তৎসত্ত্বেও জগতের সব কিছুর ওপরে অসীম একটা উপেক্ষা। ছন্নছাড়া জীবন—স্বভাবের উচ্ছৃঙ্খলতা।

তার মায়ের মত স্ত্রী পেয়েও যে লোকটা সুখী হয়ে ঘর বাঁধতে পারল না, তার জন্য মনে মনে বাণী দুঃখ বোধ করেছে।

এবং সেটাই বুঝতে পারেনি যে, ঐ দুঃখবোধের ভিতর দিয়েই ধীরে ধীরে কখন মনের মধ্যে জেগেছে তার সহানুভূতি, পথভ্রষ্ট সৃষ্টিছাড়া বাপের ওপরে জন্মেছে একটা আকর্ষণ, যার টানে সে অনায়াসেই সেদিন মধ্যরাত্রে পলায়নপর পিতার পিছু পিছু ঘর থেকে বের হয়ে তাকে অনুসরণ করেছিল।

তারপর বাপ টের পেয়ে তাকে ফিরে যাবার জন্য তার অনুরোধ, ভয়প্রদর্শন, রাগ কিছুই তাকে নিবৃত্ত করতে পারেনি সেদিন। এবং এখানে এসেও বাপের গালাগালি রাগ সব কিছুকে উপেক্ষা করে এই বনজঙ্গলের মধ্যে পোড়ো বাড়িতে পড়ে আছে।

অনিলও প্রথমটায় তাকে না জানিয়ে অকস্মাৎ চোরের মত গোপনে গোপনে বাণী তার পিছু নেওয়ায় বিশেষ রকম ক্ষেপে গিয়েছিল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত মেয়েকে সঙ্গে করে বহরমপুর না নিয়ে এসে পারেনি।

প্রথমে সে জানতে পারে বাণী তাকে অনুসরণ করে এসেছে স্টেশনে পৌঁছে।

শেষ পর্যন্ত অবশ্য একটা চেঁচামেচি ও কেলেঙ্কারির ভয়েই মেয়েকে সঙ্গে নিয়ে আসতে অনিল একপ্রকার বাধ্য হয়েছিল বললেও অত্যুক্তি হয় না।

কিন্তু রাগটা অনিলের দুদিনের বেশী থাকে না।

বাণী সঙ্গে আসতে তার কিছু সুবিধাও হয়েছিল। নিজ হাত পুড়িয়ে আর রান্না করে খেতে হয়নি।

প্রথম প্রথম জঙ্গলের মধ্যে পোড়ো বাড়িতে থাকতে বাণীর খুবই খারাপ লাগছিল, কিন্তু বাপের একান্ত ঘনিষ্ঠতার মধ্যে এসে বাপের মধ্যে একটা স্নেহ-কোমল অথচ দুর্দান্ত বেপরোয়া মন আবিষ্কার করে কেমন একটা মায়াও পড়ে গিয়েছিল এই এক মাসের মধ্যেই তার মনে।

অনিল সারাটা দিন জঙ্গলের মধ্যে ঘুরে ঘুরে বেড়ায়।

একটা লোহার শাবল নিয়ে এখানে ওখানে মাটি খোঁড়ে বা জঙ্গল কেটে সাফ করে আর রাত্রে একটা লাল মলাট দেওয়া খাতার জীর্ণ মলিন পাতা খুলে প্রদীপের আলোয় উল্টে উল্টে গভীর মনোযোগের সঙ্গে পড়ে।

কলকাতাতেও এবারে বাণী বাবাকে ঐ খাতাটা পড়তে ও সযত্নে আগলে বেড়াতে দেখেছে।

কৌতূহল হয়েছে খাতাটার মধ্যে কি আছে জানবার জন্য, কিন্তু সুযোগ বা সুবিধা পায়নি কলকাতাতে।

এখানে আসবার পর একদিন দ্বিপ্রহরে বাপের অনুপস্থিতিতে চুরি করে গোপনে খাতাটার কিছু অংশ পড়েছে।

জীর্ণ লালচে পাতায় কার যেন ডায়রী লেখা আছে।

সাল তারিখ দিয়ে নিয়মিত ডায়রী নয়। এলোমেলো অসংলগ্ন ভাবে লেখা ঠিক ডায়রী নয়, যেন কতকটা আত্মজীবনী শ্যামসুন্দর চক্রবর্তীর।

মা'র কাছেই শুনেছিল বাণী একদিন, তার পিতামহের নাম ছিল শ্যামসুন্দর চক্রবর্তী।

এবং প্রথম হতেই তিনি ছিলেন সন্ন্যাসী প্রকৃতির মানুষ। সংসারের প্রতি তাঁর কোন আকর্ষণ ছিল না। এবং দৈবচক্রে আকস্মিক দুর্ঘটনায় সে রাত্রে তার পিতামহী মৃণ্ময়ী দেবী নিহত হন সেই রাত্রেই তার পিতামহ শ্যামসুন্দর চক্রবর্তী সেই যে নিরুদ্দেশ হয়ে গেলেন, আর কোন সংবাদই পরবর্তীকালে পাওয়া যায়নি।

তিনি আজও জীবিত কি মৃত কেউ তা জানে না।

এবং পিতৃমাতৃহীন তার বাপ মানুষ হন তাঁর দিদিমার কাছে মামার বাড়িতেই।

অত্যন্ত আত্মভিমানী পুরুষ ছিলেন তাঁর বাপ। বছর কুড়ি বয়স যখন তাঁর, সেই সময় একদিন তাঁর চেয়ে বয়সে ছোট মামার সঙ্গে কি কথায় রাগারাগি হওয়ায় সেই যে একবস্ত্রে মাতামহের গৃহ ছেড়ে চলে আসেন, আর ওমুখো এ জীবনে হননি।

একটা মফস্বল শহরে গিয়ে সেখানকার কলেজে পড়ে টিউশনি করে বি. এ. পাস করে কলকাতায় এসে এম. এ. পড়তে শুরু করেন। সেই সময়ই তার মাতামহের সঙ্গে ও তার মার সঙ্গে আলাপ।

॥ আঠারো ॥

কিরীটী বামদেবের সঙ্গে বহরমপুর যায়নি ইচ্ছা করেই। বহরমপুরের রত্নমঞ্জিল ও সুবর্ণকঙ্কনকে কেন্দ্র করে যে, একটা রহস্য ঘনীভূত হয়ে উঠেছে ব্যাপারটা কিরীটীর কাছে আর অজ্ঞাত ছিল না।

আগাগোড়া গত ক'দিনের ঘটনাগুলো পর্যালোচনা করলে বুঝতে কষ্ট হয় না সব কিছুর মূলে ঐ রত্নমঞ্জিল।

কঙ্কনটা চুরি করার চেষ্টা।

রানার রত্নমঞ্জিলটা ক্রয় করবার বিশেষ আগ্রহ এবং অসম্ভব মূল্যে স্বীকৃত হয়ে বায়না দেওয়া, তারপর কোন এক অপরিচিতের পত্র মারফৎ সাবধান বাণী রত্নমঞ্জিল না বিক্রয় করবার জন্য—সব কিছু জড়িয়ে একটি রহস্যই যেন দানা বেঁধে উঠছিল সব কিছুর মধ্যে।

ঐ রত্নমঞ্জিল!

কিরীটী বুঝেছিল তাকে ঐ রহসের কিনারা করতে হলে ভেবেচিন্তে বুঝে অত্যন্ত সাবধানে মাটি বুঝে অতঃপর প্রতিটি পা ফেলে ফেলে এগুতে হবে।

এবং যতটা সম্ভব নিজেকে আড়ালে রেখে কাজ করতে হবে। যেন কোন মতেই কারো না সন্দেহ জাগে এতটুকু যে কিরীটী রত্নমঞ্জিলের ব্যাপারে জড়িয়ে পড়েছে।

কিরীটী আড়াল থেকে কাজ করবে একপ্রকার স্থির করেছিল, যেদিন বামদেবের ওখান থেকে নিমন্ত্রণ সেরে ফিরবার পথে সে অনুসৃত হয়েছিল।

তাই পরের দিন যখন তার বন্ধু অফিসারকে বলে লালবাজার থেকে দত্ত অ্যাণ্ড সাহার অফিসে রানার সামনে একটা টোপ ফেলবার ব্যবস্থা করেছিল, নিজে তখন চুপ করে বসে থাকেনি।

কিছু পরেই সাধারণ এক ভাটিয়ার ছদ্মবেশ ধারণ করে বাড়ি থেকে বের হয়ে বড় রাস্তার উপরে এসে ভাবছে কোন্ পথে এখন অগ্রসর হওয়া যায়, হঠাৎ পাশ দিয়ে তার পরিচিত একটি ট্যাক্সিকে যেতে দেখে হাত-ইশারায় কিরীটী ট্যাক্সিটা থামাল।

ট্যাক্সি ড্রাইভার পরমেশ্বর কিরীটীর বিশেষ পরিচিত হলেও ছদ্মবেশধারী কিরীটীকে কিন্তু চিনতে পারে না প্রথমটায়।

ট্যাক্সিতে চেপে কিরীটী তাকে নির্দেশ দিতেই ট্যাক্সি ছুটল।

নির্দিষ্ট জায়গায় এসে ট্যাক্সিটা থামিয়ে পরমেশ্বর ট্যাক্সির দরজা খুলে দিতে যেমন উদ্যত হয়েছে কিরীটী বাধা দিল, এখন নামব না, দরজা বন্ধ করে দাও পরমেশ্বর।

সঙ্গে সঙ্গে চমকে ফিরে তাকায় পরমেশ্বর পশ্চাতে আরোহীর দিকে।

কি চিনতে পারছ না? কিরীটী বললে।

এতক্ষণে কিরীটীর স্বাভাবিক কণ্ঠস্বরে পরমেশ্বর তাকে চিনতে পারে।

হেসে বলে, স্যার আপনি! ইস একদম চিনতে পারিনি স্যার!

সঙ্গে সঙ্গেই পরমেশ্বর বুঝতে পারে কোন গোপন তদন্তের ব্যাপারে নিশ্চয়ই কারো গতিবিধির উপর নজর রাখবার জন্য কিরীটীর এই ছদ্মবেশে অভিসার।

পরমেশ্বর রাস্তার একধারে গাড়িটা পার্ক করে রাখে। কিছুক্ষণ গাড়ির মধ্যে অপেক্ষা করে কিরীটী গাড়ি থেকে নামল। পরমেশ্বরকে অপেক্ষা করবার নির্দেশ দিয়ে এগিয়ে গেল সামনের বড় বাড়িটার গেটের দিকে।

মস্তবড় পাঁচতলা একটা বাড়ি। অসংখ্য অফিস সেই বাড়িটার ঘরে ঘরে। এবং তখনও সেখানে কর্মব্যস্ততার একটা চাঞ্চল্য।

সিঁড়ি বেয়ে তিনতলায় দত্ত অ্যান্ড সাহার চেম্বারের দিকে এগিয়ে চলে কিরীটী একসময়।

এবং চেম্বারের সুইং ডোরের অল্প দূরে দাঁড়িয়ে থাকে অপেক্ষা করে।

প্রায় কুড়ি মিনিট বাদে কিরীটী লক্ষ্য করে একজন হৃষ্টপুষ্ট ভাটিয়া লিফটে চেপে তিনতলায় এসে উঠল, সঙ্গে তার ঢ্যাঙামত একজন লোক, হাতে তার মার্কোভিচের একটা টিন ও ওষ্ঠে ধৃত সদ্য-জ্বালানো একটি সিগারেট।

আমার আর ভিতরে গিয়ে কি হবে শেঠ! ঢ্যাঙা লোকটি ভাটিয়াকে বলে।

তাহলে তুমি গাড়িতেই গিয়ে অপেক্ষা কর পিয়ারী। দেখি শালা দত্ত আবার ডাকল কেন?

কিরীটীর মনে হয় ঐ পিয়ারী লোকটা তার একেবারে অপরিচিত নয়।

তাই বসি গে। তুমি তাহলে কাজ সেরে এস। পিয়ারী নামধারী ঢ্যাঙা লোকটা সিঁড়ি দিয়ে নেমে গেল।

ভাটিয়া দত্ত-সাহার চেম্বারে ঢুকতে যাবে সুইংডোর ঠেলে, একজন ভদ্রলোক বের হয়ে এল মুখোমুখি হতেই বললে, রানা যে, কি খবর?

একটু কাজ আছে ভাই মুখুজ্জে।

ও।

রানা ভিতরে প্রবেশ করল এবং মুখুজ্জে চলে গেল।

তাহলে উনিই সেই স্বনামধন্য শেঠ রতনলাল রানা! কিরীটী মনে মনে ভাবে।

রত্নমঞ্জিল বায়না করেছে পঞ্চান্ন হাজার টাকায় কিনবার জন্য ও-ই!

ভাগ্য সুপ্রসন্ন দেখা যাচ্ছে—লোকটির দেখা পাওয়া গেল!

কিরীটী অতঃপর সেখানে দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়েই তার ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা ছকে ফেলে।

রতনলাল রানার সঙ্গে পিয়ারী!

কিরীটীর মনে পড়ল হঠাৎ ভাবতে ভাবতে, গোপন নোটবুকে তার ঐ পিয়ারী নামটি অনেকদিন আগে থেকেই টোকা আছে।

ক্রমশ সবই মনে পড়ে।

লোকটা গতিবিধি যে কেবল অত্যন্ত সন্দেহজনক শুধু তাই নয়, বছর খানেক আগে একবার ও মাসছয়েক আগে আর একবার দুটো জটিল নোট জাল ও ওপিয়াম স্মাগলিংয়ের কেসের সঙ্গে ঐ নামটি বেশ ঘনিষ্ঠভাবেই জড়িয়ে ছিল কিরীটীর মনে পড়ল।

কিন্তু অনেক অনুসন্ধান করেও লোকটাকে ধরা ছোঁয়া যায়নি সে সময়।

তেলা মাছের মত হাতের মুঠোর মধ্যে এসেও প্রায় প্রমাণের অভাবে পিছলে গিয়েছিল যেন।

তখনই বুঝেছিল কিরীটী লোকটি যেমনি ধূর্ত, ক্ষিপ্র ও তেমনি শয়তান। অসংখ্য ডেরা আছে লোকটার।

কোথায়ও এক দিন, কোথায়ও দুদিন বা বড়জোর দিন চারেকের বেশী এক নাগাড়ে থাকে না কখনো।

সর্বত্র গতিবিধি।

কি করে কি ভাবে চলে তাও সঠিক জানা যায়নি এখন পর্যন্ত।

তাতে করে আরো সন্দেহটা পিয়ারীর উপর ঘনীভূত হয়েছে কিরীটীর। এবং সেই থেকেই তীক্ষ্ণ নজর আছে পিয়ারীর উপর কিরীটীর। লোক-চরিত্র সম্পর্কে কিরীটীর যতটা জ্ঞান আছে, তাতে করে অন্তত এটুকু তার কাছে অস্পষ্ট নেই যে লোকটা গভীর জলের মাছ।

কিরীটী তাই রানার সঙ্গে পিয়ারীর ঘনিষ্ঠতা দেখে চমকে উঠেছিল।

পিয়ারী রানার সঙ্গে কেন? কতদিনের আলাপ ওদের আর কেনই বা ঐ ঘনিষ্ঠতা? এবং কোন্ সূত্রে আলাপ ওদের?

প্রায় কুড়ি-পঁচিশ মিনিট পরে রানা চেম্বার থেকে বের হয়ে এল।

কিরীটীও নিঃশব্দে অলক্ষ্যে রানাকে অনুসরণ করে।

রানা তার অফিসে পৌঁছে পিয়ারীকে সঙ্গে নিয়ে উপরে চলে গেল।

কিরীটী তখন গাড়ি থেকে নেমে পরমেশ্বরের ভাড়া মিটিয়ে দিয়ে তাকে বললে, পরমেশ্বর, তুমি একটু দূরে গিয়ে তোমার গাড়ি নিয়ে অপেক্ষা কর।

ঐ যে ড্যাঙা লোকটা দেখলে ও যদি এসে তোমার ট্যাক্সি ভাড়া করে তো তাকে পৌঁছে দেবে ও ঠিকানাটা ওর মনে রাখবে। আর তা যদি না হয় তো আমি না ফিরে আসা পর্যন্ত

অপেক্ষা করবে। মোট কথা আমার সঙ্গে আজ তোমার দেখা হয় ভালই, নচেৎ কাল সকালে আমার সঙ্গে সকাল নটার মধ্যে দেখা করবে।

পরমেশ্বর সম্মতি জানিয়ে ট্যাক্সি নিয়ে রাস্তার মোড়ের দিকে এগিয়ে গেল।

আধঘণ্টা পরে প্রায় পিয়ারীকে বের হয়ে রাস্তার মোড়ের দিকে অগ্রসর হয়ে যেতে লক্ষ্য করলে কিরাটী। কিন্তু রানাকে বের হতে দেখল না।

আরও কিছুক্ষণ অপেক্ষা করার পরও যখন রানা বের হল না, কিরীটী রাস্তার মোড়ের দিকে এগিয়ে চলল।

মোড়ে এসে দেখল পরমেশ্বরের ট্যাক্সিটা সেখানে আশেপাশে কোথায়ও নেই।

খানিকটা আরও এগিয়ে গিয়ে হাত-ইশারায় একটা খালি ট্যাক্সি ডেকে কিরীটী উঠে বসল।

সোজা মেসে ফিরে এল কিরীটী।

॥ উনিশ ॥

রাত আটটা নাগাদ বামদেবের ওখান হতে টেলিফোনে সেই অজ্ঞাত ব্যক্তি লিখিত পত্রের কথা জানতে পারল কিরীটী।

বামদেবের সঙ্গে কথা শেষ করে কিরীটী সেফায় বসে একটা সিগার ধরাল।

নানা চিন্তা তার মাথার মধ্যে এসে ঘোরাফেরা করছে তখন।

হঠাৎ একটা কথা মনে হওয়ায় উঠে গিয়ে ফোনটা তুলে নিয়ে লালবাজারে কানেকশন চাইল।

ফোন ধরেছিল যে তাকে কিরীটী জিজ্ঞাসা করে মৃত্যুঞ্জয় ঘোষ সি. আই. ডি অফিসার আছে কিনা দেখ তো!

মৃত্যুঞ্জয় নতুন সি. আই. ডি. তে ঢুকলেও ছেলেটি খুব চালাক, চটপটে ও কর্মঠ।

মৃত্যুঞ্জয় ওই সময় লালবাজারেই ছিল। সে এসে ফোন ধরে। কে? আমি মৃত্যুঞ্জয় কথা বলছি।

কে, মৃত্যুঞ্জয়?

হ্যাঁ। আপনি কে?

আমি কিরীটী রায়। শোন একটা জরুরী কাজ করতে পারবে মৃত্যুঞ্জয় এখুনি?

কি ব্যাপার বলুন তো?

সংক্ষেপে তখন রানার অফিসের ঠিকানা ও চেহারার একটা বর্ণনা দিয়ে সেখানে গিয়ে বাড়িটার উপরে ও সেখানে অন্য কেউ আসা-যাওয়া করে কিনা তাদের ওপরে নজর রাখবার জন্য মৃত্যুঞ্জয়কে বলল কিরীটী!

মৃত্যুঞ্জয় সব শুনে বললে, আমি এখুনি যাচ্ছি।

মৃত্যুঞ্জয় নির্দিষ্ট জায়গায় এসে পৌঁছবার মিনিট কয়েক বাদেই লক্ষ্য করল, যোগানন্দকে রাণার আফিসে গিয়ে প্রবেশ করতে।

ঘনায়মান সন্ধ্যার অন্ধকারে পাড়াটা তখন বেশ নির্জন হয়ে গিয়েছে।

PathagarNet

মৃত্যুঞ্জয় দুটো বাড়ির মধ্যবর্তী একটা সরু গলিমত জায়গায় দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করতে থাকে। স্থির সতর্ক দৃষ্টি তার থাকে রানার অফিস-বাড়িটার দিকে।

রানার গাড়িটা দরজার সামনে দাঁড়িয়ে। ড্রাইভারটা নিশ্চিন্তে ঘুমোচ্ছে।

রাত প্রায় সোয়া নটা নাগাদ যোগানন্দ বের হয়ে এল এবং সতর্ক অনুসন্ধানী দৃষ্টিতে এদিক-ওদিক তাকাতে তাকাতে শ্লথ মন্থর পদে হেঁটে চলল। এবং প্রায় যোগানন্দ হাত দশ-বারো এগুবার পরই রানা নেমে এসে গাড়িতে উঠল।

গাড়ি ছেড়ে দিল।

মৃত্যুঞ্জয় তখন বেশ একটু দ্রুতপদেই এগিয়ে গেল রাস্তার মোড়ের দিকে। যোগানন্দ তখন বেশী দূর যায়নি, ফুটপাথ ধরে ধীরে শ্লথ গতিতে হেঁটে চলেছে।

মৃত্যুঞ্জয় অনুসরণ করে যোগানন্দকে একটা নির্দিষ্ট ব্যাবধান রেখে নিঃশব্দে।

হাঁটতে হাঁটতে যোগানন্দ বৌবাজার স্ট্রীট ধরে কিছুটা এগুবার পর হঠাৎ বাঁয়ের একটা সরু অন্ধ গলির মধ্যে গিয়ে প্রবেশ করল।

মৃত্যুঞ্জয় দাঁড়িয়ে পড়ে।

রাত প্রায় পৌনে দশটায় দীর্ঘ অপেক্ষার পর যোগানন্দ আবার একসময় বের হয়ে এল।

আবার সে হেঁটেই চলল। মৃত্যুঞ্জয়ও তাকে অনুসরণ করে চলে।

হেঁটেই চলেছে যোগানন্দ।

স্পষ্ট বোঝা যায় লোকটি বেশ অন্যমনস্ক, কি যেন ভাবতে ভারতে চলেছে।

রাত দশটা বাজাতে চলল তবু কলকাতার রাস্তার জনপ্রবাহের এখনো যেন বিরাম নেই। শহরের কর্মব্যস্ততা তেমনি চলেছে যেন অব্যাহত। তবে বাসে ট্রামে ভিড়টা যেন কমে এসেছে।

দোকানপাট ক্রমে ক্রমে সবই প্রায় বন্ধ হয়ে যাচ্ছে, একমাত্র খাবারের দোকান, পান-সিগারেটের দোকান ও চায়ের রেস্তোরাঁগুলো ভিন্ন—বিশেষ করে শেষোক্ত জায়গায় খরিদ্দারের এখনো অভাব নেই।

মৃত্যঞ্জয় লক্ষ্য করে—যোগানন্দ হেঁটে চলেছে অন্যমনস্ক হয়ে এভিনু ধরে।

যোগানন্দ হেঁটে চলছিল। রানার ওখানেও আজ যোগানন্দ বিশেষ পান করেনি। সামান্য যা পান করেছিল তাতে শরীরটা একটু চনচন করে উঠেছিল বটে কিছুক্ষণের জন্য, তার চাইতে কিছুই হয়নি।

দুটো ডেরা যোগানন্দর। একটি কলেজ স্ট্রীটের উপরে সিটি হোটেলে তিনতলার নিভৃত একটি কক্ষ অন্যটি কালীঘাটে মহিম হালদার স্ট্রীটের উপর দোতলা একটা বাড়ি। আজকের রাতের মত যোগানন্দ আর কালীঘাটে ফিরবে না।

সিটি হোটেলের ঘরেই রাত কাটাবে ঠিক করেছিল ইতিমধ্যে মনে মনে। হোটেলে পৌঁছে সোজা তিনতলায় সিঁড়ি বেয়ে উঠে এসে পকেট থেকে চাবি বের করে দরজাটা খুলে নিজের নির্দিষ্ট ঘরের মধ্যে প্রবেশ করল যোগানন্দ।

দরজাটা ভিতর থেকে এঁটে দিল।

ঘরটি অত্যন্ত পরিচ্ছন্ন ভাবে সাজানো।

একটি কাবার্ড, একটি ড্রেসিংটেবিল তার পাশে একটি আলনা।

এক পাশে একটি সিঙ্গল খাটে শয্যা বিছানো। একটি ছোট টেবিল ও একটি বেতের আরাম কেদারা।

জামাকাপড় খুলে ঘরের সঙ্গে সংলগ্ন বাথরুমে গিয়ে প্রবেশ করল যোগানন্দ।

স্নান করে একটা পায়জামা ও গেঞ্জি পরে বাথরুম থেকে বের হয়ে এল।

ঘুমে দু চোখ জড়িয়ে আসছে।

আরাম-কেদারাটার উপর গা এলিয়ে দিয়ে চোখ বুঝল যোগানন্দ।

মৃত্যুঞ্জয় তখন হোটেলের মালিক শশীকান্ত হাজরার সঙ্গে তার প্রাইভেট চেম্বারে বসে কথা বলছে।

মৃত্যুঞ্জয় পূর্বে কয়েকবার কিরীটীর সঙ্গে কাজ করেছে। এবং কিরীটীর সঙ্গে কাজ করে ভাবছে ঐ লোকটি সখের একজন গোয়েন্দা হলেও অদ্ভুত তার বিচার ও বিশ্লেষণশক্তি। কিরীটীর সঙ্গে কাজ করতে পারলে সে লাভবান হবে। তাই কিরীটীর নির্দেশ পেয়ে সে উৎসাহিত হয়ে উঠেছিল।

পরের দিন ঠিক বেলা নটায় পরমেশ্বর কিরীটীর সঙ্গে মেসে এসে দেখা করল।

লেক অঞ্চলে যে হঠাৎ-ধনী ও তথাকথিত অভিজাত শ্রেণীর উন্নাসিক এক অবসরপ্রাপ্ত চাকুরে ও গত মহাযুদ্ধে কালোবাজারে ফেঁপে-ওঠা সম্প্রদায়ের বসতি গড়ে উঠেছে—সেইখানেই একটা দোতলা ফ্ল্যাটের দুখানা ঘর নিয়ে পিয়ারী থাকে পরমেশ্বর বললে।

পরমেশ্বরের ট্যাক্সিতে চেপেই পিয়ারী ফিরে গিয়েছিল। এবং লেক অঞ্চলের সেই ফ্ল্যাটবাড়ির সামনেই তাকে নামিয়ে দিয়ে এসেছে পরমেশ্বর।

ইতিমধ্যে খুব ভোরে ফোন মারফৎ কিরীটী যোগানন্দর সংবাদও মৃত্যুঞ্জয়ের কাছে পেয়েছিল।

হোটেলের ম্যানেজার হাজরার কাছ থেকে যোগানন্দ সম্পর্কে মৃত্যুঞ্জয় যেটুকু সংবাদ সংগ্রহ করতে পেরেছিল সেটা যেমনি অস্পষ্ট তেমনি ধোঁয়াটে।

যোগানন্দের পুরো নাম যোগানন্দ রায়।

সিটি হেটেলের নির্দিষ্ট ঘরটি যোগানন্দ বছর তিনেক হল ভাড়া নিয়ে রেখেছে বটে কিন্তু নিয়মিত ঠিক ভাড়া দিলেও দিনের বেলায় তো কোন দিনই নয়—রাতেও কখনো কখনো হপ্তায় এক-আধ-দিন কাটায় মাত্র সেই ঘরে।

ব্যবহার অত্যন্ত অমায়িক। বিশেষ সজ্জন বলেই মনে হয়।

কি করে, চাকরি না ব্যবসা তাও ম্যানেজার বলতে সক্ষম হয়নি। তবে অবস্থা বেশ সচ্ছল বলেই মনে হয়, বেশভূষা অত্যন্ত কেতাদুরস্ত ফিটফাট।

ভিজিটার্স কখনো কাউকে আসতে দেখা যায়নি। সঙ্গে করেও গত তিন-চার বছরে কাউকে কখনও তাকে কেউ আনতে দেখেনি।

লোকটা যে মদ্যপান করে সেটা হোটেলের চাকরের মুখেই শোনা।

pathagar.net

॥ কুড়ি ॥

পরমেশ্বরকে বিদায় দিয়ে কিরীটী সোজা এল লালবাজার। এবং সুভাষের ঘরে ঢুকল।

সুভাষ বললে, কিরীটী যে, কি ব্যাপার?

একটা কাজ করতে পারবে ভাই?

কি বল?

কাউকে আজ রাত্রের গাড়িতেই হরিদ্বার পাঠাতে পারবে?

কি ব্যাপার বল তো কিরীটী?

হরিদ্বারে হরকি পিয়ারীর কাছে ভরদ্বাজ আশ্রমে শ্যামসুন্দর চক্রবর্তী নামে একজন সংসারত্যাগী ভদ্রলোক থাকেন। আমি শ্যামসুন্দর চক্রবর্তীর নামে একটা চিঠি দেব, তাঁর সঙ্গে আলাপ করে বামদেব অধিকারীর পূর্বপুরুষদের যতটা সম্ভব সংবাদ লোকটিকে সংগ্রহ করে আনতে হবে, আর জেনে আসতে হবে তিনি তাঁর পুত্র অনিল চক্রবর্তীর কোন সংবাদ রাখেন কিনা।

ব্যাপারটা খুলে বল ভাই।

অতঃপর কিরীটী সংক্ষেপে রত্নমঞ্জিল ও সুবর্ণকঙ্কন সম্পর্কে সমস্ত বললে সুভাষকে।

এবং পরিদিন কিরীটী বহরমপুর রওনা হয়।

অপমানে আক্রোশে ফুলতে ফুলতে পিয়ারী রত্নমঞ্জিল থেকে বের হয়ে এল।

বিনয়ের শেষের কথাগুলো তখনও যেন তাঁর সর্বাঙ্গে ছুঁচ ফোটাছিল।

বামদেব যে তার প্রস্তাবে রাজী হবেন না পিয়ারী সেটা কিছটা পূর্বেই অনুমান করেছিল, তাই সে আরো দুজনকে সঙ্গে এনেছিল, তার বিশ্বস্ত ও বহু পাপানুষ্ঠানের সহচর গুপীনাথ ও ছুট্টুলালকে।

গুপীনাথের তাঁবে ছিল কলকাতার একদল নিম্নশ্রেণীর জঘন্য প্রকৃতির গুন্ডা।

নিজেও যে সে রাতের অন্ধকারে ও দিনের প্রকাশ্য আলোকে কত লোকের বুকে ছুরি বসিয়েছে তার সংখ্যা ছিল না।

গায়ে যেমন অসুরের মত শক্তি, প্রকৃতিও তেমনি ছিল দুর্ধর্ষ।

পয়সার বিনিময়ে গুপী করতে পারত না দুনিয়ায় এমন কোন কাজই ছিল না।

পিয়ারী বহরুমপুরে এসে কিন্তু কোন হোটেলে ওঠেনি।

ছট্টুর কাছ থেকে পূর্বাহ্নেই সমস্ত সংবাদ সংগ্রহ করে জেনেছিল রত্নমঞ্জিল থেকে আধ মাইলটাক দূরে গঙ্গার ধারে নবাব আমলের একটা ভগ্ন অট্টালিকা আছে, লোকে বলে সেটাকে আরামবাগ। সেই আরামবাগেই এসে আশ্রয় নিয়েছিল তিনজনে গোপনে।

জঙ্গলাকীর্ণ বুনো আগাছায় ভরা বহু বৎসরের পরিত্যক্ত ভগ্ন জীর্ণ আরামবাগেরই একটা কক্ষ কোনমতে পরিষ্কার করে নিয়ে ওরা তাদের ডেরা বেঁধেছিল।

একটি ভগ্ন অট্টালিকা।

চারিপাশে ও মধ্যস্থলে একদা মনোরম উদ্যান ছিল, শোনা যায় কোন নবাবের বিলাসকেন্দ্র ছিল ঐ সুরম্য আরামবাগ।

বেগম ও তার সুন্দরী সহচরীদের নিয়ে একদা নবাবের হয়তো কত আনন্দ মুখরিত

দিনরাত্রি আরামবাগে কেটে গিয়েছে।

কত মান-অভিমান, রাগ-অনুরাগের স্মৃতি আজও হয়তো আরামবাগের মন্থর বায়ু তরঙ্গে তরঙ্গে দীর্ঘশ্বাসের মত গুমরে গুমরে উঠছে।

আরামবাগের দেড় ক্রোশের মধ্যে কোন জনমানবের বসতি নেই। শহরের এদিকটা একপ্রকার পরিত্যক্ত বললেও অত্যুক্তি হয় না। নবাবী আমলের কলকোলাহল ঐশ্বর্য ও প্রাচুর্যের আড়ম্বর আজ শান্ত ও লুপ্ত। কেবল এখনো সাক্ষ্য দিচ্ছে সব কিছুর ভগ্নজীর্ণ স্তূপে স্তূপে।

পিয়ারী রত্নমঞ্জিল থেকে বের হয়ে প্রথমে সোজা শহরের দিকে গেল। একটা রেস্টুরেন্টে ঢুকে চায়ের অর্ডার দিয়ে ভবিষ্যৎ কর্মপন্থার চিন্তায় সে ডুবে গেল।

কোন্ পথে এবারে সে অগ্রসর হবে?

চিন্তা করতে করতে একটা বুদ্ধি তার মাথার মধ্যে এসে উদয় হল এবং সঙ্গে সঙ্গে তার চোখমুখ আনন্দে উজ্জ্বল হয়ে ওঠে।

নিজের চিন্তায় মগ্ন পিয়ারী কিন্তু লক্ষ্য করল না ঠিক সেই সময় মুখে ফ্রেঞ্চকাট দাড়ি, পুরুষ্টু গোঁফ, মাথায় শালের টুপি, পরিধানে পায়জামা ও তসরের সেরওয়ানী একজন দীর্ঘকায় বলিষ্ঠ ভদ্রলোক রেস্টুরেন্টের মধ্যে এসে প্রবেশ করে পিয়ারীর অদূরে একটি টেবিলের সামনে চেয়ারটা টেনে নিয়ে বসল। ছোকরা চাকরটা রেস্টুরেন্টের সামনে এসে দাঁড়াল নতুন আগন্তুকের।

এক কাপ চা! আগন্তুক বলে।

পিয়ারীর মুখের সিগারেটটা নিঃশেষ হয়ে গিয়েছিল, হাতের মার্কোভিচের টিনটা থেকে নতুন একটা সিগারেট বের করে দুই ওষ্ঠে চেপে ধরে, সমাপ্তপ্রায় সিগারেটটার সাহায্যে অগ্নিসংযোগ করে প্রথমটা ফেলে দিল নিঃশেষিত চায়ের কাপটার মধ্যে।

ফ্রেঞ্চকাট-দাড়ি শোভিত মুসলমানী পোশাক পরিহিত আগন্তুক আর কেউ নয়, কিরীটী। এবং মৃত্যুঞ্জয়কে নিয়ে সে বহরমপুরে এসেছে।

পিয়ারী যে বহরমপুরে এসেছ কিরীটীর সেটা অজ্ঞাত ছিল না।

মিনিট দশেক বাদে চায়ের দাম মিটিয়ে দিয়ে পিয়ারী রেস্টুরেন্ট থেকে বের হয়ে গেল।

সাধারণ বেশে মৃত্যুঞ্জয় বাইরেই দাঁড়িয়েছিল। তার সামনে এসে চাপাকণ্ঠে কয়েকটা উপদেশ দিয়ে কিরীটী আবার রেস্টুরেন্টে গিয়ে প্রবেশ করল।

পরের দিন রাত্রে অপেক্ষা করেও প্রায় সারাটা রাত বিনয় কিছুই দেখতে পেল না। কিন্তু হতাশ হল না সে।

তার পরের রাত্রেও বিনয় তার দোতলার শয়নঘরের খোলা জানলার সামনে অন্ধকারে একাকী দাঁড়িয়ে। দৃষ্টি তার নিবদ্ধ নীচের বাগানে। শুধু কি সেই লাল আলোর সংকেতটুকুই! রাত্রির মত মাধুর্যময়ী অথচ রহস্যময়ী সেই পথপ্রদর্শিকার মিষ্টি কৌতুক সেও ভুলতে পারছে না কিছুতেই।

আজকের রাতেও যে বিনয়ের চোখে ঘুম নেই, শোযোক্তগুলোও তার কারণ বৈকি।

নীচের বাগানে কাল রাত্রে যে পোড়া গিসারের শেষ টুকরোটা পাওয়া গিয়েছে পরে

সেটা পরীক্ষা করে দেখেছে বিনয়।

দামী দগ্ধ সিগারের শেষাংশ।

সিগারের টুকরোটা যখন বিনয় বাগানের মধ্যে কুড়িয়ে পায় তখনও সেটা পুড়ছিল। অতএব ক্ষণপূর্বে কেউ নিশ্চয়ই ওখানে দাঁড়িয়ে ধূমপান করছিল নিঃসন্দেহে।

কিন্তু কে?

তারপর এ বাড়ির কেয়ারটেকার মনোহর!

লোকটার গতিবিধি ও হাবভাব স্পষ্ট সন্দেহজনক। বিপক্ষ দলের সংবাদ সরবরাহকারী বলেই মনে হয়।

অঘোরে নিশ্চিন্তে ঘুমিয়ে রয়েছেন শয্যার ওপরে বামদেব। ঘরের আলোটা নেভানো।

বন্ধ দরজার মধ্যবর্তী সামান্য ফাঁক দিয়ে স্টিলের একটি পাত ধীরে ধীরে প্রবেশ করল, তারপর নিঃশব্দে সেই পাতের চাপে দরজার অর্গলটা উপরের দিকে উঠে যেতে থাকে।

দরজাটা একটু ফাঁক হয়ে যায়—সেই ফাঁকের মধ্যে দিয়ে প্রবেশ করে কালো একটা হাত ধীরে ধীরে একটা সরীসৃপের মত।

অতি সহজেই অতঃপর সেই হাত দরজার অর্গলটা ধরে নীচের দিকে অর্গলটা নামিয়ে আনে—দরজার কপাট দুটো খুলে যায়।

নিঃশব্দে পা টিপে টিপে ছায়ার মত একটা মনুষ্যমূর্তি বামদেবের শয়নঘরে প্রবেশ করে।

তার পশ্চাতে আর একজন।

অন্ধকারে আগে পিছে সেই ছায়ামূর্তি দুটো এগিয়ে যায় বামদেবের শয্যার দিকে।

প্রথম ছায়ামূর্তি পকেট থেকে একটা ছোট শিশি ও রুমাল বের করে শিশির মধ্যস্থিত আরক ঢেলে রুমালটা ভিজিয়ে নিল।

প্রথম ছায়ামূর্তি রুমাল হাতে ঘুমন্ত বামদেবের শিয়রের সামনে গিয়ে দাঁড়াল। দ্বিতীয় ছায়ামূর্তি দাঁড়াল এসে পায়ের কাছে।

রুমালটা ছায়ামূর্তি ঘুমন্ত বামদেবের নাকের কাছে ধরল। ঘরের বাতাসে একটা মিষ্টি কটু গন্ধ ছড়িয়ে পড়ে।

অজ্ঞান বামদেবকে কাঁধের ওপরে তুলে ছায়ামূর্তি দুজন ঘর থেকে বের হয়ে গেল।

॥ একুশ ॥

বিনয় অপেক্ষা করেছিল। আজকেও আবার ঠিক সেই সময় লাল আলোর সঙ্কেত দেখা গেল নীচের অন্ধকারে।

বিনয় জানালার সামনে সতর্ক হয়েই দাঁড়িয়েছিল। সে আর মহূর্ত বিলম্ব করে না। টর্চটা নিয়ে দ্রুত সিঁড়ি বেয়ে নীচে নমে যায়।

গতরাত্রের মত আজও দরজাটা খোলা। কিন্তু নজর দেবার মত যেন বিনয়ের ফুরসত

নেই।

দ্রুতপদে বিনয় বাগানের দিকে চলে।

কিন্তু নির্দিষ্ট জায়গায় পৌঁছবার আগেই কার সঙ্গে যেন তার অন্ধকারেই ধাক্কা লাগে।

কে?

কিন্তু যার সঙ্গে বিনয়ের অন্ধকারে ধাক্কা লেগেছিল সে বিনয়ের প্রশ্নের কোন জবাব না দিয়ে বিনয়ের হাতটা চেপে ধরে চাপাকণ্ঠে কেবল বলে, চুপ! আস্তে!

কে?

বিনয়বাবু, আমি কিরীটী।

বিস্ময়ে একটা প্রচণ্ড ধাক্কা খায় বিনয়। কয়েকটা মুহূর্ত তার মুখ দিয়ে কথাই সরে না।

কিরীটী রায়! এই মধ্যরাত্রে রত্নমঞ্জিলের বাগানের মধ্যে অন্ধকারে!

অদূরে এমন সময় একটা দ্রুতপলায়নপর পদশব্দ শোনা গেল। শুকনো ঝরা পাতার ওপর দিয়ে মচমচিয়ে কে যেন দ্রুত পালিয়ে গেল।

সব মাটি করে দিলেন। পালিয়ে গেল লোকটা। কিরীটী বললে।

কিরীটীর কথায় বিনয়ের বিস্ময় যেন উত্তরোত্তর বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। তবু প্রশ্ন করে, কে? কে পালাল?

তা আর জেনে কি হবে! কিন্তু আপনাকে কলকাতা থেকে আসবার সময় বার বার বলে দিয়েছিলাম না, দিনেরাত্রে সর্বদা সাবধানে থাকবেন! অন্ধকারে রাত্রে একা একা নিরস্ত্র ঐ জঙ্গলের মধ্যে এক লাল আলোর নিশানা দেখে ছুটছিলেন, যদি আচমকা বিপদে পড়তেন কে রক্ষা করত আপনাকে! ছিঃ আপনি, একেবার ছেলেমানুষ!

কিন্তু—

পরশু রাত্রের ব্যাপারেও আপনার শিক্ষা হয়নি! আবার ঐ জঙ্গলের মধ্যে ছুটছিলেন!

আপনি—আপনি পরশু রাত্রের ব্যাপার জানেন?

জানি। কেন ভিচের সিগারের টুকরো পাননি?

Oh! It was then you? তা কবে এলেন আপনি?

চারদিন হল। যাক, এখন চলুন দেখা যাক মনোহর কি করছে।

দুজনে ফিরে এল রত্নমঞ্জিলে।

দেখা গেল মনোহরের ঘরের দরজা খোলা। আগে বিনয় ও পশ্চাতে কিরীটী মনোহরের ঘরের মধ্যে প্রবেশ করে।

মাটির শয্যায় শুয়ে মনোহর নাক ডাকাচ্ছে।

ভদ্রলোক ঘুমোচ্ছেন যখন, আপাতত আর ওঁকে বিরক্ত করে প্রয়োজন নেই। চলুন বাইরে যাওয়া যাক।

বেশ একটু জোরে জোরেই কথাগুলো উচ্চারণ করে কিরীটী বিনয়কে নিয়ে ঘর থেকে বের হয়ে এল এবং নিঃশব্দে হঠাৎ ঘুরে দাঁড়িয়ে দরজার কবাট দুটো বাইরে থেকে টেনে শিকল তুলে দিল।

ও কি!

এতকাল এ বাড়ির কেয়ারটেকার ছিল, তাই ওর সম্পর্কে একটু কেয়ার নেওয়া হল।

এখন চলুন ওপরে যাওয়া যাক। কিরীটী মৃদু হেসে বললে।

দুজনে সবে ওপরের বারান্দায় পা দিয়েছে, সুজাতার শঙ্কিত কণ্ঠস্বর শোনা গেল, বিনয়! বিনয়!

সুজাতা হন্তদন্ত হয়ে বিনয়ের ঘরের দিকেই আসছিল।

কি—কি হয়েছে সুজাতা? বলতে বলতে উৎকণ্ঠিত বিনয় এগিয়ে যায়!

বাবা—বাবাকে তার ঘরে দেখছি না! ঘরের দরজা খোলা!

সে কি! চল তো?

সুজাতা, বিনয় ও কিরীটী তিনজনেই এগিয়ে যায় বামদেবের শয়নকক্ষের দিকে।

সত্যি ঘর খালি।

বিনয় থমকে দাঁড়িয়ে যায়। কিরীটী কিন্তু ঘরে পা দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই ঘরের মধ্যে একটি মিষ্টি উগ্র গন্ধ পেয়েছিল।

বার দুই জোরে জোরে ঘ্রাণ নিয়ে কিরীটী বললে, হুঁ, ক্লোরোফরম!

সুজাতার মুখে যা শোনা গেল তার মর্মার্থ এই, হঠাৎ ঘুম ভেঙে সুজাতা বাইরে এসে বামদেবের শয়নঘরের দরজা খোলা দেখতে পেয়ে চমকে ওঠে। বামদেবের চিরদিন শয়নঘরের দরজা বন্ধ করে যেমন শোওয়া অভ্যাস তেমনি রাত্রেও কখনও তিনি ওঠেন না। বহুকাল থেকেই তিনি রাত নটায় শয্যাগ্রহণ ও ভোর পাঁচটায় শয্যাত্যাগ করেন।

তবু সুজাতা বাথরুমটা একবার দেখে এসেছে। কিন্তু সেখানেও বামদেব নেই।

কি হল কিছুই তো বুঝতে পারছি না কিরীটীবাবু! উৎকণ্ঠিত বিনয় বলে।

কিরীটীর চিন্তাশক্তি তখন অত্যন্ত সক্রিয়। ঘরের মধ্যে প্রবেশের সঙ্গে সঙ্গেই তার নাসারন্ধ্রে, যে মিষ্টি গন্ধের ঢেউ প্রবেশ করেছিল, সেটা যে ক্লোরোফরম ছাড়া আর কিছুই নয় এবং বামদেবের অদৃশ্য হওয়ার রহস্যটা যে সেইখানেই দানা বেঁধে আছে, কিরীটীর পক্ষে সেটা বুঝতে কষ্ট হয়নি।

আবার আজ রাত্রে সুযোগ পেয়েছে বাণী।

ঘুম আসছিল না চোখে কিছুতেই। চোখ বুজে একপ্রকার বাধ্য হয়েই শয্যার ওপরে শুয়েছিল, কেননা ঘরের মধ্যে তার বাবাও শুয়ে আছে।

বাবার চোখকে ফাঁকি দিয়ে ঘর থেকে বের হওয়া সোজা নয়।

কখনো দু চোখের পাতা বুজিয়ে, কখনো অন্ধকারে তাকিয়ে ক্লান্ত হয়ে বাণী হঠাৎ একসময় দেখতে পেল ধীরে ধীরে তার বাপ শয্যা ছেড়ে উঠে বসল।

কিছুক্ষণ অন্ধকারেই তার শয্যার দিকে তাকিয়ে থেকে উঠে দাঁড়াল। ধীরে ধীরে নিঃশব্দ পায়ে অনিল ঘর থেকে বের হয়ে গেল।

বাণী তথাপি কিছুক্ষণ শয্যার ওপরে শুয়ে রইল। তারপর উঠে বসে দেশলাইটা দিয়ে প্রদীপটা জ্বালল। গতকাল বাণী একসময় লক্ষ্য করেছিল হঠাৎ মধ্যরাত্রে ঘুম ভেঙে গিয়ে, ঘরের দেওয়ালে একটা ফোকরের মধ্যে বাবা তার পুঁটিলিটা রাখে আর সেই লাল মলাটের নোটবইটা রাখে ঘরের মেঝেতে একটা গর্তে ইট চাপা দিয়ে। নোটবইটা রাখবার জায়গাটার সন্ধান এতদিন বাণী পায়নি।

প্রদীপের আলোয় গতরাত্রের দেখা দেওয়ালের একটা ইট সরিয়ে ফোকরটার মধ্যে হাত

গলিয়ে পুঁটলিটা টেনে বের করল।

পুরাতন লাল রংয়ের শালুতে বাঁধা একটা ছোট পুঁটলি।

প্রদীপের ম্লান আলোর সামনে বসে কম্পিত হাতে বাণী পুঁটলিটা খুলে ফেলল।

পুঁটলিটা খুলতেই একটা ছোট চৌকো সাইজের কারুকার্য করা হাতীর দাঁতের তৈরী কৌটো বের হল। বিস্ময়ে কিছুক্ষণ কৌটোটার দিকে তাকিয়ে থাকে বাণী।

ধীরে ধীরে কৌটোর ঢাকনিটা খুলতেই ম্লান প্রদীপের আলোয় তার বিস্মিত দৃষ্টির সামনে প্রকাশিত হল সযত্নে তুলোর ওপরে রাখা একটি সুবর্ণকঙ্কন।

সেকেলে জড়োয়া একেবারে খাঁটি পাকা সোনার তৈরী কঙ্কনটি।

হাঙ্গরমুখী কঙ্কন। দু'পাশ হতে দুটো হাঙ্গরের হিংস্র মুখ যেন পরস্পরের সঙ্গে এসে ঠেকেছে।

কঙ্কনের গায়ে যে সুক্ষ্ম ছিলার কাজ তাও দেখবার মত।

নারীমনের সহজাত কৌতূহলেই বাণী কঙ্কনটা একবার হাতে নিয়ে দেখে।

বাইরে একটা মৃদু পত্রমর্মর শোনা গেল।

চমকে উঠে তাড়াতাড়ি কঙ্কনটি কৌটোয় ভরে পুঁটিলির মধ্যে রেখে যথাস্থানে গিয়ে রেখে দিল।

সুবর্ণকঙ্কন! লাল মলাটের নোটবই তার পিতামহ শশাঙ্কমোহন চৌধুরীর রোজনামচা—ডায়েরী!

নিশ্চয়ই ঐ নোটবইয়ের মধ্যে তাহলে ঐ কঙ্কন সম্পর্কে কোন কথা আছে। কার ঐ কঙ্কন?

অদম্য কৌতূহলকে নিবৃত্ত করে রাখতে পারে না আর বাণী। ঘরের মেঝে থেকে ইট তুলে গর্তের মধ্যে যেখানে লাল মলাটের নোটবইটা লুকোনো থাকে তার মধ্যে হাত ঢুকিয়ে বাণী নোটবইটা বের করে আনলে।

প্রদীপের আলোয় বসে দ্রুত একটার পর একটা ডায়েরীর পাতা উল্টে যেতে লাগল।

হঠাৎ মাঝামাঝি এক জায়গায় এসে তার চোখের দৃষ্টি আবদ্ধ হল।

মৃন্ময়ী জানে না যে ঐ সুবর্ণকঙ্কনের কথা অনেকদিন আগেই আমি শ্বশুর মশাইয়ের কাছে শুনেছি। অনিলের জন্মের বছর দেড়েক আগে তিনি একদিন হঠাৎ সন্ধ্যেবেলায় বর্হিমহলে আমার ঘরে এসে হাজির হলেন। একথা সেকথার পর একসময় আমাকে বললেন, দেখ বাবা, তোমাকে আজ একটা কথা বলব। আমাদের পূর্বপুরুষদের কিছু সঞ্চিত হীরা জহরৎ ও বাদশাহী মোহর আছে। বাবা মৃত্যুর সময় আমাকে বলে গিয়েছিলেন, ঐ ধনরত্ন রত্নমঞ্জিলের ঐ নৈঋত কোণে যে শিংশপা-বৃক্ষটি আছে, তার গোড়া থেকে পূব কোণে এক জায়গায় মাটির নীচে একটি শিলাখণ্ড প্রোথিত আছে, সেই শিলাখণ্ডের নীচে একটি ছোট লোহার সিন্দুকে সেই ধনরত্ন লুকানো আছে, সিন্দুকটির কোন চাবি নেই। সিন্দুকের ওপরে পাশাপাশি অনেকটা দুটি বলয়ের আকারে খাঁজ কাটা আছে। ঐ বলয়াকার খাঁজের মধ্যে দুটি কঙ্কন বসিয়ে চাপ দিলেই আপনা হতেই তখন সিন্দুকের ডালাটি নাকি খুলে যাবে। মীনুর হাতে যে দুটি সুবর্ণকঙ্কন দেখেছ, যা তোমার শ্বাশুড়ি তাকে দিয়েছেন, একমাত্র ঐ দুটি কঙ্কনের সাহায্যেই খোলা যায়। অন্য কোন কঙ্কন দিয়েই সিন্দুক খোলা যাবে না। শরীর আমার ইদানীং খারাপ যাচ্ছে। কবে আছি কবে নেই—তাই তোমাকে এই গোপন তথ্যটি

বলে গেলাম। যদিচ এই বংশের জ্যেষ্ঠ পুত্রেরই একমাত্র অধিকার আছে ঐ ধনরত্নে, তবু তোমাকে বলে রাখলাম এইজন্য যে আর তো পুত্র আমাদের হবে না, তোমরাই হবে সম্পত্তির একমাত্র উত্তরাধিকারী।

কথাটা শুনে আমি চুপ করেই রইলাম।

শ্বশুরমশাই একটু থেমে আবার বলতে লাগলেন, মীনুকেই আমি একথা বলে যেতাম, কিন্তু ইচ্ছা করেই তাকে বলিনি, কারণ সে আমার নিজের সন্তান হলেও সে অস্থির চপল ও উগ্র প্রকৃতির। বিলাসব্যসনই দেখেছি তার জীবনের একমাত্র কাম্য। সে হয়তো ঐ ধনরত্নের লোভ সামাতে পারবে না। পূর্ব-পুরুষের নির্দেশ আছে, অত্যন্ত প্রয়োজন ছাড়া নিতান্ত অভাব না হলে কোন মতেই যেন ঐ সঞ্চিত গুপ্তধনে না হাত দেওয়া হয়। তুমি নির্লোভ, নীতিপরায়ণ। তুমি সে লোভকে জয় করতে পারবে, তাই তোমাকে আরো বলে গেলাম।

এতক্ষণে বাণীর কাছে সব স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

পিতার এই জঙ্গলের মধ্যে এসে পড়ে থাকার উদ্দেশ্য তার সামনে পরিষ্কার হয়ে যায়।

পিতা তার তাহলে সেই গুপ্ত ধনৈশ্বর্যের লোভেই এখানে এসেছে, তাই সে দিবারাত্র জঙ্গলের মধ্যে এখানে ওখানে মাটি খোঁড়ে, জঙ্গল সাফ করে।

বাণী আবার ডায়েরী পাতা ওল্টাতে লাগল। আর এক পাতায় লেখা আছে ঃ

মৃন্ময়ীকে স্পষ্টই আজ বলে দিয়েছি, বামদেবের ভাবী স্ত্রীই ঐ কঙ্কনের যখন একমাত্র উত্তরাধিকারিণী তখন কঙ্কন তাকে এ বাড়ি ছেড়ে যাবার আগে একটি ফিরত দিয়ে যেতেই হবে। মৃন্ময়ী শেষ পর্যন্ত স্বীকৃত হয়েছে।

॥ বাইশ ॥

শেষরাত্রির দিকে বামদেবের জ্ঞান ফিরে এল

প্রথমটায় তো বামদেব বুঝতেই পারেন না, এ তিনি কোথায়! চিন্তাশক্তি ধোঁয়াটে দুর্বল। কিন্তু ক্রমে ক্রমে যখন জ্ঞান স্পষ্ট হয়ে এল, দেখলেন হাত-পা বন্ধাবস্তায় জীর্ণ পুরাতন একটা ঘরের মধ্যে মাটিতে পড়ে আছেন।

অদূরে ঘরের কোণে একটা হ্যারিকেন বাতি জ্বলছে।

কিছুই মনে পড়ে না, কিছুই বুঝে উঠতে পারেন না—এ তিনি কোথায় এলেন। কেমন করেই বা এলেন। ছিলেন তো রত্নমঞ্জিলের নিজের ঘরে শয্যায় শুয়ে!

তবে এখানে এলেন কেমন করে, কখনই বা এলেন!

মচমচ একটা জুতোর শব্দ শোনা গেল। তারপরই ভেজানো দরজা ঠেলে দুজন ঘরে প্রবেশ করল। প্রথম ব্যক্তিকে দেখেই কিন্তু বামদেব চমকে উঠলেন। পরন্তু সকালে ঐ লোকটিই রত্নমঞ্জিল কেনবার জন্য তাঁর কাছে গিয়েছিল।

নামটাও মনে পড়ে—পিয়ারী!

দ্বিতীয় ব্যক্তিকে কিন্তু চিনতে পারলেন না বামদেব। গুপীনাথকে তো বামদেব ইতিপূর্বে কখনো দেখেননি, চিনবেন কি করে!

জুতোর মচমচ শব্দ তুলে পিয়ারী বামদেবের একেবারে সামনে এসে দাঁড়াল, এই যে অধিকারী মশাইয়ের জ্ঞান ফিরে এসেছে দেখছি! গুপী, ওঁকে তুলে বসিয়ে দাও।

গুপী পিয়ারীর নির্দেশ পালন করে, এক হ্যাঁচকা টানে তুলে বামদেবকে বসিয়ে দিল

তারপর অধিকারী মশাই, এবারে রত্নমঞ্জিল বিক্রী করবেন তো?

পিয়ারীর কথায় বামদেবের সর্বাঙ্গ আক্রোশে যেন জ্বলে ওঠে রি-রি করে। অবজ্ঞাভরে জবাব দেন, শয়তান! তুই যদি ভেবে থাকিস, এইভাবে অত্যাচার করে তুইও আমার স্বীকৃতি পাবি তো ভুল করেছিস।

গর্তের মধ্যে পড়েও এখনো তড়পানি যায়নি! শোন বামদেববাবু, রানার কাছে যা কবুল করে বায়না নিয়েছ সেই পঞ্চান্ন হাজার টাকাই তোমাকে দেওয়া হবে, যদি ভালয় ভালয় এই স্ট্যাম্পযুক্ত বিক্রয়কোবালায় শান্ত সুবোধ ছেলের মতই সই করে দাও। আর ত্যাঁদড়ামি যদি কর তো, বিক্রয়কোবালায় সই তো করতেই হবে—একটি কপর্দকও পাবে না। এখন ভেবে বল কোন্ পথ নেবে!

মরে গেলেও বাড়ি বিক্রি করব না। বুঝতে পারছি সেই শয়তান ঘুঘু শেঠ রানারই সব কারসাজি! তুই তারই লোক। তোর মনিবকেও বলিস, আর তুই শুনে রাখ্, তোদের হাতে মরব তবু সই করব না।

হুঁ সহজ পথে তুমি তাহলে এগুতে রাজী নও! বেশ, তবে সেই ব্যবস্থাই হবে। গুপী তিন দিন ওকে কিছু খেতে দিবি না। এক ফোঁটা জল পর্যন্ত নয়। থাক উপবাস দিয়ে, দেখি ও তেজ কদিন থাকে!

ঘর থেকে বের হয়ে গেলে পিয়ারী।

গুপী একবার এগিয়ে এসে বললে, কেন মিথ্যে ঝামেলা করছ বামদেববাবু! ভালয় ভালয় রাজী যদি হয়ে যাও তো, আটকে কটা দিন তোমাকে রাখলেও দিব্যি রাজার হালে আরামে থাকবে। দলিলটা রেজিস্ট্রি হয়ে গেলেই ড্যাং ড্যাং করে নিয়ে চলে যাবে।

বামদেব গুপীর কথায় কোন সাড়াই দেন না।

কেবল মনে মনে ভাবতে থাকেন, কিরীটীর পরামর্শে বহরমপুরে এসে তিনি কি ফ্যাসাদেই না পড়লেন! এতদিনকার জানাশোনা কিরীটী—বন্ধু কিরীটী যে তাকে এই বিপদের মধ্যে পাঠিয়ে দিয়ে নিজে দিব্যি কলকাতায় বসে রইল, দু'একদিনের মধ্যেই আসবে বলেছিল—নদিন আজ হয়ে গেল, হয়তো বেমালুম সব ভুলেই বসে আছে! বামদেবকে যে ঠেলে এখানে পাঠিয়ে দিয়েছে হয়তো মনেই নেই তার!

শয়তানের পাল্লায় পড়েছেন, সহজে এদের হাত থেকে নিষ্কৃতি মিলবে বলেও তো মনে হচ্ছে না। কত দুর্ভোগ আছে বরাতে কে জানে!

বিনয় আর সুজাতা তারাই বা কি করবে! জানতেও পারবে না তারা কাল সকালের আগে যে, শত্রু হাতে তিনি বন্দী হয়েছেন!

আর জানলেই বা এই শয়ানদের হাত থেকে রক্ষা করবে কেমন করে তারা তাঁকে!

ভোরের আলো একটু একটু করে আকাশপটে দেখা দেয়।

সুজাতাকে সান্ত্বনা দিয়ে কিরীটী বলে, বামদেববাবু শত্রুর হাতে পড়লেও চিন্তা করবার কিছু নেই। কারণ আমার ধারণা চট্ করে প্রাণে মারবে না তাঁকে তারা।

প্রাণে মারবে না কি করে আপনি নিশ্চিত জানলেন কিরীটীবাবু?

কারণ এ তো বোঝাই যাচ্ছে, এই রত্নমঞ্জিলের ব্যাপারেই তাকে ধরে নিয়ে গিয়ে কোন জায়গায় গুম করেছে। সেক্ষেত্রে তাকে প্রাণে মেরে ফেললে তো কোন সুবিধাই হবে না তাদের। তাহলে তো যেজন্য নিয়ে যাওয়া সেটাই ভেস্তে গেল।

সুজাতা না বুঝতে পারলেও বিনয় কিরীটীর কথার যুক্তিটা হৃদয়ঙ্গম করতে পারে। এও বুঝেছে সে, এই বিপদে অস্থির হয়ে হা-হুতাশ করলেও কোন ফল হবে না। যা করবার ধীরেসুস্থে করতে হবে।

সত্যি, তুমি ব্যস্ত হয়ো না সুজাতা। কিরীটীবাবু যখন এসে পড়েছেন, মেসোমশাইকে যেমন করে হোক উদ্ধার আমরা করবই।

বিনয়ের আশ্বাস পেয়ে সুজাতা নিশ্চিন্ত না হলেও চুপ করে থাকে।

কিরীটী বিনয়কে সম্বোধন করে এবারে বলে, আমাদের সময় নষ্ট করলে চলবে না বিনয়বাবু। চলুন সবার আগে শ্রীমান মনোহরের সঙ্গে কথা বলে দেখা যাক তার কাছ থেকে কিছু বের করা যায় কিনা।

দুজনে আবার নীচে গেল।

কিন্তু ঘরের দরজা খুলে দেখা গেল ঘর শূন্য। ঘরের মধ্যে কেউ নেই।

আশ্চর্য! মনোহর গেল কোথায়?

খোঁজ করতে দেখা গেল, ঘরের জানালার একটা শিক আলগা। সেই শিকটা তুলেই ইতিমধ্যে মনোহর পালিয়েছে তাহলে।

কিরীটী কিন্তু মনোহরের পলায়নের ব্যাপারে বিশেষ চিন্তিত বলে মনে হল না। সে বিনয়কে বললে, বিনয়বাবু, আপনি এখান থেকে কোথাও যাবেন না। আমি থানা থেকে এখুনি একবার ঘুরে আসছি।

থানায় গিয়ে কিরীটী দেখল মৃত্যুঞ্জয় বসে আছে তারই অপেক্ষায়।

কি খবর মৃত্যুঞ্জয়?

পিয়ারীকে follow করছিলাম। শহর থেকে মাইল দুই দূরে গঙ্গার ধারে যে আরামবাগ আছে সেই দিকে তাকে যেতে দেখেছি।

থানায় দারোগা রহমৎ সাহেবও সেখানে বসেছিলেন। মৃত্যুঞ্জয়ের কথা শুনে তিনি বললেন সে কি! সে তো একটা পোড়ো বাড়ি। চারিদিকে দুর্ভেদ্য জঙ্গল। দিনের আলোতেও সেইখানে পা দিতে গা ছমছম করে, সাপে ভর্তি জায়গাটা।

কিন্তু রহমৎ সাহেবের কথায় কান না দিয়ে কিরীটী মৃত্যুঞ্জয়ের দিকে ফিরে তাকিয়ে বললে, কাল কতক্ষণ পর্যন্ত তার উপর তুমি চোখ রেখেছিলে মৃত্যুঞ্জয়?

বিকেল পাঁচটা পর্যন্ত। সেই সময় তাকে আরামবাগের দিকে যেতে দেখি। ঘণ্টা দুয়েক তার ফেরবার প্রতীক্ষায় আমি ছিলাম। কিন্তু তাকে আর ফিরতে দেখিনি। তাতেই আমার মনে হয়, ঐখানেই কোথাও পিয়ারী আড্ডা নিয়েছে।

কিন্তু সেখানে তো মানুষ থাকতে পারে না কিরীটীবাবু! আবার রহমৎ সাহেব বললেন।

তা না থাকুক, কিন্তু স্থানটিতে সাধারণের যাতায়াত যেমন নেই তেমনি নিরাপদও বটে। মৃদু হেসে কিরীটী বলে। তারপর একটু থেমে আবার বলে, এদিকে কাল মাঝরাতে রত্নমঞ্জিল থেকে বামদেববাবুকে কারা যেন লোপাট করে নিয়ে গিয়েছে, শুনেছেন?

বলেন কি?

হ্যাঁ, ক্লোরোফরম করে নিয়ে গিয়েছে। মৃত্যুঞ্জয়ের দিকে ফিরে বাকি কথাটা বলে কিরীটী, তুমি স্টেশনটা watch করবে। রহমৎ সাহেব, আপনি স্টেশন মাস্টারকে একটা চিঠি দিয়ে দিন যদি প্রয়োজন হয় তো তিনি যেন ওকে সাহায্য করেন।

মৃত্যুঞ্জয়কে চিঠি দিয়ে স্টেশনে পাঠিয়ে দিয়ে কিরীটী রহমৎ সাহেবকে বললে, বাছা বাছা সেপাইয়ের দরকার যে রহমৎ সাহেব!

কখন দরকার বলুন?

এখুনি। একবার আরামবাগে গিয়ে হানা দিতে হবে।

বেশ, এখুনি আমি ব্যবস্থা করছি।

বহরমপুর আসাবার আগের দিন সিটি হোটেলে রাত বারোটার পর গিয়ে যোগানন্দের সঙ্গে দেখা করেছিল কিরীটী পূর্বেই।

যোগানন্দ কিরীটীর পরিচয় পেয়ে খুশী হয়। যোগানন্দের সঙ্গে অনেকক্ষণ কথাবার্তা হয় কিরীটীর।

অনিল চৌধুরীর মোটামুটি ইতিহাস যতটুকু যোগানন্দের জানা ছিল সে কিরীটীকে বলে, কিছু না গোপন করে। এবং কিরীটীর কাছ থেকে যোগানন্দও রত্নমঞ্জিল ও সুবর্ণকঙ্কনের ইতিহাস শোনে।

যোগানন্দ আর দেরি করে না। কেন যেন তার মনে হয় আচমকা রহস্যজনক ভাবে নিরুদ্দিষ্ট অনিলের বুঝি একটা হদিস মিলল, আর তাই পরের দিনই প্রত্যুষে সবিতার সঙ্গে দেখা করে সব কথা তাকে খুলে বলে।

যোগানন্দের মুখে সব কথা শুনে চকিতে সবিতার একটা কথা মনে পড়ে। অনিল ও বাণীর চলে যাবার দিন সন্ধ্যায় কিছুক্ষণের জন্য অনিল বাইরে গেলে সবিতা কৌতূহলভরে পোঁটলাটি খুলেছিল এবং তার মধ্যে একটা কঙ্কন ও লাল মলাটের একটা নোটবই দেখেছিল। কিন্তু ভাল করে সব কিছু দেখবার সুযোগ পায়নি। সেই রাত্রেই স্বামী চলে যায় এবং বাণীকেও আর খুঁজে পাওয়া যায় না।

প্রথম বিবাহের পর তখনও তার সুখের সংসারে ভাঙন ধরেনি। শিক্ষার, ভদ্রতার, রুচির গিলটির পাতটা ওপর থেকে খসে গিয়ে যখন অনিলের লোভী অসংযত, উচ্ছৃঙ্খল ও নির্লজ্জ পরবর্তী চরিত্রের দৈন্যটা প্রকাশ পায়নি, তখন একদিন কথায় কথায় তার স্বামীর মুখেই তার স্বামীর শৈশবের ইতিহাস শুনেছিল সবিতা। নবাব-অনুগৃহীত তার মাতামহদের শৌর্য ও ঐশ্বর্যের কথা, বহরমপুরে তাদের রত্নমঞ্জিলের গল্প অনেক কিছুই শুনেছিল।

কিরীটী কর্তৃক বিব্রত কাহিনী যোগানন্দের মুখে শুনে সবিতার কেন যেন ধারনা হল, হয়তো অনিল বহরমপুরেই গিয়েছে।

এবং সে স্বামীর সন্ধানে বহরমপুরে যাওয়াই স্থির করল।

যোগানন্দকে সেকথা বললেও।

যোগানন্দ কিন্তু একাই বহরমপুরে অনিলের খোঁজে যাবার কথা বলেছিল। কিন্তু সবিতা রাজী হল না।

বাণীর জন্য মনটা তার সত্যিই বিশেষ চঞ্চল হয়ে ছিল।

সে বললে, আমি তোমার সঙ্গে যাব যোগেন। আমার স্থির বিশ্বাস, বাণী তার সঙ্গেই

গিয়েছে। তারপর একটু থেমে আবার বলে, সে যা খুশি তাই করুক কিন্তু বাণীকে আমার ফিরিয়ে আনতেই হবে।

সেইদিনই যোগানন্দ ও সবিতা বহরমপুর যাত্রা করে।

॥ তেইশ ॥

কিরীটী থানায় গিয়েছে, এখনো সেখান থেকে ফেরেনি। বিনয় ও সুজাতা দোতলার ঘরে বসে সেই সম্পর্কেই আলোচনা করছে। এমন সময় যোগানন্দ ও সবিতা এসে সেখানে উপস্থিত হল।

সুজাতা বা বিনয় কেউ তাদের চেনে না। জীবনে কখনো তো দেখেনি। কিন্তু যোগানন্দর মধ্যস্থতায় পরস্পরের পরিচয় হল।

সবিতা এ বাড়ির ভাগ্নে-বৌ।

সম্পর্কে সুজাতার বৌদি।

সবিতা কিন্তু সুজাতার মুখে গতরাত্রে বামদেবের আচম্‌কা নিরুদ্দিষ্ট হওয়ার কথা শুনে ও এখানকার ক'দিনের ঘটনা শুনে স্তম্ভিত হয়ে যায়।

বিনয়ও সংক্ষেপে রত্নমঞ্জিলের বিক্রয়-ব্যাপার নিয়ে গত মাসখানেকের ঘটনা ও সুবর্ণকঙ্কনের সমস্ত ইতিহাস সবিতাকে বলে।

সবিতার চোখে যেন নতুন আলো ফুটে ওঠে। ইদানীংকার স্বামীর অধঃপতনের ইতিহাসটাও ঐ সঙ্গে সঙ্গে সবিতার চোখের উপর স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

বুদ্ধিমতী সবিতার মনে হয় এই দুই ব্যাপারের মধ্যে নিশ্চয়ই কোথায়ও একটা যোগসূত্র আছে একে অন্য হতে বিচ্ছিন্ন নয়।

আর তাই যদি সত্য হয় তো এদেরকাছে লজ্জায় সে মুখ দেখাবে কেমন করে?

এই সুজাতা, এই বিনয় তারা তো অনিলের থেকে তাকে পৃথক ভাববে না। সত্যি হোক মিথ্যে হোক অনিলের কলঙ্কের দাগ তো তার গায়ে কালি ছিটোবে।

তবু মনে মনে সে বার বার বলে, হে ভগবান! যেন সত্য না হয়। এই জঘন্য ঘটনার সঙ্গে যেন তার স্বামী না জড়িয়ে থাকে।

কিন্তু সবিতা জানত না নির্মম ভাগ্যবিধাতা তাকে কোন্ পথে ঠেলে নিয়ে চলেছে। নির্যাতন ও অপমানের এখনো কত বাকি।

তাড়াতাড়ি বাণী নোটবুকটার পাতার পর পাতা উল্টেপাল্টে পড়ে চলে কিন্তু বিশেষ কিছুই আর চোখে পড়ে না। শেষের দিকে ছাড়া-ছাড়া পাতাগুলোর মধ্যে কেমন যেন একটা অসংলগ্ন, অস্পষ্ট, খেদোক্তিতে ভরা। একটা অনুশোচনা যেন বড় করুণভাবে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

এমন সময় হঠাৎ দ্রুত পদশব্দ পেয়ে তাড়াতাড়ি বাণী খাতাটা যথাস্থানে রেখে ফুঁ দিয়ে আলোটা নিভিয়ে শয্যায় গিয়ে শুয়ে পড়ে।

ঘরে এসে একটু পরেই তার বাবা অনিল যে প্রবেশ করল, বাণী তা বুঝতে পারে।

জেগে থাকলেও ঘুমের ভান করে কাঠ হয়ে শয্যায় পড়ে থাকে বাণী।

অনিল ঘরে ঢুকে দেশলাই দিয়ে প্রদীপটা জ্বালাল। প্রদীপের আলোয় ঘুরে একবার অদূরে শয্যায় শায়িত ঘুমন্ত মেয়ের মুখের দিকে তাকাল। তারপর পুঁটলি খুলে আলোর সামনে নোটবইটা নিয়ে বসল।

শেষরাত্রের দিকে বাণী কখন ঘুমিয়ে পড়েছে সে নিজেই জানে না।

একটা ফিসফাসে কথাবার্তার শব্দে তার ঘুম ভেঙে যায়।

চমকে ওঠে বাণী রত্নমঞ্জিলের সেই ভৃত্য মনোহরকে ফিসফিস করে তার বাপের সঙ্গে কথা বলতে শুনে।

ঘরের মধ্যে আমাকে শিকল তুলে আটকে দিয়েছিল কর্তা। কিন্তু বেটারা তো জানত না ঘরের দক্ষিণের জানালার একটা শিক আলগা। শিকটা তুলে পালিয়ে এসেছি। অনেক লোকজন এসে গিয়েছে রত্নমঞ্জিলে।

ওরা কে বুঝতে পারলে মনোহর? বাধা দেয় অনিল।

না। তবে কথায়বার্তায় মনে হল পুলিসের লোক। আমি আর এখানে এক দণ্ডও থাকব না। ধরতে পারলেই ওরা আমাকে পুলিসে দেবে।

ভয় পাচ্ছ কেন মনোহর। পুলিসে দিলেই অমনি হল? ওরা জানতে পারবে না যে আমরা এখানে থাকতে পারি!

না কর্তা, কাল সকালে বিনয়বাবুর কথা শুনে বুঝেছি, আপানাদের সন্ধান এখনো না পেলেও ওরা টের পেয়েছে এই জঙ্গলের মধ্যে কেউ থাকে। পুলিস নিয়ে খোঁজে আসলে ঠিক সবাইকে খুঁজে বের করবে। সময় থাকতে আপনিও পালান। মনোহর উত্তেজিতভাবে কথাগুলো বলে যায়।

না। সেই সিন্দুক না খুঁজে পাওয়া পর্যন্ত এখান থেকে আমি নড়ছি না।

আপনার নিশ্চয়ই ভুল হয়েছে কর্তা, সত্যি মাটির নীচে কোন রকম সিন্দুক পোঁতা থাকলে আমরা কি খুঁজে পেতাম না এতদিন! আমরা এই এক মাস ধরে বাড়ির আশপাশ কত জায়গাতেই তো মাটি খুঁড়ে দেখলাম। আমার মনে হয় যদি কিছু থাকে তো ঐ বাড়ির মেঝের নীচেই কোথায়ও পোঁতা আছে।

না, তা হতেই পারে না।

তাই যদি না হবে তো ঐ বাড়িটা কিনবার জন্য সবাই এত চেষ্টা করছে কেন! এই তো দিন দুই আগে আর একজনও বাড়িটা কিনতে এসেছিল, বিনয়বাবু লোকটাকে গালাগাল দিয়ে তাড়িয়ে দিয়েছেন!

মনোহরের যুক্তিটা কেন যেন অনিলের মনে লাগে।

হয়তো মনোহরের কথাই ঠিক। নচেৎ নোটবুকের নির্দেশমত কই কোন শিলাখণ্ডই তো এক মাস ধরে খুঁজে-খুঁজেও জঙ্গলের মধ্যে কোথাও পাওয়া গেল না!

তাছাড়া মনোহর যে বাদশাহী মোহর দুটি পেয়েছিল, সেও তো ঐ বাড়িরই মেঝের একটা ফাটলের মধ্যে সাপ মারতে গিয়েই!

অনিল বলে, মনোহর, তাহলে একবার শেষ চেষ্টা করে দেখব, চল আজই রাত্রে ঘরের সেই মেঝেটা খুঁড়ে দেখি।

আমি আর ওর মধ্যে নেই বাবু। যা করবার আপনি করুন গে—আমার পাওনাগণ্ডা

মিটিয়ে দিন, অমি চলে যাই।

নিশ্চয়ই, মিটিয়ে দেব বৈকি—আগে টাকা পাই, তবে তো! কথার খেলাপ আমি করি না। যা পাব তার অর্ধেক ভাগ তোমার।

না কর্তা, আধাআধি বখরায় কাজ নেই আর, আমাকে হাজারখানেক টাকা দিন যেমন আগে বলেছিলেন, আমি চলে যাই। মাটি খুঁড়ে যা পাবেন তা আপনিই সব নেবেন।

টাকা এখন আমি কোথায় পাব, টাকা কি আমার হাতে আছে নাকি?

ওসব বাজে কথা রাখুন দেখি। যা দেবেন বলেছিলেন—হাজার টাকা, এখনি মিটিয়ে দিন। আপনার কথায় লোভে পড়ে এতদিনকার পুরনো মুনিবের সঙ্গে অনেক নেমকহারামি করেছি। আর নয়, দিন টাকাটা বের করে দিন, ভোর হয়ে এল, ছুটে গিয়ে আবার আমাকে শেষরাত্রের প্রথম ট্রেনটা ধরতে হবে।

বললাম তো, টাকা এখন কোথায় যে দেব!

আবার চালাকি খেলছেন কেন? বার করুন তো টাকাটা, চটপট!

বলেছি তো টাকা নেই, তা দেব কোথা থেকে?

টাকা নেই মানে! মনোহরের কণ্ঠস্বরটা এবারে বেশ স্পষ্ট ও ঝাঁকালো মনে হয়।

টাকা নেই মানে টাকা নেই। চলে যেতে হয় চলে যা। ঠিকানা রেখে যা, টাকা আমি ঠিক পৌঁছে দেব।

মাইরি! সোনার চাঁদ আমার!

মুহূর্তে অনিলের চোখ দুটো আগুনের মত দপ্ করে জ্বলে ওঠে। বাঘের চোখের মত তার চোখ দুটো জ্বলতে থাকে যেন।

চাপাকণ্ঠে গর্জন করে ওঠে, এই উল্লুক! মুখ সামলে কথা বল্!

ওঃ, আবার চোখরাঙানি! এক ঘায়ে এক্কেবারে ঠাণ্ডা করে দেব।

মনোহরের মুখের কথাটা শেষ হয় না—অকস্মাৎ যেন বাঘের মতই চোখের পলকে লাফিয়ে পড়ে অনিল মনোহরের ওপরে এবং লোহার মত শক্ত দু হাতে তার গলাটা টিপে ধরে।

ভয়ার্ত কণ্ঠে চেঁচিয়ে ওঠে এতক্ষণে বাণী, বাবা! বাবা!

অতর্কিতে আক্রান্ত হয়ে মনোহর টাল সামলাতে না পেরে মাটিতে পড়ে যায় এবং অনিল দু হাতে তার গলা টিপে বুকের ওপরে উঠে বসে।

বাণী ছুটে এসে বাপকে নিবৃত্ত করবার চেষ্টা করে দু হাতে টেনে ধরে। কিন্তু বৃথা, অনিল তখন মরীয়া হয়ে উঠেছে।

আকস্মিক বেকায়দাভাবে আক্রান্ত হয়ে মনোহরও সুবিধা করতে পারে না। অনিলের হাতের লৌহকঠিন আসুরিক পেষণে খুব শীঘ্রই কাহিল হয়ে পড়ে।

অনিল হয়তো মনোহরকে শেষই করে ফেলত, কিন্তু বাণী মরীয়া হয়ে বাধা দেওয়ায় শেষ পর্যন্ত মনোহরকে মুক্তি দিতে বাধ্য হয় অনিল।

দু পাশের শিরা ফুলে উঠেছে, রক্তচাপে সমস্ত মুখটা লাল হয়ে উঠেছে মনোহরের। হাঁপাচ্ছে সে তখন। একটা লাথি দিয়ে মনোহরকে ঘর থেকে বের করে দেয় অনিল।

মনোহরও একছুটে অদৃশ্য হয়ে যায়।

অনিল গর্জাতে থাকে, হারামজাদাকে শেষ করে ফেলাই উচিত ছিল। তুই বাধা দিলি

কেন? টাকার সাধ ওর জন্মের মত মিটিয়ে দিতাম।

বাণী স্তম্ভিত নির্বাক।

বাপের এই মূর্তির সঙ্গে পূর্বপরিচয় তো তার কখনো ঘটেনি! এ যে তার কল্পনাতীত! **এই** তার বাপ!

হাত-পা যেন বাণীর অসাড় হয়ে গিয়েছে। শব্দ বের হয় না গলা দিয়ে।

॥ চব্বিশ ॥

বেলা প্রায় নটা নাগাদ জনাদশেক পুলিশ নিয়ে কিরীটী ও রহমৎ সাহেব আরামবাগে এসে উপস্থিত হল।

অতীতের নবাবী ঐশ্বর্যের ভগ্নস্তূপ।

বেদনার্ত হাহাকারে যেন আজও স্মরণ করিয়ে দেয় এক হারিয়ে যাওয়া দিনকে।

দেখছেন তো মিঃ রায়! এই ভগ্নস্তূপের মধ্যে কোন মানুষ কি থাকতে পারে? রহমৎ সাহেব আবার বলেন।

কিরীটী এবারও তাঁর কথার কোন জবাব দেয় না। এগিয়ে চলে নিঃশব্দে। পুলিশ বাহিনীকে সে অনুসরণ করতে বলে।

ঘরের পর ঘর।

কিন্তু কোন ঘরেই জনমানবের চিহ্ন পর্যন্ত নেই। ধূলিতে আকীর্ণ—বদ্ধ বায়ুতরঙ্গে একটা ধূলো-বালির ভ্যাপসা গন্ধ। সকলে এসে একটা প্রশস্ত হলঘরের মত জায়গায় পৌঁছায়। এবং হঠাৎ ঐ সময় একটা পদশব্দ কানে আসে কিরীটীর। সতর্ক শ্রবণেন্দ্রিয় তার উৎকর্ণ হয়ে ওঠে সঙ্গে সঙ্গে।

রহমৎ সাহেবের কানেও পদশব্দটা প্রবেশ করেছিল। তিনিও থমকে দাঁড়িয়েছিলেন ইতিমধ্যে।

স্পষ্ট পদশব্দ যেন এদিকেই এগিয়ে আসছে।

চারিদিকে বড় বড় কারুকার্য করা থাম! কিরীটীর চোখের ইঙ্গিতে মুহূর্তে সকলে এক-একটা থামের আড়ালে আত্মগোপন করে।

পদশব্দ আরো স্পষ্ট শোনা যাচ্ছে। আরো এগিয়ে আসছে।

জায়গাটার দিনের বেলাতেও পর্যাপ্ত আলো প্রবেশ না করায় আবছা একটা আলো-আঁধরি।

কে ঐ এগিয়ে আসছে!

কিরীটীর চিনতে কষ্ট হয় না অস্পষ্ট আলো-আঁধারেও। লোকটা পিয়ারী।

তাহলে তার অনুমান ভুল হয়নি! পিয়ারী এই পড়ো আরামবাগেই এসে আশ্রয় নিয়েছে!

নিশ্চিত মনেই পিয়ারী এগিয়ে আসছে, ওষ্ঠ ধৃত তার একটি জ্বলন্ত সিগারেট।

কোমরের বেল্ট থেকে পিস্তলটা বের করে কিরীটীর নির্দেশে রহমৎ সাহেব প্রস্তুত থাকেন।

এবং হাত পাঁচেকের ব্যবধান যখন তার পিয়ারী থেকে, আচম্‌কা থামের আড়াল থেকে

BanglaBook.org

আত্মপ্রকাশ করে বজ্রকঠিন কণ্ঠে বলে, পিয়ারী, হাত তোল!

ভূত দেখবার মতই যেন থমকে দাঁড়িয়ে গিয়েছে পিয়ারী। কিন্তু পরমুহূর্তেই নিজেকে সামলে নিয়ে পিয়ারী বলে, এসবের মানে কি? কে তুমি?

আশ্চর্য, আমাকে তো তোমার চেনা উচিত ছিল পিয়ারী! এর আগেও তো দু-দুবার আমাদের পরস্পরের সাক্ষাৎ হয়েছে। ব্যঙ্গভরা কণ্ঠে এবারে কিরীটী বলে।

পিয়ারী চুপ করে থাকে প্রত্যুত্তরে। কারণ ইতিমধ্যে তার চারিপাশে সশস্ত্র এক পুলিস বাহিনী নিঃশব্দে এসে দাঁড়িয়েছে।

বামদেব অধিকারীকে কোথায় রেখেছ বল? কিরীটীই আবার প্রশ্ন করে।

বামদেব অধিকারী!

নামটা চেনো না বলে মনে হচ্ছে নাকি!

না, জীবনে কখনো ও-নাম আমি শুনিনি এর আগে এবং বুঝতে পারছি না, কেনই বা আপনি এভাবে এসে আমাকে ঘিরেছেন?

এমন চমৎকার জায়গাতে ধরা পড়েও বুঝতে পারছ না কেন তোমাকে আমরা ঘিরে দাঁড়িয়েছি!

না আমি তো এখানে বেড়াতে এসেছি।

বেড়াতেই এসেছ বটে! ব্যঙ্গভরে কথাটা বলে কিরীটী। তারপর রহমৎকে বলে, তাহলে রহমৎ সাহেব, বাকি জায়গাগুলো খোঁজ করে দেখুন—এইখানেই কোথাও বামদেবকে নিশ্চয়ই পাওয়া যাবে।

রহমৎ সাহেব তখন কিরীটীর নির্দেশে দুজন সশস্ত্র পুলিসকে পিয়ারীর পাহারায় রেখে বাকী চারজনকে নিয়ে এগিয়ে গেলেন।

বেশী আর খুঁজতে হল না বামদেব অধিকারীকে।

তবে ছট্টুলাল ও গুপীনাথ আগেভাগেই সরে পড়ায় তাদের আর পাত্তা পাওয়া গেল না।

পিয়ারীকে গ্রেপ্তার করে ও বামদেব অধিকারীকে মুক্ত করে সকলে রত্নমঞ্জিলে ফিরে এল।

সেখানে তখন বাণী তার মা'র কাছে গত এক মাসের কাহিনী বলে চলছে আর সকলে গভীর মনোযোগের সঙ্গে শুনছে।

বাণী একসময় ঘর থেকে বের হয়ে গেল।

পিতার সান্নিধ্য সত্যিই সে আর যেন সহ্য করতে পারছিল না।

অনিল চিৎকার করে ডাকে, কোথায় যাচ্ছিস বাণী?

বাণী কোন জবাব দেয় না বাপের কথায়।

বাণী সোজা জঙ্গলের পথ ধরে রত্নমঞ্জিলের সামনে এসে দাঁড়াল। স্থিরপ্রতিজ্ঞ তখন সে, বামদেব অধিকারীকে সব কথা খুলে বলবেই।

নিচে কাউকে না দেখতে পেয়ে বাণী সিঁড়ি দিয়ে সোজা একেবারে দোতলায় উঠে যায়।

বিনয় ও সুজাতা তাকে চিনতে পারে না, কিন্তু সবিতা ও যোগানন্দ তাকে চিনতে পারে।

সবিতা চিৎকার করে ওঠে, এ কি, বাণী!

বাণী কম আশ্চর্য হয়নি। সে বলে মা!

বাণী ছুটে এসে দু হাতে মাকে জড়িয়ে ধরে।

বামদেবকে নিয়ে কিরীটী ফিরে আসবার পর যেন একটা আনন্দ-কোলাহল পড়ে যায়।

বাণীর মুখে সমস্ত ইতিহাস শুনে তখনি সকলে মিলে জঙ্গলের মধ্যে পড়ো বাড়িতে অনিলের খোঁজে যায় কিন্তু তার সন্ধান সেখানে ওরা পায় না।

হতাশ হয়েই সকলে ফিরে আসে।

বাণী কিন্তু একসময় তার মাকে আড়ালে ডেকে বলে, মা, বাবা নিশ্চয়ই এখনো আশেপাশে কেথাও আছে। আর আমার অনুমান যদি মিথ্যা না হয় তো রাত্রে বাবা রত্নমঞ্জিলে আসবেই।

মেয়ের কথা শুনে সবিতা কিছু বলে না, চুপ করে থাকে।

দুপুরের ডাকে কিরীটী একখানা চিঠি পেল।

হরিদ্বার থেকে এসেছে চিঠিখানা।

॥ পঁচিশ ॥

তরপর এল রাত্রি।

সকলেই যে যার শয্যায় নিদ্রাভিভূত।

কেবল চোখে ঘুম ছিল না সবিতার। ভিতরে ভিতরে একটা অস্থিরতা তাকে যেন কিছুতেই সুস্থির হতে দিচ্ছিল না।

অনেক আশা নিয়ে ঘর বাঁধতে চেয়েছিল সবিতা কিন্তু সব ভেঙে তছনছ হয়ে গেল।

নির্মম ভাগ্যবিধাতা তাকে আঘাতের পর আঘাত হেনেছে বার বার কিন্তু সবিতা ভেঙে পড়েনি।

সমস্ত দুর্ভাগ্যকে সে বুক পেতেই গ্রহণ করেছিল তবু সে শেষ পর্যন্ত জয়ী হতে পারল না। কেন?

আর একজনও সে রাত্রে জেগে ছিল। কিরীটী রায়।

হঠাৎ মধ্যরাত্রির সুগভীর সুপ্তি পীড়িত হয়ে ওঠে একটা যান্ত্রিক ঠং ঠং শব্দে। উঠে পড়ল শয্যা হতে সবিতা।

অন্ধকারেই পায়ে পায়ে সিঁড়ি দিয়ে নিচে নেমে এল।

এগিয়ে চলে শব্দটাকে অনুসরণ করে।

ঘরের দরজাটা ভেজানো।

ভেজানো দরজাটা নিঃশব্দে ভিতরে পা দিল সবিতা।

পাগলের মতই একটা ছোট লোহার শাবল নিয়ে অনিল ঘরের মেঝেতে সর্বত্র ঠুকে ঠুকে চলে।

কি করছ?

কে? চকিতে ফিরে দাঁড়াল অনিল। এ কি, সবিতা তুমি!

হ্যাঁ, কিন্তু কি করছো তুমি? সবিতা আবার প্রশ্ন করে শান্ত গলায়।

কিন্তু তুমি এখানে এলে কি করে?

PATHAGAR.NET

সে প্রশ্নের জবাব পরে দেব। আগে আমার প্রশ্নের জবাব দাও। বলতে বলতে সবিতা দরজার খিলটা তুলে দিয়ে বদ্ধ দরজার গায়ে হেলান দিয়ে দাঁড়াল।

সবিতার দাঁড়াবার ঋজু কঠিন ভঙ্গী, তার মুখের প্রত্যেকটি রেখা, তার কণ্ঠস্বরের অদ্ভুত তীক্ষ্ণতা অনিলের দৃষ্টি আকর্ষণ না করে পারে না।

এ যেন তার চেনা-পরিচিত সবিতা নয়। সেই চিরসহিষ্ণু, নির্বাক নমনীয় সবিতা নয়।

এ সবিতাকে সে কোনদিন দেখেনি। কোনদিন চেনে না। এ তার বিবাহিত স্ত্রী সবিতা নয়। এ যেন অন্য কোন এক নারী।

কই জবাব দিচ্ছ না কেন? এখানে এত রাত্রে তুমি কি করছ?

আকস্মিক বিহ্বলতাটা অনিলের ততক্ষণে কেটে গিয়েছে। দৃপ্ত ভঙ্গীতে ঘুরে দাঁড়িয়ে অনিল বলে, যাই করি না কেন, সে জেনে তোমার কোন প্রয়োজন নেই। তুমি এখান থেকে যাও।

না। তোমার জবাব না নিয়ে আমি যাব না।

সবিতা! চলে যাও বলছি এখান থেকে।

না। বললাম তো আগে আমার কথার জবাব দাও।

সবিতা!

না, অনেক সহ্য করেছি তোমার অত্যাচার, অন্যায় জুলুম মুখ বুজে এতকাল। কিন্তু আর সহ্য করবা না। জেনো সহ্যেরও একটা সীমা আছে।

সবিতা, এখনো চলে যাও বলছি!

ছি, ধিক্ তোমাকে! একবার ভেবে দেখ তো কোথা থেকে কোথায় তুমি নেমে এসেছ আজ! একদিন কি তুমি ছিলে, আর আজ তুমি কি হয়েছ!

সবিতা, এখনো বলছি চলে যাও এখান থেকে! চিৎকার করে ওঠে অনিল স্থানকাল ভুলে।

চল—এখান থেকে আমরা চলে যাই চল। ওপরে কিরীটীবাবু ওৎ পেতে আছেন তোমাকে ধরবেন বলে। ধরা পড়লে মেয়ের কাছে তুমি মুখ দেখাবে কি করে! কথাগুলো বলতে বলতে এগিয়ে যায় সবিতা স্বামীর দিকে। না, আর অন্যায় আমি তোমায় করতে দেব না।

এখান থেকে যাও সবিতা। আনিল বলে।

বললাম তো আমি যাব না। দৃঢ় শান্ত কণ্ঠে সবিতা বলে।

যাবে না!

না। যদি যাই তো, তোমায় সঙ্গে নিয়েই যাব—**একা নয়।**

তুমি যাবে না সবিতা?

না।

শাবলটা হাতে সামনে এসে দাঁড়ায় অনিল।

তার চোখের মণি দুটো যেন বাঘের মত জ্বলছে।

সবিতা!

শোন তুমি হয়তো জান না—ওপরে কিরীটীবাবু ওৎ পেতে আছেন। যদি ঘুণাক্ষরেও জানতে পারেন যে তুমি এসেছ—তোমার হাতে হাতকড়ি পড়বে। আমি জানতাম—বুঝতে

পেরেছিলাম তুমি আসবেই। তাই না ঘুমিয়ে কান পেতে অপেক্ষা করেছিলাম!

কিরীটী রায় করবে আমার কচুটা!

আচ্ছা তোমার ঘৃণা লজ্জা বলেও কি কিছু নেই? নিজের সন্তানের কাছে আজ তুমি কত ছোট হয়ে গিয়েছ জান?

হিতোপদেশ!

না, হিতোপদেশ নয়—এ শুধু আমার অনুরোধ। এতকাল তো তোমার নিজের মত চলে দেখলে, এবারে না হয় ফেরো—

ফিরব বললেই আজ আর ফেরা যায় না!

যায়—খুব যায়। চল এখান থেকে আমরা পালিয়ে যাই।

পালিয়ে যাব!

হ্যাঁ, দুজনে মিলে আমরা রোজগার করব। নতুন জায়গায় গিয়ে ঘর বাঁধব—যেখানে কেউ আমাদের চেনে না।

ও নাটকে আর যে-ই বিশ্বাস করুক আমি করি না, শূন্য হাতে ভাগ্যের সঙ্গে দুনিয়ার সঙ্গে যে যুদ্ধ করা যায় না সে কথাটা আর কেউ না বুঝুক কিন্তু আমি হাড়ে হাড়ে বুঝেছি সবিতা। শোন, যে কুবেরের ঐশ্বর্য আমি প্রায় মুঠোর মধ্যে এনেছি সেটা আমায় মুঠো ভরে নিতেই হবে।

আকস্মাৎ একটা মতলব যেন সবিতার মাথার মধ্যে খেলে যায়। সে বলে, কিন্তু সে তুমি কোনদিনই পাবে না।

পাব—পাব!

না। তার কারণ, তোমার কাছে যে কঙ্কনটা ছিল সেটা আমি সরিয়ে ফেলেছি।

সঙ্গে সঙ্গে তড়াক করে লাফিয়ে উঠে দাঁড়ায় অনিল, সবিতা!

অনিলের চোখের মণি দুটো যেন হিংস্র শ্বাপদের চোখের মণির মত জ্বলছে।

সবিতা!

হ্যাঁ, সে কঙ্কন এখন আমার কাছে। আর শুধু তাই নয়, যে কুবেরের ঐশ্বর্যের জন্যে তুমি ক্ষেপে উঠেছ তাও তোমার আগেই দুটো কঙ্কনের সাহায্যে উদ্ধার হয়েছে।

সে কি! সে কঙ্কন—

পেয়েছি। তোমার ডেরায় বাক্সর মধ্যে পেয়েছি—তুলোর ওপর রাখা ছিল।

সে কঙ্কন তুমি ঐ বামদেবকে দিয়ে দিয়েছ?

হ্যাঁ, তার জিনিস—

সবিতার কথা শেষ হল না, কেন—কেন দিলি সে কঙ্কন হারামজাদী—বলতে বলতে ঝাঁপিয়ে পড়ে লোহার মত শক্ত দু-হাতে সবিতার গলাটা চেপে ধরে অনিল।

বল্ বল্—কেন?

নিষ্ঠুর লৌহকঠিন হাতের সেই পেষণে ক্রমশঃ সবিতার দেহটা শিথিল হয়ে এলিয়ে পড়ে।

চোখের মণি দুটো কোটর থেকে ঠেলে বের হয়ে আসে।

অনিল যেন পেষণ করে চলেছে।

আর উন্মাদের মত বলে চলেছে, বল্ বল্—কেন?

হঠাৎ ঐ ঘরের দরজাটা দড়াম করে খুলে গেল এবং কিরীটী এসে ঘরে প্রবেশ করল।

সবিতার অনুমান মিথ্যা নয়।

সত্যিই কিরীটী বাণীর মুখ থেকে আনুপূর্বিক সব শুনে জঙ্গলের মধ্যে অনিলের ঘরে গিয়ে হানা দেয় এবং সেই ডায়েরী ও কঙ্কন উদ্ধার করে।

এবং সেও বুঝতে পেরেছিল, শেষ চেষ্টা অনিল করবেই এবং অনিল রত্নমঞ্জিলে আসবেই, তাই সে ওৎ পেতে ছিল।

কিরীটী এল বটে, কিন্তু বড় দেরিতে।

তখন যা হবার তা হয়ে গিয়েছে।

সবিতার শ্বাসরোধ হয়ে মৃত্যু ঘটেছে অনিলের নৃশংস নিষ্ঠুর পেষণে।

হাত তলুন অনিলবাবু! রহমৎ সাহেব বললেন। তিনিও কিরীটীর সঙ্গে এসেছেন। রহমৎ সাহেবের হাতে পিস্তল।

অনিলের হাত থেকে সবিতার শিথিল মৃতদেহটা ঝপ করে মাটিতে পায়ের সামনে পড়ে যায়।

এ কি অনিলবাবু—এ কি! কিরীটী চিৎকার করে ওঠে

অনিলের সম্বিৎও বুঝি তখন ফিরে এসেছে।

সে প্রথমটায় হতবুদ্ধি হয়ে গিয়েছিল।

কিরীটীর দিকে ফিরেও তাকায় না—সে তাকিয়ে থাকে কয়েকটা মুহূর্ত ফ্যাল ফ্যাল করে ভূপতিত তারই পায়ের সামনে সবিতার দিকে।

তারপরই নিষ্প্রাণ দেহটার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে চিৎকার করে ওঠে, সবিতা—সবিতা—না—না—না—

কিরীটী স্থির নিস্পন্দ বোবা—পাথর যেন।

সবিতা—সবিাতা—কথা বল সবিতা—সবিতা—আমি—আমি ওকে হত্যা করেছি—আমি আমার স্ত্রীকে গলা টিপে শ্বাসরোধ করে হত্যা করেছি! দারোগাবাবু গ্রেপ্তার করুন আমায়—ফাঁসী দিন!

এ কাহিনীর এখানেই শেষ।

ডাইরীর মধ্যে বর্ণিত সিন্দুকের কোন সন্ধানই কেউ জানতে পারেনি।

রত্নমঞ্জিলের রত্নভাণ্ডার মাটির নীচেই গুপ্ত থেকে গিয়েছে।

॥ দ্বাদশ খণ্ড সমাপ্ত ॥